জীবনের পাঁচালীকার বিভূতিভূষণ

ডঃ তারকনাথ ঘোষ

আনন্দধারা প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র, ১৩৭৬

প্রকাশক
মনোরঞ্জন মজুমদার
আনন্দধারা প্রকাশন
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
সুধীর কুমার পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১এ, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট
খালেদ চৌধুরী

১২·০০

মুখবন্ধ

বিভূতিভূষণকে জেনে এই বই লেখার মূলে অগ্রজকল্প শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদারের উৎসাহের কথাই প্রথমে বলতে হয়। বিভূতিভূষণকে আকৈশোর ভালোবেসে এসেছি, তাঁকে নিয়ে মাঝে মাঝে টুকরো লেখাও হয়েছে; কিন্তু তাঁকে নিয়ে গোটা একখানা বই লেখার পরিকল্পনা আদৌ ছিল না। মনোরঞ্জন বাবুই সেটা মাথায় ঢুকিয়ে দেন।

অথচ বিভূতিভূষণকে নিয়ে ভালো একখানা বই অনেক দিন আগেই হওয়া উচিত ছিল। বাংলার কথাশিল্পে শরৎচন্দ্রের পরে যদি দুটি তিনটি নাম করতে হয় তাহলে তার মধ্যে তাঁর নাম করতেই হবে। অথচ আমরা কেউই প্রায় তাঁকে ভালো করে চিনি নি জানি নি।

আমি পুরোদস্তুর সমালোচনার বই লিখতে চাই নি—যদিও বইয়ের কিছু অংশে বাঁধা পথেই চলতে হয়েছে। জানিনা সে অংশ জিজ্ঞাসাবান্ পাঠকের কাজে লাগবে কি না। আমি বিভূতিভূষণকে অনুভব করতে চেয়েছি—আমার নিজের ভঙ্গিতে সেই অনুভূতি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি। এই চেষ্টায় কতদূর সফল হয়েছি বলতে পারি না; তবে মাঝে মাঝে যে প্রাণবান্ হৃদয়বান্ চেতনাবান্ কবির সঙ্গে একাত্ম হবার প্রয়াসে গভীর এক আনন্দে ভরে গেছি এ কথা স্বীকার না করে পারি না।

বিভূতিভূষণের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকথা দিয়ে বই শুরু করেছি। জীবনীকারের শ্রমশীলতা আমার নেই বলে লজ্জিত। আমি প্রধানত গ্রন্থভুকের বৃত্তি নিয়ে উদ্ধৃতি-সহ কিছু তথ্য পরিবেশন করেছি। আশা রাখি আর কোনো অনুরাগী বিভূতিভূষণের পূর্ণাঙ্গ জীবনী

রচনায় উদ্যোগী হবেন এবং অচিরেই হবেন, কারণ এখনও অনেকের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করতে পারবেন যাঁরা বিভূতিভূষণকে দেখেছেন সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে বলতে উৎসুক। 'সুতরাং' বললাম এইজন্য যে আমি এইরকম কয়েকজন মানুষের সংস্পর্শে এসেছি—তাঁরা সকলেই তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু বলতে চান। পরিতাপের কথা, আমি সে সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারিনি।

অনেকেই সাহায্য করেছেন। বিভূতিভূষণের সহধর্মিণী রমা দেবীর (কল্যাণীদি) নাম সবার আগে করতে হয়। তাঁর ভাই শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, কথাশিল্পী শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, বিভূতিভূষণের এক-কালের ছাত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী ও আরও অনেকে। তাঁদের প্রীতিময় দান আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করেছি।

শ্রীতারকনাথ ঘোষ

শ্রীরামপুর
শিবরাত্রি, ১৩৭৬ সাল

কল্যাণীদিকে



জীবন কথা

বিভূতিভূষণ সম্পর্কে এই বইটির সঙ্গে তাঁর একটি ছোটো জীবনী দেওয়ার ইচ্ছা আছে—একটি সাহিত্য সভা আরম্ভ হওয়ার আগে এক বন্ধুকে বলতেই তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন—খুব ভালো কাজ করছেন। বিভূতিভূষণের জীবনটাই আশ্চর্য। তিনি কোথা থেকে কী পেয়েছেন তা যদি খুঁজে বার করতে পারেন তা'হলে তাঁর অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যাবে। কী মানুষই ছিলেন।

ক্ষণকাল পরে আর একজন বন্ধু এলে তিনি সোৎসাহে আমার ইচ্ছার কথা তাঁকে জানালেন। কিন্তু তিনি বললেন, বিভূতিভূষণের জীবন এমন একটা কিছু নয় যে, ঘটা করে তাঁর জীবনী লিখতে হবে। তাঁর লেখাই আসল। ঐ লেখার মধ্যেই তাঁর পরিচয় পাওয়া যাবে।

ঐ তুই বন্ধুই অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগী—তু'জনের মধ্যেই পরিণত চিন্তার পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে পেয়েছি। তু'জনেই বিভূতিভূষণের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছিলেন।—ভেবে দেখলাম, একেবারে উলটো বলে মনে হলেও তু'জনের কথাই সত্য। যদি তথ্য আর ঘটনার সন্ধান করি, বিভূতিভূষণের জীবনে, তা'হলে কী পাব? এমন কিছুই না, যা দিয়ে পুরোদস্তুর জীবনী লেখা চলে। তিনি কর্মী ছিলেন না, সুতরাং কৃতিত্বের ফিরিস্তি দিয়ে তাঁর জীবনী রচনার কোনো সুযোগ নেই। তাঁর জীবনে তুঃখ, আঘাত অনেক এসেছে; ভাগ্য তাঁর জীবনে অনেক মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে; তিনি অনেক বেড়িয়েছেন। কিন্তু ঘটনার দিক থেকে যদি বিচার করতে হয়, তা'হলে এই সবের মধ্যে চমকপ্রদ বা উল্লেখযোগ্য কোনোকিছুর সন্ধান পাব কি, যা দিয়ে বর্ণাঢ্য একটা জীবনী লেখা যেতে পারে।

আবার, এইসব বর্ণবিরল ঘটনার টানাপোড়েনই তো তাঁর জীবন। যে জীবন তাঁকে ধারণ করেছে তার সঙ্গে পরিচয়ই তো তাঁর লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে। শৈশব থেকে তিনি অনেক দুঃখ, দারিদ্র্য, শোক, তাপের সম্মুখীন হয়েছেন; এই সবের অভিজ্ঞতা তাঁর চেতনাকে জারিত করেছে। বাংলার গ্রামে তাঁর জীবনের প্রথম দিনগুলো কেটেছে; বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি বেড়িয়েছেন—ছোটো বড়ো অনেক মানুষের সঙ্গে মিশেছেন; বিহার আর মধ্যপ্রদেশের অরণ্য-ভূমির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। নিছক ঘটনা হিসেবে এসবের মধ্যে চটক বা চমৎকার কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু দুর্লক্ষ্য মানসক্রিয়ায় এগুলি তাঁর চৈতন্যের নিভৃতে নিবিড় অনুভূতিরূপে সঞ্চিত হয়েছিল। তাঁর কবিসত্তা ঐ অনুভূতির আনন্দে টলমল করেছিল—তাঁর সাহিত্য ঐ অনুভূতিরই শিল্পাশ্রিত প্রকাশ।

বাইরের জগৎ কীভাবে বিভূতিভূষণের মানসলোকে প্রতিফলিত হয়েছিল, তাঁর সৃজনী কল্পনা কীভাবে ঐ প্রতিফলিত জীবনরূপকে নতুন করে গড়ে তুলেছে তার ইতিহাসই কবি বিভূতিভূষণের উৎকৃষ্ট জীবনী সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কাজ অতি দুঃসাধ্য। সম্ভবত অসাধ্য। বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, তিনি কী করে গেলেন তা বুঝতে হলে আর একজন বিবেকানন্দ দরকার হবে। বিভূতিভূষণকে বুঝতে গেলে আর এক বিভূতিভূষণ দরকার। তাঁর সমধর্মী না হলে তাঁর জীবনকে বোঝা যাবে না,—বোঝানো তো নয়ই।

আমি বিভূতিভূষণের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার প্রয়াস থেকে বিরত হয়েছি সুবুদ্ধি বশত। অনধিকারীর অপচেষ্টা মারাত্মক। বলতে কুণ্ঠা বোধ করছি না, এ বিষয়ে আমার অক্ষমতাই এর একমাত্র কারণ। তথ্যানুসন্ধানের যে দুর্মদ স্পৃহা আর উদ্যম জীবনীকারের আবশ্যিক গুণ, আমি তা থেকে একেবারে বঞ্চিত। আমি প্রধানত গ্রন্থভুক্, প্রত্নতত্ত্ব গবেষকের মতো, সরেজমিনে তদন্ত করে তথ্য নিষ্কাশনের দক্ষতা আমার বিন্দুমাত্র নেই। এই গ্রন্থ বিভূতিভূষণের রীতিমত

জীবনী বা চরিতকথা নয়। এতে তাঁর জীবনের স্থূল কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করেছি মাত্র। সেই প্রসঙ্গে তাঁর সাহিত্যের দিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করেছি। এই প্রবন্ধ সাহিত্যের ছাত্র, তথ্যান্বেষী বা গবেষকের কাছে কতখানি মূল্যবান্ বলে বিবেচিত হবে বলা কঠিন; তবে বিভূতিভূষণের অনুরাগী পাঠক তাঁর জীবন আর সৃষ্টির স্মারক বলেও অন্তত এটিকে গ্রহণ করবেন আশা করি।

....২..

বিভূতিভূষণ আমাদের অতি নিকট কালের মানুষ, কিন্তু তাঁর জীবনের যথার্থ তথ্যানুসন্ধান করা কঠিন। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ১৩৫৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'শনিবারের চিঠিতে' 'বিভূতিভূষণের জীবন কথা' প্রকাশিত হয়—এটি ছিল সম্পাদকীয় রচনা, সম্ভবত সজনীকান্ত দাস এটি লিখেছিলেন। এটি বিভূতিভূষণের জীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ মূল্যবান্ লেখা—এই সংখ্যায় 'বিভূতিভূষণের গ্রন্থাবলী'ও মূল্যবান্ তথ্যের আকর। 'বিভূতি বিচিত্রা' গ্রন্থে বিভূতিভূষণের শ্যালক চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের জীবন বা গ্রন্থাবলী সম্পর্কে যে তথ্য সন্নিবেশ করেছেন তাও উল্লেখযোগ্য। 'শনিবারের চিঠি'র প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদটি উদ্ধার করে বিভূতিভূষণের জীবনকথা বিবৃত করার সমস্যাবলী স্মরণ করতে পারি।

"জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত বিভূতিভূষণের ধারাবাহিক জীবনী লিখিতে আরও সময় লাগিবে। অনেক তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন। স্বয়ং বিভূতিভূষণ এই আপাত-অজ্ঞতার কারণ। তিনি স্বীয় জীবনের সত্য-মিথ্যা ঘটনা লইয়া এমন জট পাকাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, জট খুলিয়া সত্য-মিথ্যা বাছিয়া একটা পাকা নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে যথেষ্ট অধ্যবসায় ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে

হইবে। কোনও একান্ত ভক্ত বা শ্রদ্ধাপরায়ণ বন্ধু এই কাজে নিষ্ঠার সহিত লাগিয়া থাকিলে জট খুলিতে পারিবেন। জট পাকানোর উপমা বোধ হয় ঠিক হইল না, সমস্ত ব্যাপারটাকে বিভূতিভূষণ ঘুলাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন বলিলেই ঠিক হইত। থিতাইয়া উপর হইতে তলা পর্যন্ত স্বচ্ছ হইতে না দিলে অনেক ভুল থাকিবার সম্ভাবনা। এসব কথা বলিতেছি খুঁটিনাটি সন তারিখের এবং স্থান-কাল-পাত্রের হিসাব ধরিয়া। বিভূতিভূষণের জীবনের দুই দিক,—এক আধ্যাত্মিক জীবন, দুই সাহিত্যিক জীবন। আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে সন তারিখ অনাবশ্যক; কিন্তু সাহিত্যিক জীবনের উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি বুঝিতে হইলে, কবে কি ঘটিয়াছে জানা না থাকিলে ইতিহাস যথাযথ ও সঙ্গত হইবে না। সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে তাঁহার লৌকিক জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সুতরাং সে জীবনকথাই আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।"

বিভূতিভূষণের জীবনের তথ্য বিভিন্ন লেখকের উক্তি থেকে হয়তো কিছুটা পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানেও বিভ্রান্তির আশঙ্কা আছে। বিভূতিভূষণ সম্পর্কে এইসব রচনা মুখ্যত স্মৃতিনির্ভর। স্মৃতিকথা হিসেবে এগুলি মূল্যবান। বিভূতিভূষণের সংস্পর্শে এসেছিলেন এমন অনেক মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনারও মূল্য আছে। এ-সবের মধ্য থেকে বিভূতিভূষণের ব্যক্তি-পুরুষের কিছুটা পরিচয় মেলে, কোনো কোনো সময় তাঁর কবিপুরুষের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁর জীবনের তথ্যানুসন্ধানের পক্ষে এগুলি বিশেষ সহায় হয় না। কোনো কোনো সময় একজনের কাছে যে তথ্য পাওয়া যায় অপরের উক্তির সঙ্গে তা মেলে না। লেখক বা বক্তার স্মৃতির দুর্বলতার সম্ভাবনা তো আছেই, তা ছাড়া বিভূতিভূষণ যখন পরিচিত সমাজে নিজের কথা কিছু বলেছেন তখন কিছুটা কল্পনারস মিশিয়েছিলেন বলে মনে হয়। অপুর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যেও কিছুটা ছিল না কি? 'শনিবারের চিঠি'র স্মৃতি সংখ্যায় গজেন্দ্রকুমার

মিত্রের 'মিথ্যারসিক বিভূতিভূষণ' প্রবন্ধটির উল্লেখ করে বিভূতিভূষণের প্রকৃতির এই বিচিত্র ধর্মের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তবে মিথ্যারসিক হলেও বিভূতিভূষণকে মিথ্যাবাদী বলে ভুল করার কোনো অবকাশ নেই। শুধুমাত্র তাঁর কল্পনাময় কবিমানসের সৃষ্টি সূক্ষ্ম আবরণ অপসারণ করলেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। সেজন্য বিচারশক্তি আর অধ্যবসায় থাকলেই যথেষ্ট।

'শনিবারে চিঠি'র সম্পাদক বলেছেন,

"সুখের বিষয়, উপকরণের অভাব নেই। অনেকগুলি উপন্যাসে আত্মীয়-পরিজনসহ তিনি নিজে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। তাহা ছাড়া, এক ধরনের বিচিত্র দিনলিপি লিখতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন।"

গল্প-উপন্যাসের মধ্য থেকে তাঁর জীবন-কাহিনী অবিষ্কার অভ্রান্ত না-ও হতে পারে। যদি অন্য কোনো সূত্র থেকে তাঁর জীবনের কোনো বিষয় তাঁর গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে স্থান পেয়েছে জানা যায়, তা'হলে অনুরাগী ও কৌতূহলী পাঠক অবিমিশ্র আনন্দ অনুভব করবেন। কিন্তু গল্প-উপন্যাস থেকে জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করার প্রয়াসে পণ্ডশ্রম হওয়ার আশঙ্কা আছে। দিনলিপিগুলির মধ্যে জীবনীর মূল্যবান উপাদান আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধুমাত্র ঐ দিনলিপি থেকে তাঁর জীবনচরিত লেখা সম্ভবপর নয়। তার সব চেয়ে বড়ো কারণ এই যে, এইগুলির মধ্যে দৈনন্দিন ঘটনার বিবরণ নেই। তাঁর মনের বিচিত্র ভাবনা এগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে। তিনি কেবল মাঝে মাঝে এমন কয়েকটি কথা বলেছেন যার মধ্যে থেকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কোনো কোনো ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সব উপাদানকে সুসংবদ্ধ আকারে গ্রথিত করা সহজসাধ্য নয়। আসলে আত্মজীবনী লেখার কোন আগ্রহ বিভূতিভূষণের ছিল না। তাঁর দিনলিপি তাঁর আত্মপ্রকাশের বহু উপায়ের মধ্যে একটি।—ভাবী জীবনীকারের জন্য উপাদান রেখে যাওয়ার জন্য মাথা-ব্যথা তাঁর ছিল না।

বিভূতিভূষণের দিনলিপি বর্তমানে যে আকারে পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকের একটি অভিযোগ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :

"পরিতাপের বিষয় এই যে, হিসাবী প্রকাশকেরা এই দিনলিপি ছাপিতে গিয়া সন-তারিখের খবর একেবারে বাদ দিয়াছেন। একমাত্র 'স্মৃতির রেখা'য় সন-তারিখ পাইতেছি। বাকি 'তৃণাঙ্কুর', 'ঊর্মিমুখর', 'উৎকর্ণ' এবং ভ্রমণ-দিনলিপি 'অভিযাত্রিক', 'বনে পাহাড়ে' ও 'হে অরণ্য কথা কও' এর কোথাও তারিখের বালাই নেই। পাণ্ডুলিপিও তাঁহারা রাখেন নাই, রাখিলে অনেক জিনিস উদ্ধার করা যাইত।"

৩

বিভূতিভূষণের বাবা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মা মৃণালিনী দেবী। মহানন্দের প্রথম স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী। হেমাঙ্গিনী রাণাঘাটের রায়বাহাতুর খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বোন। হেমাঙ্গিনী নিঃসন্তান ছিলেন। তিনিই একরকম জোর করে মহানন্দকে রাজি করিয়ে নিজেই উদ্যোগী হয়ে পাত্রীর সন্ধান করে মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে মহানন্দের বিয়ে দেন। এই বিয়ের তারিখ ১২৯৬ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ। মৃণালিনী দেবীর বাবা ঘোষপারা মুরাতিপুরের চট্টোপাধ্যায় গোষ্ঠীর গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায়,—তিনি তখন বর্ধমানে খোশবাগান পাড়ায় থাকতেন। মৃণালিনী দেবীর পাঁচটি সন্তান—বিভূতিভূষণ (২৮শে ভাদ্র, ১৩০১), ইন্দুভূষণ (১৮ই ভাদ্র, ১৩০৪), জাহ্নবী—ডাক নাম জায়ারী (৬ই চৈত্র, ১৩০৫), সরস্বতী বা আশালতা—ডাক নাম মণি (১১ই অশ্বিন, ১৩০৮) আর নুটবিহারী (৮ই শ্রাবণ, ১৩১২)। বিভূতিভূষণের ভাই-বোনদের কেউই জীবিত নেই। ইন্দুভূষণ পাঁচ বছর বয়সে মারা যান ; আশালতা বিয়ের অব্যবহিত পরেই মারা

যান; জাহ্নবী ১৩৪৬ সালে জলে ডুবে মারা যান; নুটবিহারী বিভূতিভূষণের মৃত্যুর (১৫ই কার্তিক ১৩৫৭) মাত্র এক সপ্তাহ পরে ২২শে কার্তিক ১৩৫৭ সালে অপঘাতে মারা যান। বিভূতিভূষণের পিতৃবিয়োগ হয় ১৩১৮ সালে। মৃণালিনী দেবী এর প্রায় আট বছর পরে মারা যান। হেমাঙ্গিনী দেবী আরও অনেকদিন বেঁচে ছিলেন।

মহানন্দের পরিচয় সম্পর্কে শনিবারের চিঠি পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয়েছে তা উদ্ধার করা হল:

"পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরোহিত্য ও কথকতা করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। কথকতায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরও অতিশয় মিষ্ট ছিল। দূর-দূরান্তরে নানাস্থানে তাঁহার ডাক পড়িত। তিনি নিজেকে প্রসিদ্ধ কথক উদ্ধব শিরোমণির শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেন। বালক বিভূতিভূষণ পিতার সহিত নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেন, ধর্মে মতি ও ভ্রমণে আসক্তি সম্ভবত ইহা হইতেই তাঁহার হইয়াছিল। লেখাপড়াও এই কারণে বিলম্বে আরম্ভ হয়। মহানন্দের আদি নিবাস ছিল চব্বিশ পরগণা জিলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত পানিতর গ্রামে। তাঁহার পিতামহ কবিরাজি করিতেন। যশোহর জিলার মহকুমা-শহর বনগ্রামের সন্নিকটে বারাকপুর গ্রামে তিনি কবিরাজি করিতে আসেন। নীলচাষের দৌলতে বারাকপুর তখন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। তিনি আর দেশে ফিরিয়া যান নাই। তাঁহার পুত্র তারিণীচরণ পুরাপুরি বারাকপুরের বাসিন্দা হইয়া যান। মহানন্দ তারিণীচরণের পুত্র। কথকতা করিতে করিতে মহানন্দ সংস্কৃত সাহিত্যে যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন, লোকে তাঁহাকে মহানন্দ শাস্ত্রী বলিয়া সম্মান করিত। কিন্তু অর্থোপার্জনে তিনি অনুরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তিনি খামখেয়ালী বাউণ্ডুলে প্রকৃতির ছিলেন, একস্থানে বেশী দিন থাকিতে পারিতেন না। উত্তরাধিকার সূত্রে বিভূতিভূষণ এই প্রকৃতি কতকটা পাইয়াছিলেন।"

'বিভূতি বিচিত্রা' সংকলন-গ্রন্থের ভূমিকায় মহানন্দের পরিচয় প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের শ্যালক চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,—

"পিতার নিকটেই পাঁচ বৎসর বয়স হইতে বিভূতিভূষণ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িতে শুরু করেন। পিতার কবি-মন, লিখিবার শক্তি, তীব্র অনুভূতি তাঁহার সাহিত্যিক জীবনে প্রেরণা যোগায়। বিভূতিভূষণও পিতার অনুকরণে অতি বাল্য বয়স হইতেই খাতায় পালা লিখিতে শুরু করেন। তৎপরে শৈশবে 'বঙ্গবাসী' কাগজের গ্রাহক হওয়ায় পৃথিবীর অনেক বিষয়ের দ্বার বিভূতিভূষণের নিকট খুলিয়া যায়। তাহা ছাড়া পিতা মহানন্দের পুস্তক সংগ্রহের বাতিক ছিল। তিনি পুত্রকে নানা জায়গা হইতে পুস্তক আনিয়া দিতেন। এইরূপে ঘোর অনটন ও দারিদ্র্যের মধ্যেও তাঁহার সাহিত্যে অনুপ্রেরণা ও কবিমনের বিকাশ ঘটে।"

মহানন্দ তাঁর সংগীত সংগ্রহের খাতায় এক অংশে বিভূতিভূষণের জবানীতে পয়ার ছন্দে একটি কুলপরিচয় লিখেছিলেন। এটি কৌতূহলী পাঠকের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় বলে মনে হবে।

কুলপরিচয়

কুলপরিচয় মম শুন সর্বজন।
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ হই ব্রহ্মপরায়ণ॥
ফুলিয়া খড়দহ সর্বানন্দী আর
বল্লভী নামেতে আছে বাঁধা মেল চার॥
খড়দহ মেলেতে থাকি কুলে বড় খাঁটি।
বিভূতিভূষণ নাম আমি বন্দ্যঘাটী॥
নবাই সবাই আর বিখ্যাত সুন্দর।
ছিলেন পূর্বপুরুষ তিন সহোদর॥
সুন্দরের বংশাভাব এই কথা খ্যাত।
নবাই সন্তান নানা স্থানে পরিচিত॥
মধ্যম সবাই বড় ধর্মপরায়ণ।

তস্য বংশধর আমি করহ শ্রবণ ॥
ভাবে ভঙ্গ নহে ব্যঙ্গ প্রবরেতে তিন।
শাণ্ডিল্য গোত্র মম কভু নাহি হীন ॥
কুলীনের পরিচয় আর কত চাও।
মেকী টাকা নহি আমি বাজাইয়া নাও ॥

(বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিতা' এই দু'টি আত্মকথা-নির্ভর উপন্যাসে তাঁর বাবা-মায়ের ছবির আদল এঁকেছেন। অপুর বাবা হরিহর রায়ের মধ্যে মহানন্দের পরিচয় অনেকখানি ফুটে উঠেছে। মহানন্দের সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি, কথকতার শক্তি, সংসারে প্রকৃত আসক্তির অভাব, খামখেয়ালিপনা, কল্পনাপ্রবণতা হরিহরের মধ্যে ফুটে উঠেছে।) বিভিন্ন গ্রন্থ সংগ্রহ বা বঙ্গবাসীর গ্রাহক হওয়ার কথা 'পথের পাঁচালী'তে পাওয়া যায়। (অবশ্য বিভূতিভূষণ হরিহর চরিত্র আঁকতে গিয়ে মহানন্দের আদলটুকুই নিয়েছিলেন, 'পথের পাঁচলী'র অন্য সব চরিত্রের মতোই এটিও কল্পনা দিয়ে গড়া।

বরং সর্বজয়ার চরিত্রে তাঁর মায়ের ছাপ আরও বেশি করে পড়েছে। 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপিতে তিনি নিজেই লিখেছেন,—

'সর্বজয়ার একটা অস্পষ্ট ভিত্তি আছে—আমার মা। কিন্তু যারা আমার মাকে জানে, তারাই জানে সর্বজয়ার সবখানি আমার মা নন।' সবখানি না হলেও মৃণালিনী দেবীর অনেকখানিই সর্বজয়ার মধ্যে পড়েছে বলে অনুমান করা যেতে পারে। সংসারের বৈষয়িক দিকটায় মহানন্দের দৃষ্টি ছিল না। তার ফলে সংস্কৃত সাহিত্যে বা কথকতায় ব্যুৎপত্তি হলেও অর্থোপার্জনের দিকে তিনি তেমন মন দিতে পারেন নি। ফলে তাঁর সংসারে অনটন আর দারিদ্র্য লেগেই ছিল। মৃণালিনী দেবীকে ঐ অভাবের সংসার কীভাবে চালাতে হত, 'পথের পাঁচালী'তে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই অংশে সর্বজয়ার চরিত্রের কল্পনায় বিভূতিভূষণ তাঁর মা'র স্মৃতিটুকু ফুটিয়ে

তুলেছেন বলে মনে হয়। অভাব-অনটনের মধ্যেও তিনি ছেলে-মেয়েদের সাধ মেটানোর জন্য প্রাণপাত করতেন।)

'স্মৃতির রেখা' দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ মৃণালিনী দেবীর কথা স্মরণ করে লিখেছেন,—

'মা ছিলেন গৃহলক্ষ্মী, এই দরিদ্র ঘরে বিবাহ হওয়া পর্যন্ত এসে অল্প সাজিয়ে গুছিয়ে চালিয়ে গিয়েছেন। সেই চাল ভাজা—সেই সব। ঘরকন্না সাজাবার বুদ্ধি যেমন মেয়েদের থাকে, তার বেশী তারা কিছু জানে না, বোঝেও না। মাও ছিলেন তেমনি। মা চিরদিন ঐ বাঁশবনের ঘাটে, তেঁতুলতলায় শান্ত জীবনযাত্রা সংকীর্ণ ছোট গণ্ডীর মধ্যেই কাটিয়ে গিয়েছেন—সে জীবনের বাইরে তিনি অন্য কোন জীবনের সন্ধানও জানতেন না। তাই তাঁর সজনে গাছ পোঁতা, হরি রায়ের জমি নেবার পরামর্শ, বিয়ে না করতে চাওয়ায় সংসার উল্টে গেল এই ভাবে কান্না—যেন সত্যই তাঁর সংসার উল্টেই গেল—তাঁর সংসার —আমার সংসার নয়।'—[১. ৩. ১৯২৮]। বিভূতিভূষণ যখন বিহারের কমলাকুণ্ডুতে বসে এই দিনলিপিটি লিখছেন, তখন দেশকালের বিস্মৃতির একটা চেতনা তাঁকে আবিষ্ট করেছিল—সেজন্য ঘরোয়া জীবনের অপেক্ষাকৃত সীমিত বাতাবরণকে তিনি যেন উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মায়ের প্রসঙ্গে বালকজীবনের স্নিগ্ধ স্মৃতির ছাপ কেমন ফুটে উঠেছে।

('পথের পাঁচালী'র আর একটি চরিত্র ইন্দির ঠাকরুনের মূল মেনকা দেবী—বিধবা হবার পর তিনি জ্ঞাতিভাই মহানন্দের বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন।)

হেমাঙ্গিনী দেবীর ছবি তাঁর কোনো লেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কিনা বলা যায় না।

বিভূতিভূষণের জন্ম হয় মামার বাড়ি—কাঁচড়াপাড়া হালিশহরের কাছে মুরাতিপুর গ্রামে। তাঁর জন্মের তারিখ ১৩০১ সালের ২৮শে ভাদ্র, বুধবার, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর। মহানন্দের খাতায়

বিভূতিভূষণের জন্মপত্রিকা আছে। তা থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা হল :

"জন্মপত্রিকা

(শুক্লপক্ষ) ১৩০১ সাল ২৮শে ভাদ্র বুধবার দিবা ১০॥ সাড়ে দশ ~~ঘন্টার~~ সময় আমার বিভূতিভূষণ পুত্রের জন্ম হয়॥ মুরাতিপুর গ্রামে। ইংরেজী ১৮৯৪। ১২ সেপ্টেম্বর। দিবা ৩০।৪২ রাত্র ২৯।১৮

২৮শে ভাদ্র বুধবার ত্রয়োদশী ৬০। শ্রবণা নক্ষত্র ১২।৪৫ ইং দিবা ১০।৫৮ কৌলবকরণ অতিগণ্ড যোগ ১৯।২২ ইং দিবা ১।৪৮।৪৮ যাত্রা নাস্তি পাপযোগ……জন্মে মকর রাশি দেবগণ শূদ্রবর্ণ……

শ্রীমহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী কথক

সাং বারাকপুর। মহকুমা বনগ্রাম"।

ঐ খাতায় বিভূতিভূষণের উপনয়নের কথাও লেখা আছে।—

"বিভূতিভূষণের উপনয়ন

শুক্লপক্ষ চন্দ্র ফাল্গুন আমার পুত্র শ্রীমান বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবাজীর উপনয়ন সন ১৩১৩ সাল ৫ ফাল্গুন রবিবার পঞ্চমী তিথিতে দেওয়া গেল। বারাকপুর ইং ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৭"।

……………………………৪……………………………

(বিভূতিভূষণের সঙ্গে তাঁর জন্মভূমি বারাকপুর আর তার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী ইছামতীর একেবারে নাড়ীর যোগ। সাধারণ দরিদ্র ঘরে তিনি জন্মেছিলেন, সুতরাং গ্রামের মধ্যে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াবার কোনো বাধা ছিল না। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মুগ্ধ হওয়ার আশ্চর্য রকম ক্ষমতা ছিল।) (অপুর শৈশবে যে বিমুগ্ধ কৌতূহল ফুটে উঠেছে তা তাঁর নিজের প্রকৃতিতেই ছিল।) অবশ্য গ্রামের নদী আর প্রকৃতির সৌন্দর্য শৈশবে, বাল্যে তাঁর অন্তরে

কোনো সচেতন চিন্তা জাগিয়েছিল এ কথা বলা যায় না। ঐ বয়স শুধু বিমুগ্ধতার কাল। অনেক বছর পরে প্রায় সাতাশ আটাশ বছর বয়সে খেলাৎ ঘোষের জমিদারিতে দিনলিপি লিখতে লিখতে গ্রামের এই নদীর কথা স্মরণ করেছেন।,—

'বড় বাসার নির্জন ছাদটায় নির্জন শীতসন্ধ্যায় গঙ্গার বুকের শেষ রোদ মিলিয়ে যাওয়া ঝিকিমিকি ছায়াভরা রোদের রেশটুকুর দিকে চেয়ে চেয়ে দূর ইছামতীর বুকের একটা অন্ধকারঘন তীরের কথা মনে পড়ল।

জীবনে কত ভাল জিনিস পেয়েচি সে কথা আগাগোড়া ভেবে দেখলুম। কি গ্রামেই জন্মেছিলুম। এই তো আরা জেলা ছাপরা জেলা ঘুরে এলুম। কোথায় সেই পরিপূর্ণ সুন্দর স্নিগ্ধ শ্যামলতা, সেই বাঁশবন, ঝোপঝাড়। বড় ভালবাসি তাদের, বড় ভালবাসি, বড় ভালবাসি! কেউ জানে না কত ভালবাসি আমি আমার গ্রামকে—আমার ইছামতী নদীকে, আমার বাঁশবন, শেওড়া ঝোপ, সোঁদালী ফুল, ছাতিম ফুল, বাবলা বনকে। সে ছায়া, সে স্নিগ্ধ মাতৃস্নেহ আমার গ্রামের, সে সব অপরাহ্ণ—আমার জীবনের চির-সম্পদ হয়ে আছে সে। তারাই যে আমার ঐশ্বর্য। অন্য ঐশ্বর্যকে তাদের কাছে তৃণের মত গণ্য করি।'—স্মৃতির রেখা।

ইছামতীর দু'পাশে প্রকৃতির যে রূপ তিনি দেখেছেন কেবল সেটুকুই নয়, এই গ্রাম-নদীর কূলে কূলে যে জীবনধারা বয়ে চলেছে তার স্মৃতি তাঁর মনে জেগেছে। এই সময়েই তিনি ইছামতীর প্রকৃতি আর মানুষের গল্প লেখার কথা ভেবেছেন। ('পথের পাঁচালী'র মধ্যে বারাকপুরের গ্রামের প্রকৃতির ছবিই দেখা যায়;) ইছামতীর প্রেম তাঁর মনে আরও পরে গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। 'ইছামতী' উপন্যাসে যে প্রেম শিল্পের আকারে ফুটে উঠেছে তা তাঁর সকল সত্তা জুড়ে ছিল। 'হে অরণ্য কথা কও' দিনলিপির গোড়ার দিকে কল্যাণী দেবীকে নিয়ে ইছামতীতে নাইতে যাওয়ার সঙ্গে 'ইছামতী'র

ভবানীর তিলুকে নিয়ে ইছামতীতে নাইতে যাওয়ার ছবি দুটি পাশাপাশি একবার কল্পনা করলেই বোঝা যাবে ইছামতী তাঁকে কী করে টেনেছিল।

চণ্ডীদাস 'বিভূতি বিচিত্রা'র ভূমিকায় বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-প্রেমের বিকাশের আর একটি সূত্রের ইঙ্গিত করেছেন। বিভূতিভূষণ যখন বনগ্রাম হাইস্কুলে ভর্তি হন, তখন,—

"প্রথমে তিনি হাঁটিয়াই দুই বেলা স্কুলে যাইতেন। এই সময়েই গ্রাম বাংলার পল্লীপ্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য তাঁহার চোখে মায়াঞ্জন বুলায়। পথের দুই পাশের শোভা তাঁহার নিসর্গপ্রীতি বর্ধিত করে।"

নগেন্দ্রকুমার গুহরায় 'শনিবারের চিঠি'র বিভূতি সংখ্যায় বলেছিলেন,—

"তপোবনকে বাদ দিয়া যেমন কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলা কাব্যের কল্পনা সম্ভব নয়, তেমনই গ্রামকে বাদ দিয়া বিভূতি-সাহিত্যেরও কল্পনা অসম্ভব। গ্রাম, গ্রাম্য পরিবেশ, গাঁয়ের মানুষ, পল্লীবাসীর সহজ-সরল জীবনধারা, গ্রামের বনজঙ্গল, তরু-লতা, ফল-ফুল, পাখীর কূজন, নদীর জল-কলতান, এই সমস্ত ছিল তাঁহার সৃজনীশক্তির গোমুখী।"

কেবল বারাকপুর বা ইছামতী নয়, বনগাঁ, রাণাঘাট, বসিরহাট—সারা অঞ্চলটি বিভূতিভূষণের লেখায় ফুটে উঠেছে।

"বন্যপ্রকৃতির নিকেতন পথের পাঁচালীর দেশ—কুঠির মাঠ, কুলতার ঘাট, মাধবপুরের চর, নতীডাঙ্গার মাঠ, মরগাং ছিরেপুকুর, বিলবিলে, ইছামতীর তীর—সমগ্র বনগ্রাম মহকুমা।"—১৭ই কার্তিক —বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বনগাঁ), কথাসাহিত্য অগ্রহায়ণ '৫৭।

এই যেসব অঞ্চলে তাঁর বাল্যকাল বা কৈশোর কেটেছে তাদের স্মৃতি ছিল তাঁর সারা অন্তর জুড়ে। তাঁর বিভিন্ন লেখায় এইসব জায়গা ফিরে এসেছে। বনগাঁ স্কুলের বোর্ডিং ('অপরাজিত'), রাণাঘাটের বিভিন্ন অংশ, ইছামতীর তীরে গ্রাম্য উৎসব 'তেরের

পালুনি' ('ইছামতী'), নীলকুঠির ভগ্নাবশেষের স্মৃতি ('পথের পাচালী', 'ইছামতী'), আড়ংঘাটার যুগলকিশোর (ইছামতী', 'ক্ষণভঙ্গুর'-এ 'বুধোর মার মৃত্যু' গল্প, 'স্মৃতির রেখার এক ছত্র'—'বাবার করুণ স্মৃতিমাখা আড়ংঘাটার কথা কি কখনো ভুলবো ?')—এমন অজস্র বিষয়ের উল্লেখের সঙ্গে তাঁর শৈশবের স্মৃতি মিশে আছে। অপু থেকে আরম্ভ করে ভবানী পর্যন্ত এই স্মৃতির জগতেই বিহার করেছে। এখানকার কথা লেখার সময় বিভূতিভূষণ যেন বালক বয়সের স্মৃতিতে ফিরে গেছেন। নিজের বালক বয়সের কথা স্মরণ করে 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপিতে তিনি লিখেছিলেন,—

'কোথায় লেখা থাকবে এক মুগ্ধমতি আট বৎসরের বালকজীবনে প্রথম গ্রামের উত্তর মাঠে তার জ্যাঠা মশায়ের সঙ্গে বেড়িয়ে এসে কি আনন্দ পেয়েছিল ? কোথায় লেখা থাকবে তার মায়ের হাতে ভাজা তালের পিঠে খাওয়ার কাহিনী ?···গোপালনগরের বারোয়ারী যাত্রা দেখতে গিয়ে তাই সে ছেলেটার কথা মনে পড়লো যে আজ পঁচিশ বছর আগে কৃষ্ণ ঘোষের তামাকের দেকানের বারান্দাতে বসে তার বাবার সঙ্গে যাত্রা দেখতে দেখতে দময়ন্তীর দুঃখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত।'

('পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' উপন্যাস দু'টি বাল্যস্মৃতির মাধুর্য-লোকে বিচরণের আনন্দ-কল্পনার অফুরন্ত উৎস হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দিনলিপি বা গল্পের মধ্যে এই স্মৃতিবিহার দেখা যায়। কিন্তু বাল্য-স্মৃতির মাধুরী বার বার স্মরণ করলেও বিভূতিভূষণের মনোভঙ্গিটি ইংরেজীতে যাকে nostalgia বলে, সেই বর্তমান-বিমুখ স্মৃতিনির্ভর অতীতাশ্রয়িতা নয়। ইছামতী-বারাকপুর তাঁর কাছে কোনো দিন হারানো জগৎ বলে মনে হয় নি—তিনি এই জগতের সমস্ত সৌন্দর্য বা মাধুর্য তাঁর জীবন ভরে পেয়েছিলেন। যা স্মৃতির আনন্দ ছিল তাই ক্রমে গাঢ় হয়ে একটি নিবিড় চেতনায় পরিণত হয়েছে।

এই অঞ্চলের শুধু প্রকৃতি নয়, মানুষের ছবিও তাঁর লেখায় ফুটে

উঠেছে। অবশ্য তাঁর দিনলিপিতে তিনি মানুষ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। 'উর্মিমুখর' থেকে কয়েক ছত্র :

'আমাদের দেশের প্রকৃতি অদ্ভুত, কিন্তু মানুষগুলো বড় খারাপ। পরস্পর ঝগড়া, দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, পারিবারিক কলহ, জ্ঞাতিবিরোধ, সন্দেহ-কুসংস্কার এতে একেবারে ডুবে আছে। লেখাপড়া বা সৎ চর্চার বালাই নেই কারো।'

গ্রামের মানুষদের চেয়ে গ্রামের প্রকৃতিকে বেশি ভালোবাসলেও গ্রামের মানুষকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। গ্রামের সাধারণ মানুষের অনেকেই তাঁর কাছে অসাধারণ বলে মনে হয়েছিল। অল্প একটু অবকাশ পেলেই তাঁর কল্পনা তাদের কোনো কথা বা জীবন অবলম্বন করে বহুদূর যেত। অপুর কথায় তাঁর নিজেরই শৈশবের কল্পনার ছবি দেখি। ঐ সব সাধারণ মানুষের ছবি কখনও কখনও তাঁর লেখায় হুবহু ফুটে উঠেছে; আবার কোথাও কোথাও তিনি কল্পনা দিয়ে মানুষকে একটু নতুন করে গড়েছেন।

বিভূতিভূষণ ছোটোবেলায় নদীর তীরে বা বনের ধারে নির্জনে দাঁড়িয়ে নিজের মনে গল্প বলে যেতেন শোনা যায়। আপন মনে কথা বলার এই ঝোঁক তিনি অপুর মধ্যে দেখিয়েছেন। এ অবশ্যই স্বেচ্ছা বিচরণের আশ্চর্য পন্থা।

৫

বিভূতিভূষণের শিক্ষা শুরু হয় সম্ভবত বাবা মহানন্দের কাছেই। মহানন্দ বিভূতিভূষণকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়ান জানা যায়। তবে মহানন্দের কাছে বিভূতিভূষণ নিয়মিত পড়েন নি। শৈশবে তিনি বিভিন্ন গ্রামের পাঠশালায় পড়েছিলেন।—

"চার জন পণ্ডিতের পাঠশালায় বিভূতিভূষণের শৈশব বিদ্যাভ্যা-

সের খবর পাইতেছি—রঘুপণ্ডিতের, বিপিন মাষ্টারের, প্রসন্ন গুরু-মহাশয়ের এবং হরি রায়ের। দ্বিতীয়টি সম্ভবত মাতুলালয় মুরাতিপুরে, তৃতীয়টি হুগলীর সন্নিকটে শাগঞ্জ কেওটায় এবং প্রথম ও চতুর্থটি বারাকপুরে। কোনটির পর কোনটি আজ সঠিক নির্ধারণ করিবার উপায় নাই।"—শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭।

বিভূতিভূষণ 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপিতে একজন গুরুমশায়ের উল্লেখ করেছেন,—

'আমি আর মোহিতবাবু প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায় খুঁজতে খুঁজতে গেলাম।'

এ ছাড়া বারাকপুরের হরি রায়ের উল্লেখ বিভিন্ন দিনলিপিতে পাওয়া যায়।

এইসব পাঠশালায় বহু বিচিত্র মানুষের সমাবেশ হত। অপুর পাঠশালার জীবনে তার ছবি আছে। জিতুর নিজের পাঠশালার কথাও মনে করতে পারি। পাঠশালার গতানুগতিক শিক্ষা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল কিনা বলা যায় না। পাঠশালার সঙ্গীদের স্মৃতিও তেমন উজ্জ্বল নয়।

পাঠশালার পড়াশোনা নিয়মিত হয়েছিল কিনা বলা কঠিন। যাই হোক, এর পর বিভূতিভূষণ সম্ভবত ১৩০৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি বনগ্রাম হাই স্কুলে ভর্তি হন। প্রথম দিকে তিনি গ্রাম থেকে রোজ ছ'মাইল পথ হেঁটে স্কুলে যেতেন, তারপর তিনি বনগ্রাম স্কুলের হোস্টেলে ছিলেন। মাঝে তিনি বনগাঁর সরকারী ডাক্তার বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারে কিছুকাল থাকেন—তিনি তাঁর ছেলেকে পড়াতেন। ঐ পরিবারের সঙ্গে বিভূতিভূষণের যোগ পরেও ছিল। বিধুবাবু বদলি হয়ে গেলে বিভূতিভূষণ বোর্ডিং-এ ফিরে আসেন। এই দুই জায়গার স্মৃতিই তিনি কিছুটা কল্পনা মিশিয়ে 'অপরাজিত' উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সে সময় বনগ্রাম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন চারুচন্দ্র

মুখোপাধ্যায়। চারুচন্দ্রের সান্নিধ্য বিভূতিভূষণের জীবনে বিশেষ মূল্যবান হয়েছিল। চারুচন্দ্র একজন অকৃত্রিম জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। তিনি ইতিহাসে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, অন্য বিষয়েও তাঁর আকর্ষণ কম ছিল না। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একজন উৎসাহী কর্মীও ছিলেন। বাল্যে মহানন্দের উৎসাহেই বিভূতিভূষণের বই পড়ার আগ্রহ জেগে উঠেছিল। চারুচন্দ্রের সংস্পর্শে আসার পর তাঁর উৎসাহে বিভূতিভূষণের ঐ আগ্রহ রীতিমত জ্ঞানপিপাসায় পরিণত হয়।

চারুচন্দ্র ছাত্রবৎসল ছিলেন। বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পর তাঁর এক সতীর্থ বনগাঁর বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার সময় চারুচন্দ্রের কথা স্মরণ করেছেন,—

"যখন আমরা উভয়ে বনগাঁ স্কুলের ছাত্র তখন পরম শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক স্বর্গত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,—দশজনের একজন হোয়ো না, হাজারের একজন হওয়ার চেষ্টা কোরো।"—১৭ই কার্তিক, কথা সাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।

বিভূতিভূষণ তাঁর 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসটি চারুচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন।

বিভূতিভূষণ বনগ্রাম হাই স্কুল থেকেই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর কলকাতায় কলেজে পড়াশোনার পালা। সেকালের কলকাতা একালের তুলনায় অনেক ফাঁকা থাকলেও কলকাতার বিচিত্র রূপ যে কল্পনাপ্রবণ গ্রামবালক বিভূতিভূষণকে মুগ্ধ করেছিল তার আভাস তাঁর 'পথের পাঁচালী'র মধ্যে পাওয়া যায়। অপুর মতোই তিনিও রিপন কলেজে পড়েছিলেন। এখান থেকেই তিনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে আই.এ. পরীক্ষায়, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিস্টিংশনে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি অল্প কিছু দিনের জন্য ইতিহাস নিয়ে এম. এ. পড়েছিলেন, ল ক্লাশেও ভর্তি হয়েছিলেন।

কলেজের কাছ থেকে বিভূতিভূষণ কী পেয়েছিলেন তা বলা শক্ত।

এপ্রসঙ্গে কালিদাস রায়ের একটি বর্ণনা কৌতুককর বলে মনে হবে।

"বিভূতি রিপন কলেজ হতে বি.এ. পাশ করে। যখন তার খ্যাতি দেশময় হ'ল তখন বিভূতিকে কলেজের পক্ষ থেকে অভিনন্দন দেওয়া হ'ল। সভাপতি ছিলেন বীরবল (প্রমথ চৌধুরী)। বিভূতিকে শেষে দু'কথা বলতে হ'ল। তাতে কলেজের পড়ার সময় কিরূপ ক্লাস ফাঁকি দিত তার সতীর্থদের সঙ্গে কি সব ছেলেমানুষি করত, তারই কয়েকটা টুকরা টুকরা স্মৃতিকথা বলে বক্তব্য শেষ করল। সভার পর বিভূতিকে বললাম, 'তুমি কি পাগলের মতো বললে! কলেজের অধ্যাপকদের লেকচার শুনে যে কতটা তুমি উপকৃত হয়েছ, তোমার সাহিত্যিক প্রতিভায় কলেজের দান কতখানি তার সম্বন্ধে তুমি একটা কথাও ত বললে না।' বিভূতি বললে, 'দাদা মিথ্যে কথা ত' অনেক লিখি, কিন্তু একটা গণ্যমান্য লোকের সভায় দাঁড়িয়ে গলগলে মিথ্যে কথাটা কি করে বলব? যে জন্যে এঁরা আমাকে অভিনন্দন দিলেন তার সঙ্গে কলেজের কি সম্বন্ধ আছে বলুন। এই কলেজ থেকে পাশকরা একজন পি.এইচ.-ডি. কি আই. সি.এস.কে এঁরা অভিনন্দন করলে তিনি যা বলতেন আমি কি করে তা বলব? আমি কি ছাই কলেজের কোন লেকচার মন দিয়ে শুনেছি? আমার এডুকেশন সম্বন্ধে বীরবল যা বললেন তাই, এ এডুকেশন ঐ যশোর জেলার সেই পল্লীর কলেজে। আর এই কলেজ হ'তে পাশ করে আমি একটা মাষ্টারি পেয়েছি, তার জন্য ধন্যবাদ ত' দিয়েছি।"—মানুষ বিভূতিভূষণ, কথাসাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।

ক্লাশরুমের গতানুগতিক বক্তৃতায় বিভূতিভূষণ লাভবান হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তবে কলেজের জীবনে জ্ঞানের যে একটা বিরাট পরিসর তাঁর সামনে খুলে গিয়েছিল অপুর কলেজ-জীবনের বর্ণনা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বাল্য আর কৈশোরের জ্ঞানপিপাসা এই সময়ে অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

(বিভূতিভূষণের জীবনের আর একটা বড়ো সম্পদ তাঁর দারিদ্র্য। মহানন্দের সংসারে সচ্ছলতা কোনোদিন ছিল না। তিনি কোনো-দিনই বৈষয়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন না। অর্থ উপার্জনের দিকে তিনি কোনোদিনই মন দেননি। সেজন্য বিলাস আড়ম্বর তো দূরের কথা, তাঁর সংসারে কষ্টেসৃষ্টে মোটা ভাতকাপড় জুটত। মৃণালিণী দেবী বহু কষ্টে সংসার চালাতেন। বিভূতিভূষণের শৈশব ঐ দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। 'পথের পাঁচালী'তে অপু-দুর্গাকে নিয়ে সর্বজয়ার সংসারের বর্ণনায় ঐ দারিদ্র্যের একটা নিখুঁত ছবি আছে।)

বিভূতিভূষণ যখন বনগ্রাম স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, তখন মহানন্দ মারা যান। সেই সময় চারটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে মৃণালিনী দেবীকে যে কীভাবে সংসার চালাতে হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। বালক বিভূতিভূষণ গৃহশিক্ষকতা করে কোনোরকমে পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন। এর পর কলকাতায় কলেজ-জীবন তো রীতিমত কৃচ্ছ্রসাধন। 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপুর দারিদ্র্যের যে ছবি আছে তা তাঁর নিজের জীবনেরই কথা।

জীবনের একেবারে শেষ দিকে, যখন তিনি লেখক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন ছাড়া তিনি কখনও সচ্ছলতার মুখ দেখেন নি। তিনি যে সব চাকরি করেছেন তাতে অবস্থা ফেরার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। অবশ্য দারিদ্র্যে, দুঃখে তিনি কোনোদিন বিচলিত হন নি। 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপির মধ্যে তিনি বলেছেন,—

'দুঃখ জীবনের বড় সম্পদ, মহৎ সম্পদ, শোক, দারিদ্র্য, ব্যর্থতা বড় সম্পদ, মহৎ সম্পদ। যে জীবন শুধু শুধু ধনেমানে, সার্থকতায়, সাফল্যে, সুখসম্পদে ভরা, শুধুই যেখানে না চাইতে পাওয়া, শুধুই

চারিধারে প্রাচুর্যের, বিলাসের মেলা—যে জীবন অশ্রুকে জানে না, অপমানকে জানে না, আশাহত ব্যর্থতাকে জানে না, যে জীবনে শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় বহুদিন-হারা মেয়ের মুখ ভাববার সৌভাগ্য নেই, শিশুপুত্র খেতে চাইলে পিটুলি-গোলা খাইয়ে প্রবঞ্চনা করতে হয়নি, সে জীবন মরুভূমি। সে সুখসম্পদ ধনসম্পদভরা ভয়ানক জীবনকে আমরা যেন ভয় করতে শিখি।'

এই দারিদ্র্য বিভূতিভূষণের চরিত্রে সম্পদের প্রতি একটা অনাসক্তি এনে দিয়েছিল। এই অনাসক্তি আর স্বল্পতুষ্টতার জন্যই তিনি সব সময় সব অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কালিদাস রায়ের একটি মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য।—

"দরিদ্র সংসারের লোক, পরে অবস্থার পরিবর্তন হলে সাধারণতঃ প্রথম জীবনের দারিদ্র্যের কথা গোপন করবারই চেষ্টা করে। বিভূতির তাত' ছিলই না, বরং সে তার প্রথম জীবনের দারিদ্র্যের গর্বই করত।

তার লেখা যাঁরা ভালো করে পড়েছেন তাঁরাই জানেন দারিদ্র্যের চিত্রটাই তাঁর হাতে ফুটত খুব ভালো—ধনীপরিবারের চিত্র তাঁর লেখায় নেই বললেই চলে। এই চিত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলি তাঁর নিজের জীবনের।—নয়ত তাঁর চোখে দেখা চারিপাশের লোকের জীবনের রঙ্গিন ফোটো। নিজের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই বিভূতির বিভূতিলাভে অপূর্ব সাহিত্য হয়ে উঠেছে।—বহু লেখার আখ্যান ভাগ নিজেরই কৃচ্ছ্র কণ্টকিত বন্ধুর জীবনপথের অকুণ্ঠিত নিঃসঙ্কোচ পরিচয়।

মোট কথা, যে দৈন্য তার চরিত্রগঠন করেছে, যে দৈন্য তার সুপ্ত শক্তিকে উন্মেষিত করেছে, যে দৈন্য তার লেখার উপাদান, প্রেরণা ও রস-সঞ্চার করেছে, তার প্রতি তার কৃতজ্ঞতার যেন সীমা ছিল না, তার কাছে সে যেন চিরঋণী হয়েই ছিল। তাই তার রচনার অঙ্গেও যেমন, তার জীবনের অঙ্গেও তেমনি যেন দৈন্যের নামাবলীখানি সে জড়িয়ে রেখেছিল। দৈন্যের প্রতি এত গভীর শ্রদ্ধা আমরা শরৎচন্দ্রেও

পাইনি। দৈন্যই ছিল তার বিভূতি, তাকেই ভূষণ করে সে অন্বর্থনামা। তার বই-এর আয় ইদানীং কি দাঁড়িয়েছে তা আমি জানি, এই আয়ে অন্যের পক্ষে যা স্বাভাবিক, স্বল্প-পরিজন নির্ঝঞ্ঝাট সংসারের কর্তা হয়েও বিভূতির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি।"—মানুষ বিভূতিভূষণ, কথাসাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।

অবশ্য বিভূতিভূষণ দারিদ্র্যবিলাসী ছিলেন না—গরিবিয়ানার বড়াইও তিনি করেননি। যে সহজ ছিল তাঁর প্রকৃতিতে তাই তাঁকে আড়ম্বরহীন অকপট জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

....৭..

বিভূতিভূষণ যখন কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন তখন, সম্ভবত ১৩২৩ সালে তাঁর বিয়ে হয়। পাত্রী বসিরহাটের মোক্তার পানিতর গ্রামের কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে গৌরী দেবী।

বিভূতিভূষণের বয়স তখন তেইশ-চব্বিশ বৎসর। তাঁর রোমান্টিক কল্পনা যে নববধূকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়ে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁর প্রথম যৌবনের স্বপ্ন বড়ো নিষ্ঠুরভাবেই ভেঙেছিল। বিয়ের প্রায় বছরখানেক পরে কার্তিক বা অঘ্রান মাসে গৌরী দেবী মারা যান। চণ্ডীদাসবাবু গৌরী দেবীর নিউমোনিয়ায় মৃত্যুর কথা বলেছেন। আর একটি জনশ্রুতি অনুসারে গৌরী দেবী হঠাৎ কলেরায় মারা যান। কল্যাণী দেবী এই জনশ্রুতির কথা শুনেছিলেন।

ঐ জনশ্রুতি অনুসারী একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, গৌরী দেবী তখন বাপের বাড়িতে ছিলেন। বিভূতিভূষণ হঠাৎ শ্বশুরবাড়ি থেকে বাহক মারফৎ চিঠি পেয়ে এক বস্ত্রে নৌকা করে শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। পথেই শ্মশানে নেমে তিনি গৌরী দেবীর চিতা

দেখতে পান। গৌরী দেবী আর তাঁর মা বা অন্য নিকট আত্মীয় কলেরায় মারা গিয়েছিলেন। মৃত্যুরূপা নিয়তির এই আকস্মিক আঘাতে বিভূতিভূষণ বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন।

জনশ্রুতি সত্য হোক বা নাই হোক, গৌরী দেবীর মৃত্যু বিভূতি-ভূষণের জীবনে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা সন্দেহ নেই। প্রথম যৌবনে নিকটতম—অন্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একান্ত প্রিয়তমের এই আকস্মিক মৃত্যু তাঁর সারা সত্তাকে আলোড়িত করেছিল। গৌরী দেবীর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য জীবনযাপনের সাধ শুরুতেই শেষ হয়েছে—অপু-অর্পণার সংসারের ছবিতে সেই সাধ তিনি কল্পনায় পূরণ করেছিলেন। গৌরী দেবীর মৃত্যুতে তিনি যেন মৃত্যুর নিগূঢ় রহস্য উন্মোচন করতে উৎসুক হয়েছেন। সম্ভবত এই সময়েই তাঁর বোন আশালতা বিয়ের অল্পকাল পরেই হঠাৎ মারা যান। আশালতা আর গৌরী দেবী প্রায় সমবয়সী ছিলেন তাঁদের পরস্পরের সম্পর্ক সখীর মতো হওয়াই স্বাভাবিক। এই দুই মৃত্যু বিভূতিভূষণের কল্পনাকে অন্তর্মুখী করে তুলেছিল।

পরিণত বয়সে 'হে অরণ্য কথা কও' দিনলিপিতে গৌরী দেবীর কথা স্মরণ করেছেন।

'গৌরীর কথা—আজ ২১শে নভেম্বর, সেই ২০ নং গোপাল মল্লিক লেনে এই সময়ে প্রথম গিয়েচি, সেই উদ্বেগ, "যতবার আলো জ্বালাতে চাই" সেই গানটার কথা। এই সময়েই সে মারা যায়। জাহ্নবীর কথা—সেও এই সময়, বোধহয় আজই হবে।'

তাঁর দিনলিপির মধ্যে তিনি বহুবার গৌরী দেবীকে স্মরণ করেছেন বলে মনে হয়—তার সবগুলো খুঁজে বার করা একরকম অসম্ভব। 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপুর আপাত ঔদাসীন্যের অন্তরালে যে গভীর উদ্বেজন ছিল তা বিভূতিভূষণের ব্যক্তিমানসেরই প্রতিফলন। তিনি এই সময় থেকেই মৃত্যুর পরে আত্মার কী গতি হয় তার সন্ধান করতে ব্যাকুল হয়েছেন। 'দেবযান'-এর কল্পনার এখান থেকেই শুরু

হয়েছিল। তাঁর এই সময়ের জীবন বা পরলোক সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত এমন অনেক, জনশ্রুতিতে ঢাকা বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। সে যাই হোক, গৌরী দেবীর মৃত্যুই যে তাঁর বৃহত্তম চেতনার উন্মেষের একটা বড়ো কারণ এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে।

অপুর জীবনে দেখা যায় যে, অপর্ণার মৃত্যুর পর সে পরিচিত সমাজ থেকে পালিয়ে চাঁপদানীর একটি অখ্যাত স্কুলে চাকরি নিয়েছিল। তার এই সময়কার জীবন দ্যুতিহীন—তার কল্পনাময় সজীব অন্তর যেন নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবে গেছে। একি বিভূতিভূষণের নিজের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি ?—'শনিবারের চিঠি'র মন্তব্য স্মরণীয়।

"সম্ভবতঃ স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তিনি লেখাপড়ায় ক্ষান্ত দিয়া সামান্য স্কুল মাষ্টারের চাকরী লইয়া হুগলীর জাঙ্গিপাড়া গ্রামে একরূপ অজ্ঞাতবাসে কাটান।"—বিভূতিভূষণের জীবনকথা, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।

বিভূতিভূষণ গৌরী দেবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লেখাপড়া ছাড়েন নি—বছরখানেক পরে তিনি জাঙ্গিপাড়ায় যান। 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপিতে দেখি যে, ভাগলপুরে বসে তিনি জাঙ্গিপাড়ার চাকরির কথা স্মরণ করেছেন,—

'ভাবতে ভাবতে মনে হোল সাত বৎসর আগে এই দিনটিতে আমি প্রথম চাকরী নিয়েছিলাম। সেই মাইনর স্কুলের খাট, সেই লেপে শোওয়া অন্ধকার আকাশে চেয়ে দেখলাম।' [৬. ২. ১৯২৬]

গৌরী দেবীর মৃত্যুর প্রায় তেইশ বৎসর পরে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। এর মধ্যে গৌরী দেবীর বাপের বাড়ির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। 'উর্মিমুখর' দিনলিপিতে এক জায়গায় তিনি যে দিদির বাড়ি থেকে ফেরার কথা লিখেছেন তা সম্ভবত গৌরী দেবীর দিদি। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,—

'ঠাকুর মায়ের শ্রাদ্ধের পর সেই মার্টিন লাইনের গাড়ীতে বসিরহাট থেকে এসেছিলুম, তখন আমি জাঙ্গিপাড়া স্কুলে চাকুরীতে

ঢুকেছি। আজ ১৭।১৮ বছর পরে মার্টিনের গাড়ীতে চড়ে বসিরহাট থেকে এলুম।'

এই ঠাকুরমাও গৌরী দেবীর সম্পর্কিত।

একান্তভাবে ব্যক্তিজীবনের কথা হলেও গৌরী দেবীর স্মৃতি প্রসঙ্গে একটা কথা বলা হয়তো অশোভন হবে না। বিভূতিভূষণ গৌরী দেবীর কয়েকটি স্মৃতিচিহ্ন সযত্নে রক্ষা করেছিলেন—গৌরী দেবীর লেখা চিঠিতে নিয়মিত ফুল দিতেন। কল্যাণী দেবীর কাছে তাঁর স্মৃতিচিহ্নের কয়েকটি সযত্নে রক্ষিত আছে। বিভূতিভূষণের দিনলিপি থেকে আর একটি অংশ তুলে এপ্রসঙ্গের শেষ করি,—

'তার পর সত্যি সত্যি কত ভাল জিনিসই পেলুম। গৌরী, সেই বনগাঁয়ের গাড়ীতে বসা, সেই বেলেঘাটা ব্রিজ স্টেশনে আমাদের প্রথম ও শেষ ঘরকন্না, সেই আয়না বার করে দেওয়া, সেই চিঠি বুকে করে মাথায় কপালে ঠেকানোর কথা মনে হয়ে পুলক হয়।'

৮

বিভূতিভূষণ জাঙ্গিপাড়ার প্রাইমারী স্কুলে বেশি দিন চাকরি করেন নি। সম্ভবত বছরখানেকের মধ্যেই এখানকার পালা চুকিয়ে দিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। এরপর তিনি সোনারপুরের কাছাকাছি হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এই স্কুলে চাকরির জন্য যাওয়ার সময় পথে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্র নাথ লাহিড়ীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি প্রথমে কয়েক দিন তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নেন। লাহিড়ী মহাশয়ের ভাইঝি অন্নপূর্ণা দেবী (খুকু) বিভূতিভূষণের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে তাঁর উল্লেখও আছে।

হরিনাভি স্কুলে চাকরি হওয়ার কিছুদিন পরে বিভূতিভূষণ একটি

বাসা ঠিক করে মা মৃণালিনী দেবী আর ছোটো ভাই নুটবিহারীকে নিয়ে আসেন। এখানে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়।

হরিনাভিতে বিভূতিভূষণ প্রায় বছর দুই ছিলেন। এই সময়টা তাঁর সাহিত্যজীবনের পক্ষে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়েই তিনি লেখক রূপে আত্মপ্রকাশ করেণ। তাঁর প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' ১৩২৮ সালের 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত হয়।

১৩৫৭ সালের অগ্রহায়ণের 'শনিবারের চিঠি'র 'বিভূতিভূষণের জীবন কথা' থেকে তাঁর সাহিত্যিক জীবনেরর সূত্রপাত প্রসঙ্গ উদ্ধার করলাম। 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদকের এই আলোচনা বিশেষ মূল্যবান্,—

"পাঁচালী প্রিয় বিভূতিভূষণ ছন্দ মিলাইয়া ছড়াও লিখতেন। বনগ্রাম হাই স্কুলে অধ্যয়ন কালে বিবাহের প্রীতি উপহার দুই এক খানা লিখিয়াছিলেন। 'রিপন কলেজ ম্যাগাজিনে'ও কবিতা বাহির হইয়াছিল একটা এবং প্রবন্ধও একটা ফাঁদিয়াছিলেন; কিন্তু তখন পর্যন্ত সাহিত্যিক হইবার সাধ পুরাপুরি মনে জাগে নাই। কি করিয়া তাহা জাগিল, সে কাহিনী তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহার 'নবাগত' পুস্তকের 'আমার লেখা' গল্পে। সেই কাহিনীই তিনি ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন রাত্রে কলকাতা বেতার মারফত ঘোষণা করেন। হরিনাভি স্কুলের শিক্ষকতা করিবার কালে (বিভূতি-ভূষণ স্বয়ং ভ্রমক্রমে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ লিখিয়াছেন) পাঁচুগোপাল চক্রবর্তীর (সম্ভবত কল্পিত নাম, ছেলেটির আসল নাম যে যতীন্দ্র ভট্টাচার্য, বিভূতিভূষণের উক্তি হইতেই তাহা পাইতেছি) চক্রান্তে তিনি একটি গল্প লেখেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রথম রচনা এইটি। গল্প লিখিয়া তাঁহার নিজেরই ভাল লাগে। তিনি কলিকাতায় আসিয়া একদিন প্রবাসী আপিসে তাহা দাখিল করেন এবং যথারীতি মনোনীত এবং লেখক কর্তৃক পরিবর্তিত (সম্পাদকীয়

নির্দেশে) হইয়া তাহা ১৩১৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের প্রবাসীতে বাহির হয়, অর্থাৎ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী তারিখেই বিভুতিভূষণ গল্পলেখকরূপে বঙ্গসাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হন। সুতরাং ইহা যে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দেই লিখিত হইয়াছিল তাহাতে সংশয় নাই। ইতিপূর্বেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, তিনি পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধেও চিন্তা করিতেছেন। বিভূতিভূষণের সাহিত্যের যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহার সবগুলিই বীজাকারে তাঁহার এই প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা'য় পাইতেছি। সেই শুভ্র-সুচিতাবোধ, সেই খাদ্য-লোলুপতা, সেই আদেখ্‌লেপনা এবং সেই জন্মান্তর রহস্য, অর্থাৎ 'পথের পাঁচালী' ও 'দেবযান' দুইই এই গল্পটিতে উঁকি মারিতেছে। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় ('মেঘমল্লার') 'আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা'—সুতরাং গল্পটির উপর আমার মায়া থাকা স্বাভাবিক'—এইরূপ ভূমিকা করিয়া বিভূতিভূষণ কেন যে 'দেবযান' অংশ এই গল্পে পরিত্যাগ করিলেন, তাহা গবেষণার বিষয়। পরিত্যক্ত অংশটি এই,—

'এ কাকে দেখলুম বলবো ?

আমাদের এই পৃথিবীর জীবনের বহু ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত রাজ্যে অনন্তের পথের যাত্রীরা আবার বাসা বাঁধবে, হয়তো যে দেশের আকাশটা রঙে রঙে রঙীন, যার বাতাসে কত সুর, কত গন্ধ, কত সৌন্দর্য, কত মহিমা, ক্ষীণ জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া কত সুন্দরী তরুণীরা যে দেশের পুষ্পসম্ভারসমৃদ্ধ বনে উপবনে ফুলের গায় বসন্তের হাওয়ার মধ্যে তাদের ক্ষীণ দেহের পরশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেই অপার্থিব দিব্য সৌন্দর্যের দেশে গিয়ে আমাদের এই পৃথিবীর মা-বোনেরা যে দেহ ধারণ করে বেড়াবেন,—এ যেন তাঁদের সেই সুদূর ভবিষ্যৎ রূপেরই একটা আভাস আমার বৌদিদিতে দেখতে পেলুম।'

আমরাও বহু সম্ভাবনার আভাস পাইলাম এই রচনাটুকুর মধ্যে। মহাসাধক বিভূতিভূষণের তখন বৃহত্তর কীর্তির জন্য প্রস্তুতির কাল।

অনন্তের সঙ্গে সুরসামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা চলিতেছে, তাহার জন্য এই লৌকিক জগতের অসংখ্য বিচিত্রতা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের ব্যাকুল সন্ধান চলিতেছে, তিনি দুই চোখ ভরিয়া দেখিতেছেন চারিদিকে বিজ্ঞান দর্শন হইতে সংগ্রহ করিতেছেন মনের খোরাক, নানা সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী হইতে পৃথিবীর বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জন্মান্তর-রহস্য উদ্ঘাটনেরও প্রয়াস করিতেছেন। কিন্তু যশের এই ক্ষীণ স্পর্শ এই তপস্বী সাধককেও মাতাল করিয়া দিল, তিনি 'প্রবাসী'তে পর পর গল্প লিখিয়া চলিলেন—'উমারাণী' শ্রাবণ, ১৩২৯ ; 'মৌরীফুল' অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ ; 'অভিশপ্ত' আষাঢ়, ১৩৩১ ; 'নাস্তিক' পৌষ, ১৩৩১ এবং 'পুঁইমাচা' মাঘ, ১৩৩১।"

৯

বিভূতিভূষণ জাঙ্গিপাড়া স্কুল কেন ছেড়েছিলেন তাও যেমন জানা যায় না, কেন যে হরিনাভি স্কুল ছাড়লেন তাও জানা যায় না। কোনো কারণে হয়তো হরিনাভিতে তাঁর আর মন বসেনি, হয়তো বা তাঁর অন্তরে যে ভ্রমণের নেশা ছিল তারই তাড়ায় তিনি এক আশ্চর্য চাকরি নিলেন। কেশোরাম পোদ্দারের গোরক্ষিণী সভার পক্ষ থেকে তিনি বাংলা দেশের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষত পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ করেন। তাঁর এই সময়ের ভ্রমণের কথা 'অভিযাত্রিক' দিনলিপিতে কিছুটা সংকলিত হয়েছে। 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপিতে তিনি ভাগলপুরের ইসমাইলপুর কাছারিতে বসে স্মৃতি রোমন্থন করেছেন,—

"সন্ধ্যার সময় বসে আরাম চেয়ারটায় ঠেস দিয়ে অনেক কথা ভাবছিলুম। এই চেয়ারটা যেদিন থেকে তৈরী হয়েছে—ভ্রমণ সুরু হয়েছে সেদিন থেকে। সেই সত্যবাবুর বাড়ীর দেউড়িতে

সন্ধ্যার সময় গিয়ে চেয়ারটা নিয়ে নামলুম—সেই ঢোকে ঢোকে জল খেয়ে তৃপ্ত হলুম—পরদিন থেকে যাত্রা সুরু হোল। মহারাণী স্বর্ণময়ী রোড, ৪৫ মৃজাপুর স্ট্রীট। সেই ফরিদপুরে সত্যবাবুর বাড়ী, চাট-গাঁয়ের স্টীমার, কক্সবাজারের স্টীমারের ডেকে, সীতাকুণ্ডে, নরসিংদিতে জ্যোতির্ময়ের ওখানে, ঢাকায়—আবার ৪৫ মৃজাপুর স্ট্রীটে। বড়বাসায় ইসমাইলপুরে—কত জায়গায়। এইতো সেদিন কানিবেনের জঙ্গল হয়ে, জামদহ, জয়পুরের ডাকবাংলোয় শালবনের মধ্যে নির্জন রাত্রি যাপন করে গেলুম দেওঘর। তারপর এই গেলুম রামচন্দ্রপুরে, বেনীবনে, বক্রতোয়ার ধারে ধারে, লক গেটে সূর্যাস্তের সময় কত বেড়ালুম—এই তো গেলুম পাটনা শোনপুরে মেলা দেখলুম—জ্যোৎস্নার রাত্রিতে প্যালেজা ঘাটে স্টীমারে বসে চা খেতে খেতে গঙ্গাপার হয়ে পাটনার বৈকুণ্ঠবাবুর ওখানে ফিরে এলুম। হাসান ইমামের যে নতুন বাড়ীটা উঠচে তারই কাছে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কথা ভাবা, তারপর কালীর সঙ্গে নালান্দা, সেই রাজগির যাওয়া, সেই বাঁশের বন, শোন ভাণ্ডার, সেই চেনো, হরনৌৎ, শো—অদ্ভুত নামের স্টেশন সব—সেই গড়িয়ার জলার জ্যোৎস্না দেখতে দেখতে ৮॥ টার গাড়িতে রাজপুর ফেরা—সেই জাঙ্গিপাড়াকে ভাবতুম কত দূরের দেশটা।

এই অনবরত ভ্রাম্যমান জীবন। ঘুরতেই হবে যে—পথে যে নেমেচি—যাই হোক আমি পথে নেমেচি। আমি কিছুর মধ্যেই নেই, অথচ সবের মধ্যেই আছি—জগতের এই অপূর্ব গতির রূপ আমার চোখে পড়চে। আমি আজন্ম পথিক—পথে বেরিয়েচি, সত্যবাবুর বাড়ী যে দিন থেকে নেই—অনেক কাল আগে সেই ১৯০৮ সালে, এক সন্ধ্যায় বেহারী ঘোষের বাড়ী মাণিকের গান হোল—পরদিন জিনিষপত্র নিয়ে সেই যে বোর্ডিংএ এলুম—কিক্ষণে বাড়ির বাইরে পা দিয়েছিলুম জানি না—সেই বিদেশে বাস সুরু হোল। পরে আর বারাকপুরকে বারমাসের জন্যে একবারও পাইনি

—হারিয়ে হারিয়ে পেয়ে আসচি—কত জগদ্ধাত্রী পূজার ছুটিতে, গুডফ্রাইডের ছুটিতে, বড়দিনে, পূজোয়, শনিবারে, পেয়ে এসেছি ছেলেবেলায়, এখনও অন্যভাবে পাই।”

বারাকপুর ইছামতীর আকর্ষণ কেন্দ্রে থাকলেও বিভূতিভূষণ ছিলেন অন্তরে অন্তরে ভ্রমণ পাগল। কেশোরাম পোদ্দারের গোরক্ষিণী সভার যে কাজ তিনি নিয়েছিলেন তার উপর তাঁর অন্তরের টান ছিল কি না বলা কঠিন। তবে এই উপলক্ষে তিনি যে বেড়িয়েছেন তার মূল্য কম নয়। প্রথম যৌবনের এই ভ্রমণ তাঁর জীবনে নানাভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে। প্রথমত ভ্রমণের নেশা তাঁর মনেপ্রাণে সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর অন্তরাত্মা পথের ডাক শুনেছিল।

‘কেন মানুষ ঘরে থাকে তাই ভাবি। আর কেনই বা পয়সা খরচ করে মোটারে কি রেলের গাড়ীতে বেড়ায়। পায়ে হেঁটে পথ চলার মত আনন্দ কিসে আছে?’—উর্মিমুখর।

“চরন্ বৈ মধু-বিন্দতি” চলা দ্বারাই অমৃত লাভ হয়, অতএব চলো।’—তৃণাঙ্কুর

দ্বিতীয়ত এই ভ্রমণের ফলে তাঁর দৃষ্টির প্রসার হয়েছিল, কোনো সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে তাঁর চিত্ত আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারেনি। তৃতীয়ত যে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর আশৈশব পরিচয় তাকে তিনি বিচিত্রভাবে উপভোগ করেছেন। এর ফলে তাঁর অন্তরে প্রকৃতিপ্রেম গাঢ়তর হয়েছে, সেই সঙ্গে তাঁর অধ্যাত্মচেতনারও উদ্বোধ হয়েছে। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টা সম্পর্কে একটা গভীর বিশ্বাসও তাঁর অন্তরে জেগেছে।

‘ভগবানের সৃষ্টি দেখে বেড়াবো, এই তো চাই।’

—হে অরণ্য কথা কও।

এই অধ্যাত্মদৃষ্টিমণ্ডিত প্রকৃতিপ্রেম বিভূতিভূষণের কবিপ্রতিভার মূলাশক্তি।

চতুর্থত তিনি যখন দেশে দেশে ঘুরেছেন তখন মানুষের বিচিত্র পরিচয় পেয়েছেন। সাধারণ মানুষের জীবন তিনি গভীর সহানুভূতির চোখে দেখেছেন। 'অভিযাত্রিক' দিনলিপিতে তিনি বলেছেন,—

'দেশ বেড়িয়ে যদি মানুষ না দেখলুম তবে কি দেখতে বেরিয়েছি। চিরযৌবনা নিসর্গসুন্দরী সবকালে সব দেশেই মন ভুলায়, মন.ভুলায় তার শ্যামল চেলাঞ্চল, বনময় ফুলসজ্জা, মধুমল্লীর সৌরভভরা তার অঙ্গের সুবাস।

তাকে সব স্থানে পাওয়া যায় না সে রূপে, কিন্তু মানুষ সব জায়গাতেই আছে! প্রত্যেকের মধ্যেই একটা অদ্ভুত জগৎ, দেখতে জানলেই সে জগৎটা ধরা দেয়। তাই দেখতেই .পথে বার হওয়া। মানুষের বিভিন্ন রূপ দেখবার আমার চিরকাল আগ্রহ, নতুন মানুষ দেখলেই মনে হয় ওর সঙ্গে বসে একটু আলাপ করে চিনি। দেখতে চেয়েছিলুম বলেই বোধ হয় কত রকমের মানুষকেই যে দেখালেন জীবনে।'

গোরক্ষিণী সভার আদর্শ প্রচারে সত্যকার আগ্রহ ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও বিভূতিভূষণের সাহিত্য জীবনের পক্ষে চাকরীর উপলক্ষে এই ভ্রমণের প্রয়োজন ছিল। তখন তাঁর সাহিত্যে কল্পনা সবে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। সূর্যের আলো পড়ে যেমন গাছের পাতায় ক্লোরোফিল সঞ্চারিত হয়ে তার মধ্যে জীবনীশক্তি সঞ্চার করে, তেমনি বিচিত্র ভুবনের আলো তাঁর প্রতিভার মধ্যে একটা আশ্চর্য শক্তি সঞ্চার করে তাকে প্রাণবন্ত কবে তুলেছে।

...................................১০...................................

চাকরির ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ খেলাৎচন্দ্র ঘোষের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। প্রথমে তিনি খেলাৎ ঘোষের বাড়িতে গৃহ-

শিক্ষকতার কাজ করেন, কিছুকাল প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজও করেন। এর পর তিনি ভাগলপুরে খেলাৎ ঘোষ এস্টেটের সার্কেল-সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তার পরে কলকাতায় ফিরে এসে ধর্মতলায় খেলাৎচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিক পর্যন্ত শিক্ষকতার কাজ করেছিলেন।

এই সব কাজের মধ্যে ভাগলপুরে খেলাৎ ঘোষ এস্টেটের কাজই বিভূতিভূষণের সাহিত্যজীবনের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাগলপুরে বিভূতিভূষণের স্মৃতি সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন,

"তারিখ মনে নেই, সাল বোধ হয় ১৯২৩ অথবা ২৪ হবে, একদিন সকালে বিভূতিভূষণ আমার ভাগলপুরের গৃহে পরিচিত হলেন। একজন খাঁটি সহিত্যানুরাগীর শিশুর মত সরল মন দেখে মুগ্ধ হলাম। এক বৈঠকেই আলাপ ঘনীভূত হ'ল; আর, তার ফলে অবিলম্বে তাঁকে আমাদের দলে ভর্তি করে নিলাম।"

কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার রমানাথ ঘোষের ভাগলপুরের বাড়ির নাম 'বড় বাসা'। খেলাৎচন্দ্র এস্টেটের সারকেল অফিসার নিযুক্ত হয়ে বিভূতিভূষণ ভাগলপুরে এসেছিলেন। প্রধানত তিনি ভাগলপুরেই থাকতেন। মাঝে মাঝে গঙ্গার উত্তর দিকে অবস্থিত দিরা-ইসলামপুর নামক জঙ্গল মহলে পরিদর্শন কার্যে যেতেন।

ভাগলপুরের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রকৃতির অপরূপ শোভা, ভাগলপুরে গাছ-পালা লতা পাদপ, ঘননিবদ্ধ তালগাছের কুঞ্জ, ভাগলপুরের গঙ্গাবক্ষে উদয়াস্তব্যাপী বিচিত্র লীলা, গঙ্গার উত্তর পারে ধূসর চক্রবাল পর্যন্ত চরভূমির সুদূর বিস্তৃতি, ইসলামপুরের বন-জঙ্গলের নিবিড় আরণ্য মায়া বিভূতিভূষণের চিত্তকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে ছিল। 'পথের পাঁচালী'র বিভূতিভূষণ—শনিবারের চিঠি অগ্রহায়ন, ১৩৫৭।

খেলাৎ ঘোষের এস্টেটের কাজ করার সময় বিভূতিভূষণকে এই অঞ্চলের বনে বনে ঘুরতে হয়েছিল। শৈশব থেকেই তাঁর অন্তরে যে প্রকৃতি প্রেম ছিল বিহারের গভীর অরণ্যে প্রকৃতির নিবিড় সৌন্দর্যের

মধ্যে বাস করার ফলে তা চেতনায় পরিণত হয়েছিল। বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে বিহারের ঐ অঞ্চলের প্রকৃতির পার্থক্য আছে, বাংলার প্রকৃতি প্রধানত সজলা—নদী খালবিল পুকুরের ধারে তার যে সহজ শোভা তা যেন আমাদের ঘরোয়া জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তার লালন এত সহজ যে আমরা যেন আলাদা করে তার অস্তিত্ব বুঝতে পারি না। তার শ্রী আমাদের ভালো লাগে এই পর্যন্ত। বিভূতিভূষণের প্রেম বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্য থেকে জননী ভগিনীর স্নেহরস আকর্ষণ করেছে। তাঁর স্ব-ভাব বাংলার প্রকৃতির রসে জারিত। বিহারের অরণ্যভূমির মধ্যে শ্রীর চেয়ে রূপ বেশি। ঐ সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতি বিভূতিভূষণের চেতনাকে যেন কান্তা সম্মিত লোভনতা দিয়ে আবিষ্ট করেছিল। তাঁর ব্যক্তিপুরুষ বাংলার প্রকৃতির লালনে পরিপুষ্ট হয়েছে; তাঁর কবিপুরুষ নিসর্গসুন্দরীর আরণ্য প্রেমে উদ্দীপ্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত আরণ্যের নিভৃত পরিবেশে বিভূতিভূষণ আত্মসমাহিত হওয়ার অবকাশ পেয়েছিলেন। 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপিতে তিনি বলেছেন,—

'জীবনে বড় আনন্দকে ধ্যানে আগে পেতে হয় এবং ধ্যান ভিন্ন তার সন্ধানই মেলে না।'—রাজগিরি, ১৩. ১১. ১৯২৭।

এই ধ্যানের অবকাশ অরণ্য-ভূমিই তাঁকে দিয়েছিল। এই ধ্যান অবশ্য আরণ্যক ঋষির তত্ত্বজিজ্ঞাসা নয়—এ কল্পনার আলোয় জীবনের আনন্দের সন্ধান। চিন্তা নয় ভাবনা; বুদ্ধির দীপ্তি নয়, হৃদয়ের দ্রুতি।

তৃতীয়ত বিহারের নিভৃতনির্জন পরিবেশে তিনি আপনার অতীতকে রঙে রসে ভরে উপভোগ করতে পেরেছিলেন। এই সময়ে তিনি 'পথের পাঁচালী' লিখতে শুরু করেছেন। ঐ উপন্যাসে তাঁর নিজের শৈশব আর বাল্যের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বাংলার গ্রাম—বিশেষ করে ইছামতী-বারাকপুর থেকে অনেক দূরে তিনি যখন শৈশবের কথা মনে করেছেন তখন তাঁর স্মৃতির সঙ্গে সুখদুঃখের

নানা অনুভূতি জেগে উঠেছে। 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপিতে তিনি বলেছেন,

'মনের কোথায় যেন অদৃশ্য খোপে গত জীবনের স্মৃতি সব ঠাসা আছে,—পিয়ানোর চাবিতে হাত পড়ার মত দৈবাৎ কোনো পুরানো খোপে হাত পড়ে যায়—হঠাৎ সেটা বড় পরিচিত সুরে বেজে ওঠে—অনেক কালের আগের একটা দিন অল্পক্ষণের জন্য বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আবার ফিরে আসে।'—ইসমাইলপুর, ৭. ১২. ১৯২৭।

যে সাহিত্য চিরন্তনী, তা অদ্যাতনীর তাড়না নয় তাৎক্ষণিকবার্তার দাবি মেটানোর দায় তার নেই। Emotion recalled in tranquility—নিরাকুল চিত্তে আবেগের মূর্তিই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রস্তুতি। বিভূতিভূষণ ভাগলপুরে প্রকৃতির উদার পরিবেশে, আত্মনিমগ্ন নিভৃত অবকাশে যখন 'পথের পাঁচালী' লিখেছেন তখন স্মৃতির বন্যা তাঁর কল্পনাকে ভরে ভরে তুলেছে। এই শৈশবকথা স্মরণ যে nostalgia নয় তা আগেই বলেছি, এ স্মৃতিলোকে কবিকল্পনার আনন্দবিচরণ। বিভূতিভূষণের সাহিত্যজীবনে এই স্মৃতিচারণ একটা বিশিষ্টতা। তিনি যখন ভাগলপুরে তখন বারাকপুর-ইছামতীর স্মৃতি তাঁর মন ভরে দিয়েছে। আবার তিনি যখন কলকাতায় ফিরে এসেছেন তখন অরণ্যের স্মৃতি তাঁর কল্পনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—তখন তিনি 'আরণ্যক' লিখেছেন। তাঁর প্রায় সব লেখাই স্মৃতির মধুকোষে সঞ্চিত জীবনের আনন্দরসের পুনরাস্বাদ।

·১১·

বিভূতিভূষণ হয়তো হরিনাভিতে থাকার সময়েই 'পথের পাঁচালী' লেখার পরিকল্পনা করেন, পরে ভাগলপুরে উপযুক্ত অবকাশ পেয়ে তিনি এই উপন্যাসটি লেখেন। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক অনুমান

করেছেন যে, বিভূতিভূষণ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল ভাগলপুরে 'পথের পাঁচালী' 'রচনায় হস্তক্ষেপ করেন'।

'পথের পাঁচালী' প্রথমে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এসম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন,—

"কথায় কথায় বিভূতিবাবুর মুখে একদিন শুনলাম 'প্রবাসী' মাসিক পত্রের কর্তৃপক্ষ 'পথের পাঁচালী' ফেরত দিয়েছেন, 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করতে সম্মত হননি। কেন তাঁরা ফেরত দিয়েছিলেন, সে কথা অবশ্য আমি আজও জানিনে। হয়তো তাঁদের পত্র-পরিচালনার রীতি অনুযায়ী অসম্পূর্ণ লেখা বলে গ্রহণ করেন নি। সে যাই হোক, আমার তখন 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করবার ব্যবস্থা ভিতরে ভিতরে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। 'বিচিত্রা'র পরিকল্পনা বিস্তারিত-ভাবে বিভূতিবাবুকে জানিয়ে 'পথের পাঁচালী' 'বিচিত্রা'য় প্রকাশ করবার প্রস্তাব করলাম। বারো বৎসর কালের আধপাকা ওকালতি-ব্যবসা পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ অজানা এবং অনিশ্চিত সলিলে ঝাঁপ দেবার উপক্রম করছি অবগত হয়ে বিভূতিভূষণ যত-না আনন্দিত হলেন তার চতুর্গুণ হলেন বিস্মিত। সে যাই হোক, তদ্দণ্ডেই স্থির হয়ে গেল, 'পথের পাঁচালী' 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হবে। উৎসাহ সহকারে বিভূতিভূষণ লেখায় মন দিলেন।

তারপর যথাসময়ে মাসের পর মাস 'পথের পাঁচালী' 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হতে লাগল, সে কথা বাঙলা সাহিত্যের সুধী পাঠকমাত্রই অবগত অছেন। 'পথের পাঁচালী'র দ্বারা আমাদের সাহিত্যের একটা সম্পূর্ণ নূতন দিক খুলে গেল। পল্লীগ্রামের রূপে-রসে শোভায়-সৌরভে শিশুচিত্তের নব নব রহস্যোদ্ঘাটনের বিস্ময়ে, পাঠকচিত্ত উল্লসিত হয়ে উঠেছিল"।—'পথের পাঁচালী'র বিভূতিভূষণ, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭।

'পথের পাঁচালী' প্রকাশ ব্যাপারে শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর নামও স্মরণীয়।

'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হওয়ার পর যে সমাদর পেয়েছিল বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা মেলা ভার। মাত্র একখানা গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের প্রতিষ্ঠা এর আগে সম্ভবত একমাত্র 'দুর্গেশ নন্দিনী'রই হয়েছিল। বিভিন্ন লেখকের স্মৃতি থেকে 'পথের পাঁচালী'র সমাদরের আভাসমাত্র দিচ্ছি,—

"প্রথম তো চমক লাগিয়েই তিনি সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেন। বাংলা সাহিত্যের ধারা এক জায়গায় এসে যেন থেমে যাবার মত হয়েছে। রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের পর যে কি হবে, তা কেউ যেন ভেবে পাচ্ছে না। নূতনত্ব চাই, কিন্তু সে নূতনত্বের অর্থ দাঁড়িয়েছে, পাঁক গুলে স্রোত ময়লা করা। বাঙালীর দম আটকে যাচ্ছে, ঠিক এই সময়েই অপরিচয়ের প্রদোষ থেকে বিভূতিবাবু 'পথের পাঁচালী' নিয়ে আলোয় এসে দাঁড়ালেন। ঠিক এই ধরনের চমক এর আগে শরৎচন্দ্র লাগিয়েছিলেন। আরও কয়েকজন লাগিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের সম্পদ এত বেশি ছিল না যে, সেই বিস্ময়কে স্থায়িত্ব দিতে পারেন, কেউ একখানা বইয়ে, কেউ হয়তো দু'খানা বইয়েই শেষ হয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য এমন কিছু নতুন কথা নয়, সব সাহিত্যেই এ রকম হয়, স্রষ্টার যা প্রতিভা তা পূর্ণতা-অপূর্ণতা হিসাবে"।—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭।

" 'বিচিত্রা'য় যখন 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হবে, তার পূর্বে 'বিচিত্রা'-গৃহে তার প্রারম্ভের (বল্লালী বালাই) অনেকটা পঠিত হয়। এজন্য একটা বিশেষ বৈঠক বসিয়েছিলেন 'বিচিত্রা'র কর্তৃপক্ষ। হয়তো তাঁদের আয়োজনের মধ্যে আসবাবপত্রের বাহুল্যে শ্রোতারা ছিলেন আড়ষ্ট। কিন্তু একটা নতুন রসের আস্বাদ লাভ করে আমরা সেদিন গৃহে ফিরি, তা মনে আছে। তারপর মাসের পর মাস 'বিচিত্রা'য় 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশ চলল। ···দেখতে দেখতে 'বিচিত্রা,র নিয়মিত পাঠকরাও বলতে আরম্ভ করলে 'ভাল হয়েছে'।

আর অনিয়মিত পাঠক হলেও আমিও পড়ে মুগ্ধ হতাম। বুঝতাম, নতুন কিছুর আবির্ভাব হচ্ছে।...

'পথের পাঁচালী' প্রকাশের কাল এল। আমি তখন সজনীকান্তের সঙ্গে 'রঞ্জন প্রকাশালয়ে'র পরিকল্পনায় উদ্যোগী—আসল উদ্যোগ ছিল সজনীকান্তেরই। আমার ছিল পুঁজি সংগ্রহের ভার, আর সে পুঁজিও ছিল সামান্য। আমাদের উদ্যোগের কথা শুনে শ্রীযুক্ত নীরদ-চন্দ্র চৌধুরী বলেন, 'পথের পাঁচালী'র একজন ভাল প্রকাশক পাওয়া যাচ্ছে না। সজনীকান্ত তখনই তা প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। আমাদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। 'পথের পাঁচালী' প্রকাশের সেকথা সজনীকান্ত অন্যত্র বলেছেন, ('আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯শে কার্তিক ১৩৫৭)। আমাদের সেদিনকার সেই সামান্য মূলধন আমরা যে 'পথের পাঁচালী'তে ব্যয় করেছিলাম তার কারণ ও-গ্রন্থের মূল্য সম্বন্ধে আমরা দু'জনেই নিঃসন্দেহ ছিলাম।...

'পথের পাঁচালী'র ছাপা ফর্মা 'প্রবাসী' আপিসে এক একদিন সন্ধ্যার বৈঠকে পড়া হত। অধ্যাপক-পণ্ডিতেরা অনেকে থাকতেন, তাঁরা আনন্দিত হতেন। যেদিন অপুর নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগের কাহিনী পড়া হয়, সেদিনকার সপুলক বিস্ময় বিশেষ করে আমাদের মনে আছে। কবি মোহিতলাল বার বার বললেন, 'কি কাণ্ড হয়েছে রেল লাইন আর সিগন্যাল নিয়ে! কি অপূর্ব!'

'পথের পাঁচালী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিদগ্ধ ও সুসম্পন্ন সাহিত্যামোদী গোষ্ঠীতে বিভূতিভূষণের সম্বর্ধনা আরম্ভ হয়ে যায়। বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে সাহিত্য-সেবক-সমিতির উদ্যোগে এমনই একটি সভা হয়। তার একটি রেখাচিত্র ছিল কবিতায় সজনীকান্তের খাতায়। তা তিনি সম্প্রতি উপহার দিয়েছেন ('আনন্দবাজার পত্রিকা,' 'অপরাজিত' ১৯শে কার্তিক, ১৩৫৭)। বহু কথার মধ্যে সেদিনের দু'জনের কথা মনে আছে। নীরদবাবু বেশ পরিচ্ছন্ন ভাবে আলোচনা করে উল্লেখ করেছিলেন বিভূতিভূষণ ও তাঁর প্রিয় লেখক

ডবলু. এ. হাডসনের কথা, আর ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত বিভূতিভূষণের প্রকৃতি প্রীতি আর সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ বিষয়ে (short and simple annals of the poor) অন্তর্দৃষ্টি। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, আমি চিরদিনই কলকাতার লোক। বাংলার পল্লীগ্রামের সঙ্গে তেমন আজন্ম পরিচয়ের দাবি করতে পারি না। তবু গ্রামের জন্যে আমার মমতা আছে, আর মনে হয় নিশ্চিন্দি-পুরও আমার চেনা। তেমনই আমরা শহরে মানুষ হলেও মনে হয় অপু-দুর্গার কথা আমাদেরই কথা যেন"।—গোপাল হালদার, তদেব।

" 'পথের পাঁচালী' যখন ধারাবাহিকভাবে 'বিচিত্রা'য় বার হ'ত তখন মাঝে মাঝে পড়তুম—চমৎকার লাগত। তার পরে যখন 'পথের পাঁচালী' বেরিয়ে গেল, রসজ্ঞ সাহিত্যিক মহলে বিভূতিভূষণের স্থান হয়ে গেল, তখন 'প্রবাসী'তে 'পথের পাঁচালী'র দ্বিতীয় পর্ব 'অপরাজিত' বার হতে লাগল। আমার মনে আছে, ছাত্রাবস্থায় যে অধীর আগ্রহে প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের রচনা, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রচনা পড়তুম, সেই আগ্রহে উক্ত কালে মাস মাস 'অপরাজিত' পড়বার অপেক্ষায় থাকতুম। আমার নিজের কাছে 'অপরাজিত'কে বিভূতিভূষণের সর্বশ্রেষ্ঠ বই বলে মনে হয়; আর এর মধ্যে অপুর বিবাহের আর বিবাহিত জীবনের যে মনোজ্ঞ ছবি বিভূতিভূষণ এঁকে গিয়েছেন, সেটিকে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ Love idyl বা প্রেমচিত্রের অন্যতম ব'লে আমার মনে হয়েছে। শুনে খুশি হয়েছি বিভূতিভূষণের নিজেরও বিশ্বাস ছিল যে, 'অপরাজিত' তাঁর চরম সৃষ্টি"।—সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, কথাসাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় তারিখ। এই দিনের দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখেছেন—

"আজ আমার সাহিত্য-সাধনার একটা সার্থক দিন—এইজন্যে যে আজ অমি আমার দুই বৎসরের পরিশ্রমের ফল স্বরূপ উপন্যাস-খানাকে 'বিচিত্রা'তে পাঠিয়ে দিয়েছি"।—স্মৃতির রেখা।

'পথের পাঁচালী'কে অনেকেই বিভূতিভূষণের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলেছেন। পুরোপুরি আত্মজীবনী এটা নয়, যেমন, 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের আত্মকথা নয়। তবে 'পথের পাঁচালী'র কল্পনার আশ্রয় বিভূতিভূষণের নিজেরই জীবন। কোথাও বা তিনি সচেতন-ভাবে জীবন থেকে উপাদান বেছে নিয়েছেন আবার কোথাও বা তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা বা স্মৃতি তাঁর অজান্তেই লেখার মধ্যে ছাপ রেখে গেছে। 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপিতে তিনি বলেছেন,—

"ইসমাইলপুরের জঙ্গলে এমন কত শীতের গভীর অন্ধকার রাত্রি, ভাগলপুরের বড় বাসায় এমন কত আমের বউলের গন্ধভরা ফাগুন দুপুর, কত চৈত্র-বৈশাখের নিমফুলের গন্ধ মেশানো অলস অপরাহ্ণ, বড় বাসার ছাদে কত পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাত্রি অপু, দুর্গা, পটু, সর্বজয়া, হরিহর, রানুদি এদের চিন্তায় কাটিয়েছি। এরা সকলেই কল্পনাসৃষ্ট প্রাণী। অনেকে ভাবেন আমার জীবনের সঙ্গে বুঝি বই দু'খানির যোগ আছে—চরিত্রগুলি বোধহয় জীবন থেকে নেওয়া। অবশ্য কতকটা যে আমার জীবনের সংযোগ আছে ঘটনাগুলির সঙ্গে, এ বিষয়ে ভুল নেই, কিন্তু সে যোগ খুব ঘনিষ্ঠ নয়—ভাসা ভাসা ধরনের। চরিত্রগুলি সবই কাল্পনিক।"

................................১২................................

'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের প্রথম বই—প্রকাশের তারিখ ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাস (১৯২৯)। তিন বছর পরে এর পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বার হয়। তার আগে ১৩৩৮-এর শ্রাবণ মাসে (১৯৩১) গল্পসংকলন 'মেঘমল্লার'-এর অনেকগুলি গল্পই 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

খেলাৎ ঘোষ এস্টেটের ভাগলপুরের কাজ সেরে, অথবা ছেড়ে

দিয়ে বিভূতিভূষণ এর মধ্যে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। এবারের কর্মস্থল ধর্মতলার খেলাৎচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুল, বৃত্তি শিক্ষকতা, আস্তানা, মধ্য কলকাতার প্যারাডাইস লজ, ৪১ মির্জাপুর স্ট্রীট. এই বাসায় তিনি প্রায় দশ-এগারো বছর কাটিয়েছেন—এখান থেকে খেলাৎচন্দ্র স্কুলে কাজ করেছেন।

'পথের পাঁচালী' রচনার সময় বিভূতিভূষণ কল্পনায় বিভোর—এর অসামান্য সমাদর তাঁকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করেছিল। 'পথের পাঁচালী'র সূত্রানুসরণ করে তিনি 'অপরাজি' লিখলেন—এটি ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। তাঁর পরের উপন্যাস 'দৃষ্টিপ্রদীপ'ও প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

এখন থেকেই বিভূতিভূষণের সাহিত্যজীবন পুরোপুরিভাবে শুরু হয়েছে। তিরিশ-বত্রিশ বছরের সঞ্চয় তিনি ক্রমে ক্রমে যেন উজাড় করে দিয়েছেন। তবে এতে তাঁর ভাণ্ডার শেষ হয়ে যায় নি। তিনি প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে গিয়ে জীবনের গভীর সত্যকে ধ্যানে দেখতে পেয়েছেন, মানুষের সঙ্গে মিশে তার হৃদয়ের স্পর্শ পেতে উৎসুক হয়েছেন। এইজন্য তিনি যা দিয়েছেন তা ফিরে ফিরে পেয়েছেন। তাঁর প্রতিভার অফুরন্ত জাদুর এটাই রহস্য।

বিভূতিভূষণের ব্যক্তিজীবন বা সাহিত্যিক জীবনের অনুসরণ করা এই স্তর থেকে হয়তো আর সম্ভবপর নয়। তার কারণ, এই সময় থেকেই বিচিত্র ভাবনা বিচিত্র কল্পনা তাঁর লেখার মধ্যে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়েছে। বিভূতিভূষণের সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা অতিঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছেন তাঁরা হয়তো অনুসন্ধান করলে তাঁর প্রত্যেকটি লেখার পূর্বভূমিকার সন্ধান দিতে পারেন। সেই ধরনের গবেষণা তাঁর সাহিত্যের রস গ্রহণের পক্ষে সহায়ক না হলেও তাঁর অনুরাগীর কৌতূহল মেটাতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই লেখায় সেই প্রয়াস করি নি—তার কারণ বিভূতিভূষণের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমার হয় নি, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার শক্তি থেকেও আমি

বঞ্চিত। অনুরাগী পাঠক যদি দিনলিপিগুলি ভাল করে পড়েন তা'হলে তাঁরা বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে তাঁর জীবনের ছাপ দেখে আনন্দিত হবেন। বিশেষ করে তাঁর ছোটগল্পে তাঁর দেখা মানুষের পরিচয় খুব বেশি করে ফুটে উঠেছে।

বিভূতিভূষণ যে ক'বছর খেলাৎচন্দ্র স্কুলে কাজ করেছিলেন সে ক'বছর বিচিত্র ধরনের লেখায় হাত দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রথমেই 'বিচিত্র জগৎ'-এর নাম করতে হয়। এই গ্রন্থটির ভূমিকায় প্রকাশকের নিবেদনের একাংশ—

"বইখানির বিষয়নির্বাচন ব্যাপারে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নি। যে সব লেখক, পর্যটক, অভিযানকারী বা ভূ-তত্ত্ববিদ্‌দের প্রবন্ধ বা কাহিনী 'বিচিত্র জগৎ' রচয়িতার ভাল লেগেছে, নানা কারণে যে সব কাহিনী তাঁর বিচিত্র ও অপূর্ব মনে হয়েছে, সে সবই তিনি তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় স্টাইলে মনোরম গল্পের মত বর্ণনা করেছেন"।

'বিচিত্র জগৎ'-এর নিবন্ধগুলি 'বিশ্বপ্রকৃতি' নামে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় আর 'বিচিত্র জগৎ' নামে বঙ্গশ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শুধু মাত্র পত্রিকার চাহিদা মেটানের দায়ে বিভূতিভূষণ এগুলি লিখেছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি ছোটবেলা থেকেই ভ্রমণ কাহিনী বা দেশ-বিদেশের কথা পড়তে ভালোবাসতেন। পরিণত বয়সেও সে ভালোবাসা কমে নি। ঐ সচিত্র নিবন্ধগুলি ঐ ভালোবাসারই নিদর্শন। সমধর্মা পাঠক বা কিশোরদের কাছে জগতের বিচিত্র কথা পৌঁছে দেওয়ার আগ্রহ অবশ্যই তাঁর ছিল।

এই সময় থেকেই তিনি ছোটদের জন্য লিখতে আরম্ভ করেন। শিশুসাহিত্যের জগতে তাঁর আবির্ভাব আর আগ্রহ সম্পর্কে বিশু মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতি থেকে লিখেছেন—

"বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক জীবনের প্রায় প্রারম্ভেই শিশুদের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ তাঁকে শিশুসাহিত্যের প্রতি অনুরাগী করে।

সে সময় 'প্রবাসী'তে তাঁর কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে মাত্র, একদিন তিনি স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পত্রিকা 'মৌচাক'-আপিসে এসে উপস্থিত হন, এবং চারুবাবু তাঁকে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সুধীরবাবু তাঁকে তাঁর পত্রিকায় কিছু লেখার জন্য অনুরোধ করেন এবং সেই অনুরোধেই প্রথম বিভূতিবাবু শিশুদের জন্য উপন্যাস রচনায় হাত দেন। তাঁর প্রথম ছেলেমেয়েদের উপন্যাস 'চাঁদের পাহাড়' মৌচাকে (আষাঢ়, ১৩৪৩—? ১৩৪৩) ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এর পর 'মরণের ডঙ্কা বাজে' (পৌষ, ১৩৪৪—চৈত্র, ১৩৪৫), 'হীরামাণিক জ্বলে' (বৈশাখ, ১৩৪৮—আশ্বিন, ১৩৪৯), 'বনে পাহাড়ে' (আষাঢ়, ১৩৫০—? ১৩৫১) নামক আরও তিনখানি উপন্যাস, ['বনে পাহাড়ে' উপন্যাস নয়, দিনলিপি] তাঁর প্রকাশিত হয় এই 'মৌচাক' পত্রিকাতেই। ছেলেমেয়েদের জন্য রচনায় প্রথম যে 'মৌচাক' সম্পাদকই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তা তিনি নিজেই একটি রচনার মধ্যে স্বীকার করে গেছেন। সেখানে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, "মৌচাকে লেখা যখন লিখতে বসি, তখন কল্পনা নেত্রে দেখি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও তাদের কর্মক্লান্ত পিতাঠাকুরদের উৎসুক দৃষ্টি ; সবাই যেন লেখার দিকে চেয়ে আছে এক দৃষ্টে, তবে অসমতার জন্য তাদের সে ঔৎসুক্য চরিতার্থ হয়তো সব সময় করে উঠতে পারি না, সে কথা আলাদা'।"—বিভূতিভূষণ ও তাঁর শিশুসাহিত্য, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।

'আইভ্যান হো'র বাংলা অনুবাদটির কথাও এখানে উল্লেখ করতে পারি। এটি সম্ভবত ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তার আগে সবম্ভত ১৯৩৭ পর্যন্ত কয়েক বছর ধরে স্কটের এই উপন্যাসটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবত ছাত্র-ছাত্রীদের কথা স্মরণ করেই তিনি উপন্যাসটির অনুবাদ করেছিলেন।

'অভিনব বাংলা ব্যাকরণ' ছাত্রপাঠ্য বই—সম্ভবত প্রকাশকের তাগিদে তিনি এই বইটি লিখতে উৎসাহ বোধ করেছিলেন। তিনি নিজে শিক্ষক হওয়ায় পাঠ্যপুস্তক রচনায় তাঁর অধিকার ছিল সন্দেহ নেই। তবে এ জাতীয় রচনায় তাঁর প্রতিভা বা স্বকীয়তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

এই সময় থেকেই বিভূতিভূষণের দিনলিপির গ্রন্থাকারে প্রকাশ শুরু হয়। 'মিত্র ও ঘোষ'-এর গজেন্দ্রকুমার মিত্র দিনলিপিগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে প্রথম উৎসাহী ছিলেন।

খেলাৎচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলের স্মৃতি নিয়েই তিনি 'অনুবর্তন' উপন্যাসটি লিখেছিলেন বলে মনে হয়। অবশ্য এই উপন্যাসটি যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল (২২শে জুলাই, ১৯৪২) তখন তিনি খেলাৎচন্দ্র স্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। এই উপন্যাসটির মূল কাহিনী অবশ্যই কাল্পনিক—ক্লার্কওয়েল সাহেবের মতো চরিত্র বা এই উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটনার সন্ধান করতে খেলাৎচন্দ্র স্কুলের নথি-পত্র ঘাঁটবার প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন ধরনের কাজ করলেও বিভূতি-ভূষণ প্রধানত স্কুলের শিক্ষকের বৃত্তিই গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে জাঙ্গিপাড়া, তারপর হরিনাভি, কয়েক বছর পর খেলাৎচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুল। সব শেষে তিনি বারাকপুরের কাছে গোপালনগর হাই স্কুলে কাজ করেছিলেন—অবশ্য শেষ দিকে কয়েক বছর এই কাজ তিনি নিয়মিতভাবে করতে পারেন নি। 'অনুবর্তন' উপন্যাসে তিনি বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের জীবনের ছবি এঁকেছেন। তাদের জীবনের অভাব-অনটন, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার যে ছবি তিনি এঁকেছেন তার মূলে ছিল তাঁর নিজেরই অভিজ্ঞতা আর সমবেদনা।

..............................১৩..............................

১৩২৪ সালে গৌরী দেবী মারা যান। এর তেইশ বছর পরে ১৩৪৭ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ (৩রা ডিসেম্বর, ১৯৪০) রমা দেবীকে বিয়ে করেন। রমা দেবী তাঁর ডাক নাম অনুসারে কল্যাণী দেবী বলেও পরিচিত; বিভূতিভূষণের দিনলিপি বা চিঠিপত্রে এই নামই দেখা যায়। কল্যাণী দেবীর বাবা ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভূমি ফরিদপুর—তিনি সে সময় বনগাঁয় আবগারী বিভাগের কর্মচারী ছিলেন।

বিয়ের বছরখানেক আগে কল্যাণী দেবীর সঙ্গে বিভূতিভূষণের পরিচয় হয়েছিল। বিয়ের আগে কল্যাণী দেবীর সঙ্গে বা তাঁর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। 'আমার লেখা' গ্রন্থে বিয়ের আগে কল্যাণী দেবীকে লেখা বিভূতিভূষণের একটি চিঠিও সংকলিত হয়েছে। এই বিয়েকে ঠিক প্রেমের বিয়ে বলা চলে কিনা জানি না। তবে অফুরন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে এক অন্তহীন স্নেহের সার্থক পরিণয়। বিভূতিভূষণের জীবনকথায় 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক বলেছেন,—

"প্রথমা পত্নী গৌরী দেবীর মৃত্যুর পর দীর্ঘ একুশ বৎসরকাল তিনি প্রায় সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেছিলেন।"

সন্ন্যাসীর মতোই তিনি কিছুটা উদাসীন প্রকৃতির ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে স্নেহ-প্রেমভরা সংসারকে তিনি কোনোদিনই উপেক্ষা করতে চান নি। শৈশব থেকেই তিনি মায়ের অপরিসীম স্নেহ আর সেবা পেয়েছিলেন। পরে আত্মীয়-অনাত্মীয় অনেক নারীর স্নেহ-মিশ্র সেবা পেয়ে তিনি নারীর কল্যাণ মূর্তির প্রতি অনুরাগ বা শ্রদ্ধা পোষণ করেছিলেন। নিজে উদাসীন সন্ন্যাসীর মতো মেসে কাটালেও গৃহজীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। সম্ভবত ভ্রাতৃ-

বধূর হাতের সেবা পাওয়ার আগ্রহেই তিনি ভাই নুটবিহারীর বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মতো সংসার সম্পর্কে উদাসীন আত্মনিমগ্ন মানুষের পক্ষে গৃহের নিশ্চিন্ত আশ্রয়েরই দরকার ছিল।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যজীবনে তাঁর এই বিবাহ বিভাজিকা রেখা না হলেও তাঁর বিয়ের আগের আর পরের লেখার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য অনুভব করা যেতে পারে। এর আগে বিভূতিভূষণ যে-সব গল্প-উপন্যাস লিখেছেন তার মধ্যে প্রেমের ছবি নেই বললেই হয়। অপু-অপর্ণা, জিতু-মালতী বা জিতু-হিরণ্ময়ীর ছবির মধ্যে প্রেমের তীব্রতা নেই। এগুলি স্মৃতির রসে জারিত। কিন্তু এর পর থেকে তাঁর গল্প-উপন্যাসে প্রেম একটা বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে শুরু করেছে। 'বিপিনের সংসার' (ভাদ্র, ১৩৪৮) উপন্যাসে প্রেমের বিভিন্ন ছবি দেখি—প্রেমের বিচিত্র রূপই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। 'দুই বাড়ী' (ভাদ্র, ১৩৪৮) উপন্যাসে প্রথম প্রেমের রোম্যান্টিক ছবি পাই—অবশ্য রোমান্স এখানে বাস্তবকে ছাড়িয়ে যায় নি।

প্রেম বা নর-নারীর সম্পর্ক বিষয়ে বিভূতিভূষণের যেন একটা সংকোচ ছিল। তাই বিয়ের আগের লেখায় তিনি এই বিষয়টি যেন সন্তর্পণে পরিহার করতে চেয়েছেন। পরের লেখাগুলিতে তাঁর স্বভাবগত সেই সংকোচ অনেকটা দূর হয়েছে। অবশ্য নর-নারীর সম্পর্ক তিনি কোথাও অতিশয়িত বা বিকৃত আকারে প্রকাশ করেন নি—ঐ সম্পর্কের শোভন-রূপই তিনি এঁকেছেন, তাঁর লেখা কোথাও শালীনতা অতিক্রম করেনি। তিনি সহজভাবে প্রেমের ছবি এঁকেছেন : 'স্বপ্ন-বাসুদেব', 'বাক্স-বদল', 'মূলো—র‍্যাডিশ—হর্স র‍্যাডিশ', 'সুলোচনার কাহিনী', 'মরফোলজি'—এই সব গল্পের কথা মনে করতে পারি।

এই প্রসঙ্গে একটি উপন্যাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি, সেটি 'অথৈ জল'। এই উপন্যাসে রূপাশ্রিত প্রেমের যে ছবি আছে তা 'পথের পাঁচালী'র লেখকের রচনা বলে মনেই হয়

না। অবশ্য বিভূতিভূষণ এখানেও অশোভনকে প্রশ্রয় দেন নি। তবে সহজাত সংকোচ দূর না হলে তিনি এই উপন্যাস লিখতে পারতেন না।

পরিণত বয়সে বিয়ের যে ছবি 'ইছামতী'র মধ্যে আছে, তা তাঁর নিজের জীবন থেকেই নেওয়া। বিভূতিভূষণ এখানে অবশ্য পুরোদস্তুর আত্মকথা লেখেন নি, কিন্তু ভবানী বাঁড়ুজ্যের চরিত্র বা ভাবনায় সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে তাঁর নিজের চরিত্র অনেকটা ফুটে উঠেছে। বিভূতিভূষণকে বোঝবার পক্ষে এই চরিত্র অনেকটা বড়ো সহায়। তিলুর চরিত্র কল্পনায় কল্যাণী দেবীর প্রভাব আছে কিনা বলা যায় না। তবে তাঁকে নিয়ে ইছামতীতে স্নান করতে যাওয়ার যে বর্ণনা বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে আছে তা যে 'ইছামতী' উপন্যাসের কথা মনে করিয়ে দেয় তা আগেই উল্লেখ করেছি। 'ইছামতীতে ডুবে যাওয়ার ঘটনাটিরও বাস্তব ভিত্তি ছিল—অবশ্য বিভূতিভূষণ এখানে কল্পনার রং চড়িয়েছেন।

১৪

কল্যাণী দেবীর প্রথমে পর পর দু'টি মেয়ে হয়ে শৈশবেই মারা যায়। এর পর ১৩৫৪ সালের ২৮শে আশ্বিন বুধবার (১৯৪৭) তাঁর একটি ছেলে হয়। এই ছেলের নাম বাবলু—ভালো নাম তারাদাস। বাবলুর জন্ম বিভূতিভূষণের ব্যক্তিজীবনেও যেমন, সাহিত্যজীবনেও তেমনই একটা বড়ো ঘটনা। বৈরাগী না হলেও বিভূতিভূষণ কোনো-দিন সংসারে আসক্ত ছিলেন না। সংসারের সকলকেই তিনি ভালোবাসতেন, কিন্তু কারও প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ ছিল না। বাবলু জন্মাবার পর তিনি ঐ শিশুর প্রতি একান্তভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শেষ দিকে তিনি বাবলু-অন্ত প্রাণ হয়ে উঠেছিলেন

বললেও হয়তো বাড়িয়ে বলা হয় না। বাবলুর প্রতি তাঁর একান্ত অনুরক্তির কিছুটা বর্ণনা কয়েকজনের স্মৃতিকথা থেকে উদ্ধার করলাম —"বিভূতিবাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম যে, তাঁর পরিবারটি ছোট— বিভূতিবাবু, তাঁর স্ত্রী আর ছোট একটি ছেলে, তার বয়স বছর দেড়, নাম বাবলু। বিভূতিবাবু নামের সঙ্গে একটা আদরের 'সু' যোগ করে দেওয়ায় পুরো নামটা দাঁড়িয়েছিল বাবলুসু।...

বিকেল বেলা বিভূতিবাবু পাড়ার প্রান্তে রেল লাইনের ধারে বাবলুসুকে নিয়ে এসে বসতেন। ঘণ্টাখানেক ব'সে ছেলেকে রেল গাড়ি যাতায়াত দেখাতেন। আমরাও অনেকে জুটতাম। সময়টার নাম দিয়েছিলাম বাবলুসুর আসর। আসরের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল বাবলুসুর কীর্তি।"—প্রমথনাথ বিশী, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭।

"বাস্তবিক, বাবলু ছিল যেন তাঁর ধ্যান, জ্ঞান ও কল্পনা। এই তিন বছরের শিশুটির তিনি ছিলেন একমাত্র সাথী—খেলা-ধূলায়, আহারে-বিহারে—সকল সময়। তিনি তার সঙ্গে সর্বদা খেলা করতেন শিশু হয়ে। কতদিন দেখেছি, তিনি ঘোড়া হয়েছেন আর বাবলু তাঁর পিঠের উপর ব'সে হেট-হেট করছে। কখনও বা ছেলেকে একটা কাঠের গাড়িতে চাপিয়ে তার দড়ি ধ'রে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি। আবার কখনও দেখেছি, ছেলেকে কাঁধের উপর বসিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছেন। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, এর জন্যে কখনও তাঁর মনে এতটুকু সঙ্কোচ বা লজ্জা দেখিনি। জজ-ব্যারিস্টার আসুন বা রাজা-মহারাজা আসুন, ছেলের সঙ্গে আচরণের কোনো রকম লুকোচুরি কখনও দেখিনি। বরং কেউ সে দিকে কটাক্ষ করলে তিনি পুত্রস্নেহে আরও গদগদ হয়ে উঠতেন।" —সুমথনাথ ঘোষ, অদেব।

"বিভূতি বলত, 'আমি বনে-জঙ্গলে একা একা ঘুরি, বনে-জঙ্গলে গেলে ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করতে পারি।' একদিন সে বলল,

'বাবলুর (শিশু পুত্র) মধ্য দিয়ে যেন ভগবানের মহিমার আস্বাদ পাচ্ছি।' কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারিনি, কথাটা বৈষ্ণব রসতত্ত্বের একটা স্তরের কথা বলে। তবে পরিহাস করতেও ছাড়িনি। বাবলুর প্রতি স্নেহান্ধতা নিয়ে অনেক পরিহাস করেছি তার সঙ্গে।" —কালিদাস রায়, কথা সাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।

বিভূতিভূষণের শেষ দিকের কোনো কোনো লেখার মধ্যে শিশু একটা বড়ো স্থান নিয়ে আছে। বিশেষ করে 'কুশল পাহাড়ী'র 'সীতানাথের বাড়ী ফেরা' আর 'খেলা' গল্পের কথা আমাদের মনে পড়বে। এই দু'টি গল্পে দু'টি শিশুর ছবি আছে—সেই সঙ্গে আছে বাপের ভালবাসা। কালিদাস বৈষ্ণবের বাৎসল্য রসের কথা স্মরণ করেছেন। এই দু'টি গল্পে ঐ বাৎসল্যের যে ছবি আছে উনিশ শতকের পরে লেখা বাংলা সাহিত্যে তার জুড়ি এক বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' ছাড়া অন্য কোথাও আছে বলে মনে করতে পারছি না। বাৎসল্যের অতি গভীর রসবোধের দৃষ্টান্ত হিসাবে 'খেলা' গল্পে মতিলালের মনোভাবের বর্ণনা থেকে কয়েক ছত্র তুলে ধরতে পারি,—

"এই সব স্থূলবুদ্ধি লোকে কি বুঝবে—খোকা তাকে কতখানি ভালবাসে বা সে খোকাকে কত ভালবাসে। এদের কাছে কিছু বলে লাভ নেই। পিতা-পুত্রের সেই সূক্ষ্ম অবিচ্ছেদ্য ভালবাসার গূঢ় তত্ত্ব, যা মুখে বলা যায় না, যার বলে এক বছরের শিশু তার অত বয়সে বড় বাপের মনের ভাব বুঝতে পারে, সে জিনিসের ব্যাখ্যা যার তার কাছে করে কি হবে?"

'ইছামতী'তে শিশুপুত্র টুনুকে নিয়ে ভবানী বাঁড়ুজ্যের যে বাৎসল্যের ছবি আঁকা হয়েছে তা তাঁর নিজেরই জীবন থেকে নেওয়া। এখানে শিশু ভালবাসার ধন সন্দেহ নেই—কিন্তু সে সেই সঙ্গে ভগবানের মাধুর্য আস্বাদ করার একটা পরম আশ্রয়। ভবানী বা বিভূতিভূষণের কাছে অবশ্য শিশু প্রতীক মাত্র ছিল না—শিশুর প্রেমই তাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। ভবানীর মতোই বিভূতি-

ভূষণের অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা আত্মজ শিশুর মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে উঠতে চেয়েছিল।

বাবলুর প্রতি বিভূতিভূষণের ভালোবাসা বা সাহিত্যে ঐ ভালোবাসার প্রকাশ যে পুরোপুরি খাঁটি ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি কথা আমাদের মনে আসে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখি যে, যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি—আত্মনস্তু কামায় 'পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।' পুত্রের আকাঙ্ক্ষায় পুত্র প্রিয় নয়, আত্মার কামনায় পুত্র প্রিয় হয়।—বিভূতিভূষণের তুলনাহীন বাৎসল্যের অন্তরালে ছিল তাঁর নিজেরই অন্তরাত্মার আকাঙ্ক্ষা। শিশুর মধ্যে তাঁর আত্মা অনন্ত ভালোবাসার স্বাদ পেয়েছিল বলেই তিনি শিশু সন্তানকে অত গভীরভাবে ভালাবাসতে পেরেছিলেন। মহাকবির নিঃসক্ত আত্মা বুঝি এমন করেই জীবনের পরম অনুরাগে স্বেচ্ছাবন্দিত্ব স্বীকার করে।

..............................১৫..............................

বিভূতিভূষণের শেষ জীবনের লেখায় দু'টি জিনিস দেখা যায়। একদিকে তাঁর কবিদৃষ্টিতে যে সব জিনিস এর আগে ধরা দিয়েছিল, এই সময়ে সেগুলো পরিণত হয়ে উঠেছে; অন্য দিকে জীবনের পরিবর্তমান রূপ তাঁর কল্পনাকে আকর্ষণ করেছে।

শেষ ক'বছরের উপন্যাসের মধ্যে দু'টির নাম বিশেষভাবে করতে হয়—একটি 'দেবযান' আর একটি 'ইছামতী।'

মৃত্যুর পর মানুষের আত্মার অস্তিত্ব আছে কিনা এ সম্পর্কে যৌবন থেকেই তাঁর আগ্রহ ছিল। গৌরী দেবীর মৃত্যু, বোন আশালতার মৃত্যু, তাঁর আগ্রহের বড়ো কারণ। কয়েক বছর পরে মায়ের

মৃত্যুও তাঁকে মৃত্যু সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলে। পরলোক সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কী ছিল জানা যায় না, কিন্তু পরলোক সম্পর্কে একটা চেতনা তাঁর অন্তরে জেগেছিল। ঐ চেতনাটিই 'দেবযান' উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসের গল্প কাল্পনিক—এই উপন্যাসের জগতের পরিকল্পনাও একটা উচ্চ শ্রেণীর কবিকল্পনা। কিন্তু এ কল্পনাচারী কবির খেয়ালমাত্র নয়, এ বিভূতিভূষণের আন্তরিক বিশ্বাস। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে হোক বা পরলোকতত্ত্বের বিভিন্ন গ্রন্থ পড়েই হোক—পরলোক সম্পর্কে তাঁর অন্তরে একটা স্থির বিশ্বাস জেগেছিল। প্ল্যানচেট বা অনুরূপ কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রেত-লোকের সংযুক্ত হওয়ার আগ্রহ তাঁর ছিল বলে মনে হয় না। পরলোক সম্পর্কে তাঁর ধারণা—সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর কল্পনা বা চেতনারই একটা অংশ। 'দেবযান' উপন্যাসে ঐ কল্পনা বা চেতনারই সার্থক প্রতিফলন দেখা যায়।

পরলোক সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা বিভূতিভূষণের একটি পত্রের কিছু অংশ 'দেবযান' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে সৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্রের কিছু অংশ উদ্ধার করলাম।—

"আপনি পরলোক সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন? আমি সারা জীবন ধরে জন্ম-মৃত্যু রহস্যের আলোচনা করে ও রহস্য জেনে ফেলেছি। আমি গত ২৫ বৎসর ধরে spiritualism আলোচনা করেছি—মৃত্যু যে বৃহত্তর জগতের দ্বার সেকথা আমি জানি যখন আমার বয়স ২৭ বৎসর তখন থেকেই। প্রেতলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছুই নেই।

পৃথিবীর ঊর্ধ্বে বহু স্তর বিদ্যমান, বিশ্বে বহুলোক, বহু স্তর, বহু গ্রহ, মৃত্যুর পর সেখানে জীবের গতি হয়।

এই সব super-mundane worlds আছে এবং ঋষিরাও প্রাচীন যুগে তাদের অস্তিত্ব জেনেছিলেন। বৃহদারণ্যক ও ঈশোপনিষদে এদের কথা আছে।"—ধৃতিদীপা, ১৬ই আষাঢ়, ১৩৭৩।

'ইছামতী' উপন্যাসটি বিভূতিভূষণের প্রথম জীবনের সাধের পরিপূর্ণতা। কলকাতার খেলাৎচন্দ্র স্কুলের কাজ ছেড়ে দেওয়ার কিছুকাল পরে তিনি ইছামতী নদীর তীরে তাঁর জন্মভূমি বারাকপুরে স্থায়িভাবে বাস করতে শুরু করেছিলেন। ঘাটশিলায় তাঁর ছোটো ভাই নুটবিহারী ডাক্তারি করতেন। বিভূতিভূষণ মাঝে মাঝে ঘাটশিলায় যেতেন, কিছুকাল সেখানে থাকতেন, আবার বারাকপুরে ফিরে আসতেন। বিহারের বনভূমির সৌন্দর্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল—তাঁর দিনলিপির কোনো কোনো অংশে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ঘাটশিলা থেকে লেখা একটি পত্রে তিনি তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছেন,—"এখানে পাহাড়ে বেড়ান, কাল বিকেলে পাহাড়ের নীচে একটা হ্রদে স্নান করে এলাম, বনে বনে কুরচিফুলের সুবাস, কচি পাতা ওঠা শালবন, কি সুন্দর লাগলো অরণ্যপ্রকৃতির অপূর্ব পরিবেশটি। ঘাটশিলার নিকটে কালচিতি নামক মৌজায় ২৫ বিঘা ধানজমি ও শালবন এবং একটা বড় পুকুর (কাছে পাহাড়, ঝর্ণা ও বন) দু'হাজার টাকায় ক্রয় করার দরুন ওখানে একটি ছোট ঘর বনপ্রান্তে। শাল ফুলের সুবাস ও মহুয়া ফুলের মিষ্ট বাতাস—কেমন মনে করেন এ পরিবেশ? আসবেন দু' দিনের জন্যে?'—শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।

বিহারের আরণ্য প্রকৃতির রূপ তাঁকে মুগ্ধ করলেও তাঁর প্রাণের টান ছিল বারাকপুরের কোল দিয়ে বয়ে যাওয়া ইছামতীর উপর। ইছামতীর উপর এই টান কেবল তাঁর নিজেরই ছিল না, এই টান কল্যাণী দেবীর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। 'হে অরণ্য কথা কও' দিনলিপিতে তিনি লিখেছেন,—

"মঙ্গলবার দিন যখন গাড়ী এসেছে খড়গপুরে, তখন বাংলা দেশের সবুজ ঘাসভরা মাঠ ও টলটলে জলে ভর্তি মেদিনীপুর জেলার খালবিল দেখে আমাদের ইছামতীর কথা মনে পড়ে গেল। খড়গপুর থেকে তখন সবে নাগপুর ছেড়েছে, কল্যাণী বলে উঠলো—'আজই চলো বারাকপুর যাই, ইছামতী টানচে।"

আমারও মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে তখন যশোর জেলার এই ক্ষুদ্র গ্রামটির জন্যে। যত দেশ-বিদেশেই বেড়াই, যত পাহাড়-জঙ্গলের অপূর্ব দৃশ্যই দেখি না কেন, বাল্যের লীলাভূমি সেই ইছামতীর তীর যেমন মনকে দোলা দেয়—এমন কোথাও পেলাম না আর।"

'ইছামতী'কে নিয়ে তিন খণ্ডের এপিক উপন্যাস লেখবার কল্পনা ছিল বিভূতিভূষণের—তিনি কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ছবি আঁকতে উৎসুক হয়েছিলেন ভবানী বাঁড়ুজ্যের ছেলে টুনুর জীবন নিয়ে। মৃত্যু এসে সে পরিকল্পনায় ছেদ এনে দিয়েছে। শৈশবের স্বপ্নলোক নিশ্চিন্দিপুরের জীবন থেকে শুরু করে অপুর জীবনের উত্তর-পর্ব অথবা আর একটি নতুন জীবনের কল্পনা নিয়ে 'কাজল' লেখার জন্য তিনি প্রায় তৈরিও হয়েছিলেন—তাঁর কল্পনা আর কবি দৃষ্টির গোটা পরিচয়ই হয়তো এই সব কাহিনীর মধ্যে পেতাম। কিন্তু সে নিয়ে আক্ষেপ করে কী হবে?

শেষ দিকের লেখায় কাল সম্পর্কে তাঁর চেতনার আশ্চর্য পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর স্মৃতিময় লেখাগুলোর মধ্যে অতীতের মায়া বা আবেশ আছে বটে, কিন্তু তিনি যে নতুন কালকে চেনেন নি এমন নয়। তাঁর সমকালকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি 'অশনি সংকেত' ছাড়া অন্য কোনো উপন্যাস লেখেন নি, কিন্তু তাঁর অনেক ছোটো গল্পে রোমান্টিক-কল্পনা ভ্রষ্ট স্বার্থসর্বস্ব এই যুগের নিখুঁত ছবি আছে। 'কমপিটিশন', 'ব্ল্যাক মার্কেট দমন কর' বা 'আচার্য কৃপালনী কলোনী' পড়লে স্পষ্ট বুঝতে পারি তিনি এ যুগকে কত গভীরভাবে চিনে-ছিলেন। তাঁর কবিদৃষ্টিতে এই কালের মর্ম উদ্ঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল।

বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পর 'বনফুল' লিখেছিলেন—

"কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য শোক করবার প্রয়োজন নেই, কারণ সে ব্যক্তিটি অমর। আমার কষ্ট হচ্ছে এই ভেবে যে, আমাদের সেই বিভূতিকে আর দেখতে পাব না, যার ছেঁড়া গেঞ্জী আর ময়লা লুঙ্গী নিয়ে আমরা ঠাট্টা করতাম, যে ইলেকট্রিক পাখা বন্ধ করে দিয়ে সিগারেট খেত, গরম লুচি আর বেগুন ভাজার প্রতি যার লোভ ছিল, মানুষের চেয়ে প্রকৃতির সঙ্গ যার বেশী ভাল লাগত, প্রকাণ্ড সভায় সভাপতিত্ব করার চেয়ে রেল লাইনের ধারে ডিসটাণ্ট সিগন্যালের নীচে বসে দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকাটা প্রিয়তর ছিল যার কাছে, বয়স্কদের এড়িয়ে কিশোর কিশোরীদের সঙ্গে আড্ডা জমাতে ভাল লাগত যার, সেই বিভূতি আর আমাদের কাছে আসবে না।"—কথাসাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭।

বিভূতিভূষণ কেবল কথাশিল্পী ছিলেন না, তাঁর জীবনটাই ছিল শিল্প—সেই শিল্পও তাঁর কথাশিল্পের মতোই সহজ। তার মধ্যে কোথাও এতটুকু আবিলতা এতটুকু কুটিলতা ছিল না। সহজের রসে তাঁর সারা জীবনই যেন জরানো ছিল। সুনীতিকুমার তাঁর চরিত্র সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা একেবারে যথার্থ।—

"তাঁর ব্যক্তিগত সরলতা এতখানি ছিল যে, নিজের কথা পঞ্চমুখে বলে যেতেন, নিজের ভুলচুক দোষক্রুটি হাস্যকর পরিস্থিতি কিছুই ঢেকে চেপে কথা কইতে জানতেন না। তাঁর মনটি ছিল স্ফটিকশুভ্র, তার অন্তস্তল পর্যন্ত দেখা যেত। অনেক সময়ে তাঁর নিজের আচরণ অন্যলোকের সম্বন্ধে যা তিনি নিজেই ব্যক্ত করতেন তা এত বোকার মত আমাদের কাছে লাগত যে, তা নিয়ে আমরা বহুভাবে তাঁকে ঠাট্টা করেছি, গঞ্জনাও দিয়েছি, কিন্তু তাতে তাঁর চিত্ত-প্রিয়তার কোন

বিকার কখনও দেখিনি। বিভূতিবাবুর অনুরাগী ভক্ত মেয়ে আর পুরুষ, স্কুলের ছেলে আর কলেজের অধ্যাপক জুটত প্রচুর। তিনি নিজেকে কারো কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন না, প্রাণ খুলে গা ঢেলে সকলের সঙ্গে মিশতেন। এতে করে মাঝে মাঝে নিজেকে খেলো করে ফেলতেন—কিন্তু বন্ধুদের অনুযোগে কোনো ফল হত না, ভারিক্কি হবার কলা তাঁর কৌশলের বাইরে ছিল।

সদানন্দ প্রকৃতিগতপ্রাণ আত্মভোলা এই মানুষটিকে ভাল না বেসে কেউ পারত না। ইনি কারো তাচ্ছিল্য তুচ্ছতামিশ্র ব্যবহার গায়ে মাখতেন না, এক সহজ চিত্তপ্রসন্নতা এঁকে যেন অভেদ্য বর্মে আবৃত করে রেখেছিল। ক্রমে বুঝছি, এই চিত্তপ্রসন্নতার আড়ালে তাঁর চরিত্রে এমন একটা বড় জিনিস ছিল যার হদিস আমাদের কাছে পৌঁছয় নি।"—তদেব।

বিভূতিভূষণের সদানন্দ আত্মভোলা ভাব বা তাঁর সহজ চিত্ত-প্রসন্নতা সম্পর্কে অনেক গল্প তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের লেখা থেকে জানা যায়। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর নিরভিমান প্রকৃতির দৃষ্টান্ত হিসাবে যে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা সভ্যতার পালিশ করা একালের সমাজে অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে।—

"একটি দিনের কথা। কোন একজন নামজাদা ব্যক্তি এক জায়গায় যাবেন বলে কথা দিয়ে শেষ পর্যন্ত গেলেন না। তাঁর না যাওয়ার অজুহাতটা খুবই হাস্যকর। আহ্বায়ক মশাইয়ের বাড়ীর গাড়ি কোন কারণে আবদ্ধ ছিল, সেইজন্য তাঁরা লোক পাঠিয়েছিলেন ট্যাক্সি করে সেই ঔপন্যাসিককে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মাত্র এই কারণেই সে ভদ্রলোক বেঁকে বসলেন। অথচ এমন একটা ক্ষেত্র, যেখানে এই না যাওয়াটা খুবই বিসদৃশ ব্যাপার। বিশেষ করে যে ভদ্রলোক নিতে এসেছিলেন, তাঁর আর মুখ দেখাবার পথ থাকে না। সাহিত্যিকদের সঙ্গে এঁর খুব খাতির—একথা সর্বজন বিদিত, অথচ সেই খাতিরের এই পরিচয়! বিড়ম্বিত অবস্থায় ভদ্রলোক চুপ করে

বসে আছেন। এমন সময়ে বড়দার প্রবেশ। বড়দা তো ভদ্র-লোকের মুখ-চোখের চেহারা দেখে উদ্বিগ্ন ভাবে সব খবর নিলেন। পরিশেষে উনি বললেন, আপনি কি মনে করেন, আমাকে দিয়ে আপনার মুখ রক্ষা হতে পারে? তা যদি হয়, চলুন আমি যাচ্ছি।

এই কথাটা ঠিক অনুরূপ অবস্থায় আর কেউ প্রস্তাব করতে পারতেন বলে আমি বিশ্বাস করি না।

আসলে জীবনের মূল সত্যটাকে উনি এত সহজ এবং অনায়াসরূপে দেখতে পেতেন, যার জন্য অনেক তথাকথিত শোভনতা বা সামাজিক শিষ্টাচার তাঁর চোখে নিরর্থক বলে প্রতিভাত হ'ত।"—শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।

বিভূতিভূষণ ভোজনপ্রিয় বলে বন্ধু মহলে পরিচিত ছিলেন, এমন কি কেউ কেউ তাঁকে ঔদরিক বলে জানতেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যাঁরা অন্তরঙ্গ ভাবে মিশেছেন তাঁরা জানতেন যে, বিভূতিভূষণ আসলে বেশি খেতে পারতেন না। বিচিত্র খাদ্যের স্বাদ পাওয়ার জন্য তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল, তিনি রুচিকর বিভিন্ন খাদ্য খেতে ভালবাসতেন। তাঁর মূল আহার ছিল খুবই পরিমিত। যেমন দু'চোখ মেলে পৃথিবীকে দেখার আগ্রহ ছিল, তেমনই রসনায় খাদ্যের বিচিত্র স্বাদ পেতে তিনি উৎসুক হতেন। দুই-ই যেন একই আকাঙ্ক্ষার রূপভেদ। এ প্রসঙ্গে দু'জনের স্মৃতিকথা থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করলাম।—

"বিভূতিভূষণ ভোজন বিলাসী ছিলেন, কিন্তু কলিকাতা শহরে দুই-একবার একসঙ্গে নিমন্ত্রণে গিয়া দেখিয়াছি, তিনি বচনে যেরূপ আড়ম্বর সৃষ্টি করিতেন, উদর তাঁহার ততখানি সমর্থন করিত না। আমি এই বিষয় লইয়া মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত রহস্য করিতাম। একদিনের কথা মনে আছে। আমি কলেজ স্ট্রীট হইতে পূজনীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ী যাইতেছি, বিভূতিভূষণ বনগ্রাম হইতে শিয়াল-দহে নামিয়া কলিকাতা আসিতেছেন, পথে মির্জাপুর পার্কের নিকট তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল। আমি তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলাম,

কাল কোথায় ছিলে ভাই? ও, কি প্রচুর খাওয়াটাই না খাওয়া গেল। শুনিবামাত্র বিভূতিভূষণ এমনভাবে গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন যে ব্যাপার দেখিয়া দু'-একজন করিয়া লোক জমিতে আরম্ভ করিল। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া সরিয়া পড়িলাম।"—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।

"ভোজনলুব্ধতার জন্য বিভূতিকে আমরা কতবার পরিহাস করেছি। সেকালে একালের মত রসনা তর্পণ সুখাদ্য এত সহজে অধিগম্য ছিল না। একদিন সে সুখাদ্যের অভাব বড় অনুভব করেছিল—সে কথা সে তার বহু রচনার বহু চরিত্রের মারফতে প্রকাশ করেছে। বিভূতি যাদের জীবন নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখেছে তাদের পক্ষে ভোজনলুব্ধতা একটা প্রধান, এমন কি সব চেয়ে বড়ো মনো-বৃত্তি। নিজে সুখাদ্যের অভাব একদিন অনুভব করেছিল বলেই ঐ মনোবৃত্তিটাকে অত চমৎকার করে ফোটাতে পেরেছিল। পরবর্তী জীবনে ভোজন সম্বন্ধে মৌলিক অনুরাগ প্রকাশও তাঁর দারিদ্র্যের মর্যাদা-স্বীকার। পরবর্তী জীবনে সে কি সত্যই ভোজনলুব্ধ ছিল? এটাও তার একটা অভিনয়। এক সঙ্গে পাশাপাশি বসে বহুস্থলে বহুবার ত খেয়েছি। দেখেছি—সে ভোজনলোভ নিয়ে খুব আস্ফালন করেছে কিন্তু কী যে খাচ্ছে সে দিকে তাঁর একেবারেই লক্ষ্য বা মনোযোগ নেই। সে দই খাচ্ছে কি খই খাচ্ছে সে দিকে তার হুঁস নেই। পরিবেশককে খেয়েও বলছে পাইনি, না পেয়েও বলেছে খেয়েছি ত। ভাতে পোলাওয়ে বা আলুতে রসগোল্লায়, প্রথম জীবনের বৈঁচি বনকুলে ও আম কাঁঠালের মতো তার কোনো বিভেদ-জ্ঞান নেই। মুড়ি মিছরিতে সমান দর কষতে আর কাকেও দেখিনি। খাওয়ার সময় গল্পে এত মসগুল কিংবা অন্যমনস্ক যে তার আস্ফালন-টাই সার, খাওয়াটা গৌণ মাত্র।"—কালিদাস রায়, কথা সাহিত্য, অগ্রহায়ণ. ১৩৫৭।

বিভূতিভূষণ একদিকে ছিলেন জীবনের প্রতি একান্ত অনুরক্ত,

অন্যদিকে ছিলেন একেবারে উদাসীন। অনুরক্ত হলেও তিনি আসক্ত ছিলেন না, উদাসীন হলেও তিনি বিরাগী ছিলেন না। ব্যক্তি বিভূতিভূষণের স্বভাব এই, কবি বিভূতিভূষণের স্বভাব এই।—তাঁর আন্তরিক প্রীতি অল্পক্ষণেই আত্মীয় করে নিত। একমাত্র অর্থের প্রতি তাঁর অনাসক্তি ছিল। লেখার জন্য তিনি যে সব চেক পেতেন সময় মত না তোলার জন্য তার অনেকগুলিই বাজে কাগজের সামিল হয়ে গেছে, সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁর প্রধান প্রকাশক 'মিত্র ও ঘোষ'-এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী কথাসাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর এই অর্থে অনাসক্তির অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ভালো করে দেখবেন বলে তিনি হিসেব নিতেন, কিন্তু সে হিসেব আর মেলাতেন না, কেউ এ নিয়ে অনুযোগ করলে সলজ্জভাবে সময়াভাবের কথা বলতেন। নিছক বিষয়ের কথা তাঁর ভালো লাগত না। বেশভূষায় তিনি ছিলেন উদাসীন। এমনই ছিল তাঁর প্রকৃতি। এই জন্যই যাঁরা তাঁর সঙ্গে একবার মিশেছেন তাঁদের কাছে তাঁর স্মৃতি এত উজ্জ্বল, এত মধুর। এই জন্যই বন্ধু বলেছিলেন, কী মানুষ ছিলেন!

..............................১৭..............................

বাণী রায় বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পর তাঁর একটি কথা স্মরণ করেছেন।—

"আমার বিষয়ে যখন লিখবেন, তখন সবাইকে বলে দেবেন আমার কোন অতৃপ্তি নেই। সব ইচ্ছাই আমার পূর্ণ হয়েছে। বেড়াবার ইচ্ছা ছিল তা খুব বেড়িয়েছি। খাবার আকাঙ্ক্ষা ছিল ভাল মন্দ—ওঃ, খুব খেয়েছি। নাঃ, আমার আর আকাঙ্ক্ষা নেই। আরও যা ছিল সাধ পূর্ণ হয়েছে।···

"তা হলে, মনে থাকে যেন, আমার কথা যখন লিখবেন, লিখবেন আমার কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ নেই। আমি জীবনে তৃপ্ত হয়েছি।"—কথা সাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।

এমন কথা বলতে পারেন এ রকম লোক খুব কম। বিশেষ করে এ যুগে মানুষের অসন্তোষ আর অতৃপ্তি যখন দিনে দিনে বেড়েই চলেছে, অখন 'তৃপ্ত হয়েছি' এ কথা বলার লোক যেন কল্পনাই করা যায় না। বিভূতিভূষণ তৃপ্ত হয়েছিলেন কারণ তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল সহজ। সেই জন্য জীবনে তিনি পরিতৃপ্ত, মরণে তিনি পরিপূর্ণ। জীবন থেকে মরণে উত্তরণে তাঁর দ্বিধা ছিল না। 'দেবযান' শিল্পকৃতের কল্পনা নয়—মৃত্যুর পরে যে আর এক জগৎ আছে এ ছিল তাঁর গভীর প্রত্যয়। তাঁর জীবনের মতো তাঁর মৃত্যুর কাহিনীও তাই আশ্চর্য।

বিভূতিভূষণ তখন ঘাটশিলার বাড়িতে। তিনি নিত্যকার অভ্যাস মত ভোরে উঠে বনের মধ্যে কয়েক মাইল ঘুরে এসে জল-খাবারে তাঁর অন্যতম প্রিয় খাদ্য খাচ্ছেন এমন সময় বুকে একটু ব্যথা বোধ করলেন। তিনি প্রথমে একটু জল চেয়ে খেলেন। নুটবিহারী ডাক্তার—বাড়িতে কোরামিন ছিল; কয়েক ফোঁটা কোরামিন খাওয়ার পর তিনি সুস্থ বোধ করলেন। হজমের গোলমাল বা অন্য কারণে হঠাৎ শরীর খারাপ হয়েছে মনে করে তিনি এ বিষয়ে আর বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করলেন না—নিজের শরীরের যত্ন কবেই বা নিতেন। বারাকপুরে ইছামতীতে স্নান করতেন—এখানে একটা বড়ো পুকুরে বাবলুকে নিয়ে স্নান করতে যেতেন। এ দিন শরীর একটু খারাপ বলে একাই গেলেন। তারপর সারা দিন বিশ্রাম করায় শরীর আর খারাপ বোধ করেন নি।

সে সময় প্রমথনাথ বিশী ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণের প্রতিবেশী। এই দিন বা পরের দিনের যে বিবরণ তাঁর স্ত্রী সুরুচি দেবী লিখেছেন তা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা।—

"কোনও এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে সাহিত্যিকবৃন্দের নিমন্ত্রণ ছিল। ভদ্রলোকের নিজের মোটরগাড়ী এসে সবাইকে নিয়ে যাবে। আমাদের বাসার সামনে দিয়ে গাড়ী চলে গেল বিভূতি-বাবুকে আনতে, কিছুক্ষণ পর এঁকেও নিয়ে গেল। সেদিন বেশ

ঠাণ্ডা পড়েছিল, উনি একটু অসুস্থ শরীরে গেলেন। রাত নটার সময় ফিরে এসে বললেন, বিভূতিবাবু মোটরের মধ্যে দু'বার বমি করে অসুস্থ হয়েছেন। বললেন, 'ভাগ্যিস বাবলুকে আনিনি সঙ্গে করে।' (তিনি প্রায়ই ছেলে ছাড়া কোথাও যেতেন না।) শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বিশেষ কাজে উনি কলকাতা যাবেন। কাপড়-জামা পরে খেতে যাবেন, এমন সময় সুমথবাবু এদিকে আসছেন দেখে উনি বললেন, 'কি ব্যাপার? বিভূতিবাবু কেমন আছেন?' সুমথবাবু বললেন,—'তাঁর জন্যই তো আপনার কাছে এসেছি। তিনি রাতে গাড়ি থেকে নামবার সময় বললেন—আমাকে ধরো। ধরে নামাতে সিঁড়িতেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ধরাধরি করে বারান্দায় খাটিয়ায় শোয়ান হল। সারা রাত ডাঃ বোস ও ভ্রাতা ডাঃ ব্যানার্জি ঔষধ ইনজেকসন করেছেন। সকালের দিকে কিছু সুস্থ হয়েছেন। এখন তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাবার কথা ভাবা হচ্ছে।' উনি বললেন,—'অম্বলের জন্য এ রকম হয়েছে—কাল সারা রাত অত কষ্ট গেছে—এখন আবার রাস্তার ধকল হয়তো সহ্য করতে পারবেন না—কোনও বিপদ হতে পারে।'

উনি একাই কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন। বাড়ীতে আমাদের অন্য পুরুষ মানুষ নেই যে, খবর নেব। আমি নিজে অসুস্থ ছিলাম, উৎকণ্ঠায় সারা দিন কেটে গেল। পরদিন খোকনকে পাঠালাম—সে এসে বললো,—'দেখলাম জ্যেঠামশাই ঘুমোচ্ছেন, জ্যেঠিমা বললেন ভালই আছেন এখন।' অনেকটা স্বস্তি পেলাম কিন্তু নিজে যেতে না পারায় বড় দুঃখ অনুভব করলাম মনে। পরদিন বেলা আটটা নয়টা হবে স্থানীয় এক ভদ্রলোক জানালেন, বিভূতিবাবুর অবস্থা খুব খারাপ। শোনা মাত্র যে মনের অবস্থা কেমন হল আজ তা কিছুই প্রকাশ করতে পারবো না। একটা রিক্সা ডেকে খোকনকে সাথে নিয়ে চলে গেলাম। বারান্দায় নানা জাতীয় লোক, ঘরে নানা জাতীর লোক—কতক চেনা কতক অচেনা। বিভূতিবাবুর বিছানার

ধারে গেলাম অতি ধীরে—দেখলাম, তখন জ্ঞান আছে। মাঝে মাঝে দুই একটি ভুল কথা বললেন। চোখের চাহনি পরিষ্কার। আমাকে ও খোকনকে চিনলেন। মাঝে মাঝে নিজের একটা আঙ্গুল ঈষৎ কামড়াচ্ছেন—যেন কিছু ভাবছেন। কপাল আর চুলে হাত বুলোচ্ছেন। মুখে কিন্তু তাঁর কোন ম্লানিমা নেই। নিশ্বাস খুব জোরে জোরে পড়ছে, এবং তাতেই বেশ কষ্ট হচ্ছে। আস্তে আস্তে মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম—আরাম পেলেন বুঝলাম। মধ্যে মধ্যে হেঁচকি উঠছিল সে জন্যে কি একটা ভেজান রঙ্গীন জল অল্প অল্প মুখে দেওয়া হচ্ছিল, তাতে যে তাঁর তৃষ্ণা হচ্ছিল না তা বোঝা যাচ্ছিল। তাও কতক্ষণ বাদ বাদ হেঁচকি উঠছিলই। ইতিমধ্যে বরফ ভরে ব্যাগ আসলো। সেইটি মাথায় দিতেই আরামে চোখ বুঝলেন, মনে হলো ঘুমিয়ে পড়বেন।

বিভূতিবাবুর স্ত্রী কল্যাণীদির মুখের দিকে চেয়ে দেখি মুখখানা যেন ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে—তিনি তাঁর স্বামীর শয্যাপার্শ্ব থেকে উঠে স্নানাহার করতে যেতে রাজী হচ্ছেন না। অনেক অনুরোধের পর রাজী হলেন। নুটুবাবুকে (বিভূতিবাবুর ভাই) বার বার ডেকে বললেন—ঠাকুরপো, এসো কাছে বসো। কিন্তু নুটুবাবু দাঁড়িয়ে কেবলই কাঁদতে লাগলেন, কাছে বসতে পারছিলেন না। কিছুক্ষণ বাদে একটু শান্ত হয়ে বসে পেটে মালিশ করতে লাগলেন। কল্যাণী-দি তখন উঠে গেলেন। স্নান সেরে সিঁদুরের টিপ পরে একখানা রঙীন শাড়ী পরেছেন দেখলাম। সেই শাড়ীই শেষ পর্যন্ত তিনি পরে ছিলেন।”—শেষ দুই বছর, কথাসাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।

বিভূতিভূষণ বুঝতে পেরেছিলেন যে মৃত্যু আসতে আর বেশি দেরি নেই। কিন্তু সে জন্য তাঁর মনে কোন উদ্বেগ ছিল না। তিনি ছিলেন দেবযানে বিশ্বাসী—কল্যাণী দেবীর অন্তরেও সে বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁদের মনেপ্রাণে বিশ্বাস ছিল যে, এই জীবনের পারে আর একটি লোক আছে সেখানে আবার তাঁরা একদিন মিলবেন। সেই

লোকে গৌরী দেবী প্রতীক্ষা করছেন, তাঁদের যে দু'টি মেয়ে এ জগৎ থেকে হারিয়ে গেছে সেখানে তাদের ফিরে পাবেন। সুতরাং ভয় নেই, শোক নেই—আছে শুধু আসন্ন বিচ্ছেদের সুতীব্র বেদনা।

বিভূতিভূষণ বিষয়ের চিন্তা করেন নি, তিনি গেলে তাঁর সংসারের কী হবে সে কথাও ভাবেন নি। তিনি ভগবানের নাম করতে বলেছেন, সাধকদের নাম করতে বলেছেন। কল্যাণী দেবী ভগবানের নাম সাধকদের নাম শোনাতে লাগলেন। বিভূতিভূষণ বললেন যে, একটি নাম বাদ পড়েছে। কল্যাণী দেবী কোন নাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন রামপ্রসাদ। কল্যাণী দেবী রামপ্রসাদের নাম করলেন। এই বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি শেষ সাজে সাজাবার সময় স্বামীর কপালে নিজের হাতে চন্দন দিয়ে রামকৃষ্ণ নাম লিখতে পেরেছিলেন।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কল্যাণী দেবী স্বামীর কাছে বসে আছেন। মৃত্যু যে অলক্ষ্য চরণে আসছে তা আর অজানা ছিল না। বিভূতি-ভূষণ শেষ শয্যায় শুয়ে শান্ত নিরাকুল চিত্তে কী যেন করছেন। বাবলু পাশের ঘরে সন্ধ্যা থেকে ঘুমোচ্ছিল, সে হঠাৎ জেগে কেঁদে উঠল। কল্যাণী দেবী শুনলেন—কিন্তু এই শেষ সময় স্বামীকে মুহূর্তের জন্যও ছেড়ে যেতে মন কি চায়? বিভূতিভূষণের মুখের কথা তখন জড়িয়ে আসছে। কিন্তু জ্ঞান অটুট। তিনি অস্পষ্ট স্বরে কল্যাণী দেবীকে বাবলুর কাছে যাওয়ার জন্য বললেন। কল্যাণী দেবী বাবলুকে শান্ত করে কোলে করে নিয়ে এলেন। সে ঘরে তখন অপরিচিত পরিমণ্ডল। বাবলু হকচকিয়ে বাবার মুখের দিকে তাকাল। বিভূতিভূষণ কল্যাণী দেবীর কোলে বাবলুর দিকে কিছুক্ষণের জন্য চেয়ে রইলেন। তারপর এক গভীর শান্তির—নিবিড় তৃপ্তির ঘুমে তাঁর চোখ দু'টি মুদে এল।

১৩৫৭ সালের ১৫ই কার্তিক বুধবার, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর সন্ধ্যা আটটা বেজে পনেরো মিনিট।

জীবন দৃষ্টি

প্রকৃতি

১

বাংলার গ্রাম

"মাঠের ঝোপঝাড়গুলো উলুখড়, বনতুলসী, সোঁদাল ও কুলগাছে ভরা। কলমীলতা সারা ঝোপগুলোর মাথায় বড় বড় সবুজ পাতা বিছাইয়া ঢাকিয়া দিয়াছে—ভিতরে স্নিগ্ধ ছায়া, ছোট গোয়ালে, নাটাকাঁটা ও নীল অপরাজিতা ফুল সূর্যের আলোর দিকে মুখ উঁচু করিয়া ফুটিয়া আছে, পড়ন্ত বেলার ছায়ায় স্নিগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা, পাখীর ডাক, চারিধারে প্রকৃতির মুক্ত হাতে ছড়ানো ঐশ্বর্য, রাজার মত ভাণ্ডার বিলাইয়া দান, কোথাও এতটুকু দারিদ্রের আশ্রয় খুঁজিবার চেষ্টা নাই, মধ্যবিত্তের কার্পণ্য নাই। বেলাশেষের ইন্দ্রজালে মাঠ, নদী, বন মায়াময়।"—পথের পাঁচালী।

প্রথম উপন্যাসেই বিভূতিভূষণ বাংলার প্রকৃতির একটি অনুপম ছবি এঁকে পাঠকদের মন জয় করেছিলেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখার জন্য বহুদূর দেশে যাওয়ার দরকার হয় না, বাংলার গ্রামেই প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য আছে। শুধু দেখার চোখ চাই। নগরের জীবনে অভ্যস্ত আরামের ফলে কল্পনা অসাড় হয়ে যায় কিংবা উৎকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে; বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাতে সুকুমার বৃত্তিগুলো শীর্ণ হয়ে আসে। চড়া রং চড়া সুর ছাড়া আর কিছুই মনে লাগে না। কিংবা শিল্পগহনতা বা নিরতিশয় সূক্ষ্মতার মধ্যে মন আনন্দের সন্ধান করতে চায়—অর্থাৎ প্রাণের রসদ ফুরিয়ে আসে, বুদ্ধির শরণ নিতে হয়।

অবশ্য গ্রামের জীবনেও সকলের কাছে যে প্রকৃতির সৌন্দর্য ধরা পড়ে এমন নয়। নাগরিক জীবনে কল্পনা স্বস্থতা হারায়, গ্রামের জীবনে হয়তো কল্পনার উদ্বোধনই হয় না। যা প্রত্যহ চোখে পড়ে, জীবনের গতানুগতিকতার সঙ্গে যা জড়িত তার সৌন্দর্য আর মাধুর্য

অগোচরে থেকে যায়। পল্লীর প্রকৃতি পল্লীর মানুষকে বেশির ভাগ সময়েই যেন একটি আবেশময় বাতাবরণে অচেতন রেখে দেয়। নগরে বিভিন্ন মানুষের চিন্তার অভিঘাতে কল্পনা উদ্বেজিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে; অবশ্য কল্পনার যথার্থ উদ্বোধন হয় খুব কম মানুষেরই। কিন্তু পল্লীর প্রকৃতির প্রভাব মনের গহনে নিহিত থাকে। নাগরিক দৃষ্টিতে প্রকৃতির মানুষের যে ঋজুতা গ্রাম্য বলে মনে হয়, তার মূলে আছে প্রকৃতির প্রভাব। আত্মগোপনের অভাবিত ক্ষমতা সভ্যতার অযাচিত দান—স্বভাবহনন এই দানের সব্যহস্তের দক্ষিণা। নিসর্গপ্রকৃতি এই দান গ্রহণে মানুষকে পরাঙ্মুখ করে তোলে। যেখানে প্রাণের প্রকাশ সংকীর্ণ, সেখানে মানুষের মন বুদ্ধির কাছে হাত পাতে; কিন্তু প্রাণরস যেখানে অজস্র, মনও সেখানে সতেজ, স্বতঃস্ফূর্ত,—বৌদ্ধিক সাধনা সেখানে অবান্তর।

পল্লীর প্রতি আকর্ষণ বিভূতিভূষণের সংস্কারগত ছিল। নগরের জীবনের বিচিত্র রূপ তাঁর দৃষ্টিতে ক্ষণিক মোহাবেশ এনেছিল, কিন্তু বাংলার গ্রামই তাঁর হৃদয় হরণ করেছিল। ব্যক্তিগত জীবনে এই জন্যই তিনি নগরের আকর্ষণ পরিহার করে গ্রামে বা মফঃস্বল শহরে জীবন কাটিয়েছেন। বাংলার গ্রাম যে বহুভাবে তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিল তাঁর রচনার মধ্যে তার পরিচয় বহুভাবে পাওয়া যায়। কেবল তাই নয়, প্রকৃতির উন্মুক্ত অঙ্গনে তাঁর প্রতিভা যেন আত্ম-প্রকাশের উপযুক্ত পরিমণ্ডল খুঁজে পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে 'উপল খণ্ড' গল্পসংকলনের 'শাবলতলার মাঠ' গল্পের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এই গল্পে বাল্যস্মৃতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উমাচরণ মাস্টারের ছবি আঁকা হয়েছে। নিতান্ত দরিদ্র হলেও তিনি প্রকৃতিপ্রেমিক কবি। শাবলতলার মাঠে প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি সবকিছু ভুলে নিভৃতে কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর দৃষ্টান্ত আর উপদেশ লেখকের চোখ খুলে দিয়েছে। চরিত্রচিত্রণের এই গল্পটি কল্পনামূলক হতে পারে, কিন্তু এতে বিভূতিভূষণের যে

চিন্তাটি ফুটে উঠেছে তা একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব। প্রকৃতি, বিশেষ করে বাংলার পল্লীর প্রকৃতি তাঁর কল্পনার লালয়িত্রী, সৃষ্টির বিশিষ্ট উপাদানের কারণ তো বটেই।

বাংলার প্রকৃতির আকর্ষণ বিশুদ্ধ সৌন্দর্যপ্রেম নয়। প্রকৃতির রূপগত রমণীয়তাই যে তাঁকে মুগ্ধ করেছিল এমন নয়। এই আকর্ষণের মূলে অনেকখানি আছে স্মৃতির পিছুটান—'সোনার তরী'র কবির মতো জননান্তর সৌহৃদের অনুভূতি না হলেও এই জন্মের অতীত স্মৃতির সঙ্গে তাঁর অন্তর নিবিড় হয়ে জড়িয়ে আছে। 'পথের পাঁচালী'র শেষ দিকে অপুর কল্পনায় এই টানের পরিচয় মেলে।—

"সে জানে নিশ্চিন্দিপুর তাহাকে দিনে-রাতে সব সময় ডাকে, শাঁখারী পুকুর ডাক দেয়, বাঁশবনটা ডাক দেয়, সোনা ডাঙার মাঠ ডাক দেয়, কদমতলার সায়েবের ঘাট ডাক দেয়, দেবী বিশালাক্ষী ডাক দেন।

পোড়া ভিটার মিষ্টি নেবুফুলের গন্ধে সজনেতলার ছায়ায় আবার কবে গতিবিধি? আবার কবে তাহাদের বাড়ীর ধারের শিরীষ সোঁদালি বনে পাখীর ডাক?

এতদিন তাহাদের সেখানে ইছামতীতে বর্ষার ঢল নামিয়াছে। ঘাটের পথে শিমুলতলায় জল উঠিতেছে। ঝোপে ঝোপে নাটাকাঁটা, বককলমীর ফুল ধরিয়াছে। বন-অপরাজিতার ফুলে বনের মাথা ছাওয়া।"

বাংলার প্রকৃতিকে তিনি যে ভালোবেসেছিলেন, তার মূলে ছিল তাঁর বালক বয়সের ছবি। যে অঞ্চলে তাঁর প্রথম জীবন কেটেছে তার ছবি তাঁর বেশির ভাগ রচনায় ফুটে উঠেছে। একালের অনেক লেখকের মতো তাঁর কাহিনী কলকাতাকেন্দ্রিক বা কাল্পনিক পরিবেশে জল্পিত নয়, চব্বিশ পরগণার উত্তরাংশ, নদীয়া আর যশোহরের কিছু অংশ—প্রধানত এই নিয়ে বিভূতিভূষণের কল্পনার জগৎ গড়ে উঠেছে। যদিও তাঁর কল্পনা ভূগোলের এই নির্দিষ্ট সীমার

মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, তবুও এই ভূখণ্ডে যে প্রকৃতি নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছে তা ক্ষীরদাত্রীর মতো বিভূতিভূষণের কল্পনাকে লালন করেছে। এইখানেই তাঁর কল্পনাদৃষ্টির প্রথম উন্মেষ হয়েছে, তিনি সারা হৃদয় দিয়ে এই অংশকে ভালোবেসেছিলেন। কয়েকটি উদ্ধৃতি—

(ক) "গভীর রাত্রি পর্যন্ত বড়বাসার ছাদে বসে মেঘলা রাতে কত কথা মনে আসে—আবার যদি জন্মই হয় তবে যেন ঐ রকম দীনহীনের পর্ণকুটিরে অভাব অনটনের মধ্যে, পল্লীর স্বচ্ছতায় গ্রাম্য নদী গাছপালা নিবিড় মাটির গন্ধ অপূর্ব সন্ধ্যা মোহভরা দুপুরের মধ্যেই হয়।"—স্মৃতির রেখা, ৯ই আগস্ট, ১৯২৭।

(খ) "পরদিন বড়বাসার ছাদে বসে বসে সন্ধ্যাবেলা ভাবছিলাম অনেক কথা। জীবনে কত ভাল জিনিস পেয়েছি সে কথা—আগাগোড়া ভেবে দেখলাম। কি গ্রামেই জন্মেছিলাম! এই তো আরা জেলা ছাপরা জেলা ঘুরে এলাম। কোথায় সেই পরিপূর্ণ, সুন্দর, স্নিগ্ধ শ্যামলতা, সেই বাঁশবন, ঝোপঝাপ। বড় ভালবাসি তাদের, বড় ভালবাসি, বড় ভালবাসি। কেউ জানে না কত ভালবাসি আমি আমার গ্রামকে—আমার ইছামতী নদীকে, আমার বাঁশবন, শেওলা ঝোপ, কোঁদালী ফুল, ছাতিম ফুল, বাবলা বনকে। সে ছায়া সে স্নিগ্ধ স্নেহ আমার গ্রামের, সে সব অপরাহ্ন—আমার জীবনের চিরসম্পদ হয়ে আছে যে।...তারাই যে আমার ঐশ্বর্য। অন্য ঐশ্বর্যকে তাদের কাছে যে তৃণের মত গণ্য করি।"—তদেব, ১৮ই নভেম্বর, ১৯২৭।

(গ) "আমারও মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে তখন যশোর জেলার এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামটির জন্যে। যত দেশবিদেশেই বেড়াই, যত পাহাড়-জঙ্গলের অপূর্ব দৃশ্যই দেখি না কেন, বাল্যের লীলাভূমি সেই ইছামতীর তীরে যেমন মনকে দোলা দেয় এমন কোথাও পেলাম না আর।

চোখ জুড়িয়ে গেল বাংলার এই বনঝোপের কোমল শ্যামলতায়, তৃণভূমির সবুজত্বে, পাখীর অজস্র কলরোলে। সিংভূমের রুক্ষ, অনুর্বর বৃক্ষবিরল মরুদেশে এতকাল কাটিয়ে যেখানে একটা সবুজ

গাছের জন্যে মনটা খাঁ খাঁ করে উঠতো, মনে আছে কাশিদার সেই বাঁধের ধারে খানিকটা সবুজ ঘাস দেখে ও সেদিন রাজবাড়ী যাবার পথে একজনদের বাড়ী একটা ঝাঁকড়া পত্রবহুল বৃক্ষ দেখে অবাক হয়ে চেয়েছিলাম—সেই সব প্রস্তরময় ধূলির অঞ্চল থেকে এসে এই পাখীর ডাক, এই গাছপালার প্রাচুর্য কি সুন্দর লাগছে! যেন নতুন কোন দেশে এসে পড়েছি হঠাৎ, বাল্যের সেই মায়াময় বনভূমি আমার চোখের সামনে নতুন হয়ে ফিরে এসেছে, সব হয়ে উঠেছে আজ আনন্দ-তীর্থের পুণ্য বাতাস-স্পর্শে আনন্দময়, নতুন চোখে সব আবার দেখছি নতুন করে। আজ ওবেলা ইছামতীতে নাইতে নেমে সে কি আনন্দ! ওপারের সেই সাঁইবাবলা গাছটা, আর বছর আমি আর কল্যাণী নাইতে নেমে যে গাছটার ডালপালার মধ্যে আটকে পড়া অস্ত সূর্যের রাঙা রোদের অপূর্ব শ্রী মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখতাম—সে গাছটা তেমনই আছে।"—হে অরণ্য কথা কও।

..................................২..................................

অনুভব

শৈশবে, কৈশোরে বিভূতিভূষণের অন্তরে প্রকৃতির যে প্রেম জেগে উঠেছে সেই প্রেমই তাঁকে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে ভালোবাসতে প্রেরণা দিয়েছে। প্রকৃতির যে বিচিত্র রূপ আছে তা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। শিশু যে ভাবে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চেয়ে থাকে, তিনি সেই ভাবেই প্রকৃতির দিকে চেয়েছেন। অবশ্য শিশুর মুগ্ধতার মতো তাঁর মুগ্ধতা একেবারে অচেতন নয়—তিনি এই বিমুগ্ধতা বা আনন্দ সম্পর্কে অনবহিত নন, এই আনন্দের অনুভূতি তাঁর সমগ্র সত্তায় যেন মিশে আছে। অপুর একটি ভাবনা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।—

"এই সন্ধ্যা, এই শ্যামলতা, এই মুক্ত প্রসারের দর্শনে যে অমৃত

মাখানো আছে, সে মুখে তাহা কাহাকে বলিবে?......কে তাহার এ চোখ ফুটাইল, কে সাঁঝ-সকালের, সূর্যাস্তের, নীল বনানীর শ্যামলতার মায়াকাজল তাহার চোখে মাখাইয়া দিল? দূর বিসর্পিত চক্রবালরেখা দিগন্তের যতটুকু ঘিরিয়াছে, তাহারই কোন অংশে, বহুদূরে, নেমির শ্যামলতা অনতিস্পষ্ট সান্ধ্য দিগন্তে বিলীন, কোন কোন অংশে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা যাওয়া বনরেখায় পরিস্ফুট, কোন দিকে সাদা সাদা বকের দল আকাশের নীল পটে ডানা মেলিয়া দূর হইতে দূরে চলিয়াছে......মন কোথাও বাধে না। অবাধ, উদার দৃষ্টি, পরিচয়ের গণ্ডি পার হইয়া যাইয়া অদৃশ্য অজানার উদ্দেশে ভাসিয়া চলে।...

তাহার মনে হইল সত্য, সত্য, সত্য—এই শান্ত নির্জন অরণ্যভূমিতে বনের ডালপালার আলোছায়ার মধ্যে পুষ্পিত কোবিদারের সুগন্ধে দিনের পর দিন ধরিয়া এক একটি নবজগতের জন্ম হয়—ঐ দূর ছায়াপথের মত তাহা ছায়াবিসর্পিত, ঐটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়—তাহাকে ধরা যায় না অথচ এই সব নীরব জীবন মুহূর্তে অনন্ত দিগন্তের দিকে বিস্তৃত—তাহার রহস্যময় প্রসার মনে মনে বেশ অনুভব করা যায়। এই এক বৎসরের মধ্যে মাঝে মাঝে সে তাহা অনুভব করিয়াছেও—এই অদৃশ্য জগৎটার মোহস্পর্শ মাঝে মাঝে বৈশাখী শালমঞ্জরীর উন্মাদ সুবাসে, সন্ধ্যাধূসর অনতিস্পষ্ট গিরিমালার সীমারেখায়, নেকড়ে বাঘের ডাকে ভরা জ্যোৎস্নাস্নাত শুভ্র জনহীন অরণ্যভূমির গাম্ভীর্যে, অগণিত তারাখচিত নিঃসীম শূন্যের ছবিতে।”
—অপরাজিত।

প্রকৃতির মোহময় আকর্ষণ ‘পথের পাঁচালী’ ‘অপরাজিত’ উপন্যাস-যুগ্মকের বাতাবরণ। বিভূতিভূষণ এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুভব করতে চেয়েছেন। অপুর বিশ্বতোমুখ কল্পনার মূলে আছে প্রকৃতির প্রেম। রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতা থেকে বিশ্বদেবতায় পৌঁছেছেন। অপুর আদিতে বাংলার প্রকৃতি, মধ্যে ভারত প্রকৃতি, অন্তে বিশ্ব-

প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ। এই অনুরাগ একটি গভীর অনুভূতি বা জিজ্ঞাসার অভিমুখী হয়েছে। 'অপরাজিত' উপন্যাসে বিভূতিভূষণের একটি উক্তি—

"এই পৃথিবীর একটি আধ্যাত্মিক রূপ আছে, ফুলফল, আলো-ছায়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার দরুন এর এবং শৈশব হইতে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার দরুন এর প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না। এ আমাদের দর্শন ও শ্রবণগ্রাহ্য জিনিসে গড়া হলেও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি রেণু যে অসীম জটিলতায় আচ্ছন্ন—যা কি না মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত, এ সত্যটা হঠাৎ চোখে পড়ে না।"

বাংলা দেশে প্রকৃতির রূপ দেখে বিভূতিভূষণের অন্তরে যে প্রকৃতি প্রেমের উদ্বোধ হয়েছে, বিহার-মধ্যপ্রদেশের অরণ্য দর্শনে সেই প্রেম একটি গভীর অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে। 'অপরাজিত' উপন্যাসে তার আভাস আছে, 'আরণ্যক' উপন্যাসের মধ্যে ঐ অনুভূতির গাঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। বীরভূমের প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত উষর রূক্ষ রূপ বিভূতিভূষণের সুপরিচিত ছিল না—নদীলালিত গ্রামপ্রকৃতির মধ্যেই তিনি আজন্ম পালিত হয়েছিলেন। সুতরাং প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত কোমল কান্ত রূপই তিনি হৃদয় ভরে উপভোগ করতে পেরেছিলেন। যখন প্রকৃতির রুদ্র রূপ তাঁর চোখে পড়েছে তখন তিনি তাকে উপেক্ষা করেন নি, বরং একটি নতুন অনুভূতির আনন্দ তাঁকে অভিভূত করেছে। 'আরণ্যক' উপন্যাসের প্রথম দিকের একাংশ—

"আজন্ম বাংলাদেশের দুপুর দেখিয়াছি—কিন্তু এ রুদ্র মূর্তি তাহার নাই। এ ভীমভৈরব রূপ আমাকে মুগ্ধ করিল। সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখিলাম একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড—ক্যালসিয়াম পুড়িতেছে, হাইড্রোজেন পুড়িতেছে, লোহা পুড়িতেছে, নিকেল পুড়িতেছে, কোবাল্ট পুড়িতেছে—জানা অজানা শত শত রকমের গ্যাস ও ধাতু এক কোটি যোজন ব্যাসযুক্ত দীপ্ত ফার্ণেসে একসঙ্গে পুড়িতেছে—

তারই ধূ ধূ আগুনের ঢেউ অসীম শূন্যের ঈথারের স্তর ভেদ করিয়া ফুলকিয়া বইহার ও লোধাইটোলার তৃণভূমিতে ও বিস্তীর্ণ অরণ্যে আসিয়া লাগিয়া প্রতি তৃণপত্রের-শিরা উপশিরার সব রসটুকু ঝামা করিয়া, দিগ্ দিগন্ত ঝলসাইয়া পুড়াইয়া শুরু করিয়াছে ধ্বংসের এক তাণ্ডবলীলা। চাহিয়া দেখিলাম দূরে দূরে প্রান্তরের সর্বত্র কম্পমান তাপতরঙ্গ ও তাহার ওপারে তাপজনিত একটি অস্পষ্ট কুয়াশা। গ্রীষ্ম দুপুরে কখনও এখানে আকাশ নীল দেখিলাম না—তাম্রাভ, কটা—শূন্য, একটি চিল-শকুনিও নাই—পাখীর দল দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কি অদ্ভুত সৌন্দর্য ফুটিয়াছে এই দুপুরের। খর উত্তাপকে অগ্রাহ্য করিয়া সেই হরীতকীতলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম কতক্ষণ—সাহারা দেখি নাই, সেভেন হেডিনের বিখ্যাত টাকলা মাকাল মরুভূমি দেখি নাই—কিন্তু এখানে মধ্যাহ্নের এই রুদ্র ভৈরব রূপের মধ্যে সে সব স্থানের অস্পষ্ট আভাস ফুটিয়া উঠিল।"

এই দৃশ্যের পাশাপাশি প্রকৃতির মোহন রূপের একটি ছোট্ট ছবি বিভূতিভূষণের শেষ বয়সে লেখা একটি ছোটো গল্প থেকে চয়ন করা যেতে পারে।—

"কি অপূর্ব শোভা চারিদিকে। কমব্রিটাস-লতার সাদা পাতার গুচ্ছ বড় বড় শালগাছের মাথায় এমনভাবে সাজানো, যেন দূর থেকে মনে হয় ওরা প্রাচীন শালতরুর পুষ্পস্তবক। পাহাড়ের পিছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, নিঃশব্দে বনভূমিতে দূরে দূরে রহস্যময় অন্ধকার নেমেছে। বনের মধ্যে ধনেশ পাখী কু-স্বরে ডাকছে, বড় সম্বর হরিণের রব শোনা গেল একবার মাত্র। কি নির্জন চারিধার···মুক্তরূপা ধরিত্রীর জ্যোৎস্না, সূর্যাস্ত ও অরুণোদয় এখানে এক একটি কাব্য। শুধুই সবুজ বন-শীর্ষ, শুধুই ধূসরবর্ণ পাথরের তৈরী শিখরদেশ, অস্ত দিগন্তের ছোঁয়া···"—জাল, কুশল পাহাড়ী।

প্রকৃতির এই দুই রূপের মধ্যেই বিভূতিভূষণ আনন্দ পেয়েছেন। কেবল দুই রূপ কেন, প্রকৃতির যে কোন রূপই তাঁকে আনন্দ

দিয়েছে। এই আনন্দ রূপদর্শীর আনন্দ নয়, এটির মূলে আছে গভীর রহস্যের অনুভূতি। ইংরেজ রোমান্টিক কবিরা সৌন্দর্য দেখে মানস উদ্বেলতার কথা বলেছেন। প্রকৃতিদর্শনে বিভূতিভূষণের অনুভূতি ঠিক সেইরকম না হলেও তার সগোত্র। ইংরেজ রোমান্টিক কবিরা প্রকৃতিকে মানুষের জীবন থেকে স্বতন্ত্র করে দেখেছেন। বিভূতিভূষণ অনুভব করেছেন যে, বিষয়গতপ্রাণ মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে; কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের গভীর যোগ যে আছে তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। যেখানেই তিনি প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন সেখানেই এই সংযোগের অনুভূতি তাঁর অন্তরে স্থান পেয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে হৃদয়গত সংযোগ তাঁকে মহত্তর বৃহত্তর ভাবনার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির রূপ যেখানে মনোহর সেখানে তাঁর মুগ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির রূপের মধ্যে যেখানে বিরাট প্রসার বা গহনতা আছে, সেখানে বিভূতিভূষণের অন্তর যেন মুগ্ধতা অতিক্রম করে গভীরতর অনুভূতির অধিকারী হয়েছে। 'আরণ্যক' উপন্যাসের একটি অংশ উদ্ধার করে তাঁর অন্তরের এই প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।—

"রাত্রি গভীর, একা প্রান্তর বহিয়া আসিতেছি। জ্যোৎস্না অস্ত গিয়াছে। কোনোদিকে আলো দেখা যায় না, এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা —এ যেন পৃথিবী হইতে জনহীন কোন অজানা গ্রহলোকে নির্বাসিত হইয়াছি—দিগন্তরেখায় জ্বলজ্বলে বৃশ্চিক রাশি উদিত হইতেছে, মাথার উপরে অন্ধকার আকাশে অগণিত দ্যুতিলোক, নিম্নে লবটুলিয়া বইহারের নিস্তব্ধ অরণ্য, ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে পাতলা অন্ধকারে বনঝাউয়ের শীর্ষ দেখা যাইতেছে—দূরে কোথায় শিয়ালের দল প্রহর ঘোষণা করিল—আরও দূরে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা অন্ধকারে দীর্ঘ কালো পাহাড়ের মত দেখাইতেছে—অন্য কোন শব্দ নাই কেবল এক ধরনের পতঙ্গের একটানা কির্-র্-র্ শব্দ ছাড়া, কান পাতিয়া ভাল করিয়া ঐ শব্দের সঙ্গে মিশানো আরও

হু' তিনটি পতঙ্গের আওয়াজ শোনা যাইবে। কি অদ্ভুত রোমান্স এই মুক্ত জীবনে, প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ নিবিড় পরিচয়ের সে কি আনন্দ! সকলের উপর কি একটা অনির্দেশ্য, অব্যক্ত রহস্য মাখানো—কি সে রহস্য জানি না—কিন্তু বেশ জানি সেখান হইতে চলিয়া আসিবার পরে আর কখনো কোথাও সে রহস্যের ভাব মনে আসে নাই।

যেন এই নিস্তব্ধ, নির্জন রাত্রে দেবতারা নক্ষত্ররাজির মধ্যে সৃষ্টির কল্পনায় বিভোর, যে কল্পনায় দূর ভবিষ্যতে নব নব বিশ্বের আবির্ভাব, নব সৌন্দর্যের জন্ম, নব নব প্রাণের বিকাশ বীজরূপে নিহিত। শুধু যে আত্মা নিরলস অবকাশ যাপন করে জঙ্গলের আকুল পিপাসায়, যার প্রাণ বিশ্বের বিরাটত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের সম্বন্ধে সচেতন আনন্দে উল্লসিত—জন্ম-জন্মান্তরের পথ বাহিয়া দূর যাত্রার আশায় যার ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বর্তমানের দুঃখ, শোক বিন্দুবৎ মিলাইয়া গিয়াছে—সেই তাঁদের সে রহস্যরূপ দেখিতে পায়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

প্রকৃতি বিভূতিভূষণের অন্তরে যে মোহময় আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে তার স্বরূপ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা গভীর অনুভূতিই তাঁকে যেন মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। শিশুকাল থেকে প্রকৃতির কোলে থাকবার ফলে প্রকৃতির মাধুর্যের বোধ যেন তাঁর সহজাত একটা সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। মধ্য যৌবনে ডায়েরিতে তিনি লিখেছেন,—

"প্রকৃতি থেকে আনন্দ সংগ্রহ করবার মতো মনের অবস্থা তৈরী হয়ে যদি যায় তবে যে কোনো জায়গায় বসে দুটো গাছপালা, একটু-খানি সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ, দুটো বন্য পাখীর কলকাকলী, বনফুলের শোভাতেই পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করা যায়।"—উর্মিমুখর।

প্রকৃতি শব্দটির এক অর্থ নিসর্গ, আর এক অর্থ স্বভাব। নিসর্গ-প্রকৃতি শহরের বাইরের মানুষকে স্বভাবের মতোই বেষ্টন করে আছে। শহরে যার জীবন কেটেছে তার পক্ষে অরণ্যপ্রকৃতির নিবিড়

পরিবেশে নির্জন প্রদেশে দিন কাটানো প্রথমে দুঃসহ বলে মনে হতে পারে বটে, কিন্তু ক্রমে যখন নিসর্গপ্রকৃতির সৌন্দর্যের আকর্ষণ স্বভাবগত হয়ে পড়ে তখন শহরের মুখর জীবনের টান কমে আসে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে যাওয়াই তখন জীবনের চরম কাম্য বলে মনে হয়। আরণ্যক থেকে একটি উদ্ধৃতি—

"এই মুক্ত জ্যোৎস্নাশুভ্র বনপ্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে ভাবিতেছিলাম এ এক আলাদা জীবন, যারা ঘরের দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে ভাল বাসে না, সংসার করা যাদের রক্তে নাই, সেই সব বারমুখো, খাপছাড়া প্রকৃতির মানুষের পক্ষে এমন জীবনই ত কাম্য। কলিকাতা হইতে প্রথম আসিয়া এখানকার এই ভীষণ নির্জনতা ও সম্পূর্ণ বন্য জীবনযাত্রা কি অসহ্য হইয়াছিল, কিন্তু এখন আমার মনে হয় এই ভাল, এই বর্বর রুক্ষ বন্যপ্রকৃতি আমাকে তার স্বাধীনতা ও মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, শহরের খাঁচার মধ্যে আর দাঁড়ে বসিয়া থাকিতে পারিব কি? এই পথহীন প্রান্তরের শিলাখণ্ড ও শাল-পলাশের বনের মধ্য দিয়া এই রকম মুক্ত আকাশ-তলে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় হু হু ঘোড়া ছুটাইয়া চলার আনন্দের সহিত আমি দুনিয়ার কোন সম্পদ বিনিময় করিতে চাই না।"

..............................৩..............................

চেতনা

বিয়ের কিছু কাল আগে বিভূতিভূষণ ভাবী পত্নী রমাদেবীকে একটি পত্রে লিখেছিলেন,—

'ও আমার ভালো লাগে না, হৈ হৈ করে বেড়ানো। চিরজীবন-টাই তো হৈ হৈ করেই কাটিয়ে দিলাম। ইচ্ছে করে নিভৃত নিরিবিলি কোথাও দুদিন বিশ্রাম করি, অলস শরতের দুপুরে দূরশ্রুত ঘুঘুর উদাস

ছু’ তিনটি পতঙ্গের আওয়াজ শোনা যাইবে। কি অদ্ভুত রোমান্স এই মুক্ত জীবনে, প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ নিবিড় পরিচয়ের সে কি আনন্দ! সকলের উপর কি একটা অনির্দেশ্য, অব্যক্ত রহস্য মাথানো—কি সে রহস্য জানি না—কিন্তু বেশ জানি সেখান হইতে চলিয়া আসিবার পরে আর কখনো কোথাও সে রহস্যের ভাব মনে আসে নাই।

যেন এই নিস্তব্ধ, নির্জন রাত্রে দেবতারা নক্ষত্ররাজির মধ্যে সৃষ্টির কল্পনায় বিভোর, যে কল্পনায় দূর ভবিষ্যতে নব নব বিশ্বের আবির্ভাব, নব সৌন্দর্যের জন্ম, নব নব প্রাণের বিকাশ বীজরূপে নিহিত। শুধু যে আত্মা নিরলস অবকাশ যাপন করে জঙ্গলের আকুল পিপাসায়, যার প্রাণ বিশ্বের বিরাটত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের সম্বন্ধে সচেতন আনন্দে উল্লসিত—জন্ম-জন্মান্তরের পথ বাহিয়া দূর যাত্রার আশায় যার ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বর্তমানের দুঃখ, শোক বিন্দুবৎ মিলাইয়া গিয়াছে—সেই তাঁদের সে রহস্যরূপ দেখিতে পায়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।”

প্রকৃতি বিভূতিভূষণের অন্তরে যে মোহময় আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে তার স্বরূপ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা গভীর অনুভূতিই তাঁকে যেন মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। শিশুকাল থেকে প্রকৃতির কোলে থাকবার ফলে প্রকৃতির মাধুর্যের বোধ যেন তাঁর সহজাত একটা সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। মধ্য যৌবনে ডায়েরিতে তিনি লিখেছেন,—

“প্রকৃতি থেকে আনন্দ সংগ্রহ করবার মতো মনের অবস্থা তৈরী হয়ে যদি যায় তবে যে কোনো জায়গায় বসে দুটো গাছপালা, একটু-খানি সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ, দুটো বন্য পাখীর কলকাকলী, বনফুলের শোভাতেই পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করা যায়।”—উর্মিমুখর।

প্রকৃতি শব্দটির এক অর্থ নিসর্গ, আর এক অর্থ স্বভাব। নিসর্গ-প্রকৃতি শহরের বাইরের মানুষকে স্বভাবের মতোই বেষ্টন করে আছে। শহরে যার জীবন কেটেছে তার পক্ষে অরণ্যপ্রকৃতির নিবিড়

পরিবেশে নির্জন প্রদেশে দিন কাটানো প্রথমে দুঃসহ বলে মনে হতে পারে বটে, কিন্তু ক্রমে যখন নিসর্গপ্রকৃতির সৌন্দর্যের আকর্ষণ স্বভাবগত হয়ে পড়ে তখন শহরের মুখর জীবনের টান কমে আসে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে যাওয়াই তখন জীবনের চরম কাম্য বলে মনে হয়। আরণ্যক থেকে একটি উদ্ধৃতি—

"এই মুক্ত জ্যোৎস্নাশুভ্র বনপ্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে ভাবিতেছিলাম এ এক আলাদা জীবন, যারা ঘরের দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে ভাল বাসে না, সংসার করা যাদের রক্তে নাই, সেই সব বারমুখো, খাপছাড়া প্রকৃতির মানুষের পক্ষে এমন জীবনই ত কাম্য। কলিকাতা হইতে প্রথম আসিয়া এখানকার এই ভীষণ নির্জনতা ও সম্পূর্ণ বন্য জীবনযাত্রা কি অসহ্য হইয়াছিল, কিন্তু এখন আমার মনে হয় এই ভাল, এই বর্বর রুক্ষ বন্যপ্রকৃতি আমাকে তার স্বাধীনতা ও মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, শহরের খাঁচার মধ্যে আর দাঁড়ে বসিয়া থাকিতে পারিব কি? এই পথহীন প্রান্তরের শিলাখণ্ড ও শাল-পলাশের বনের মধ্য দিয়া এই রকম মুক্ত আকাশ-তলে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় হু হু ঘোড়া ছুটাইয়া চলার আনন্দের সহিত আমি দুনিয়ার কোন সম্পদ বিনিময় করিতে চাই না।"

..................................৩..................................

চেতনা

বিয়ের কিছু কাল আগে বিভূতিভূষণ ভাবী পত্নী রমাদেবীকে একটি পত্রে লিখেছিলেন,—

'ও আমার ভালো লাগে না, হৈ হৈ করে বেড়ানো। চিরজীবন-টাই তো হৈ হৈ করেই কাটিয়ে দিলাম। ইচ্ছে করে নিভৃত নিরিবিলি কোথাও দুদিন বিশ্রাম করি, অলস শরতের দুপুরে দূরশ্রুত ঘুঘুর উদাস

সঙ্গীত শুনে জীবনস্বপ্নে বিভোর থাকি, জ্যোৎস্না রাত্রে ছাদে শুয়ে বিরাট তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে আপন মনে কত কথা ভাবি—

প্রকৃতির কোলে শুয়ে সৌন্দর্যে ভাসায়ে আঁখি
সাধ যায় দিবানিশি অনিমেষে চেয়ে থাকি।
নিঝুম নীরবে সেথা কি যেন চোখের পরে
উছল জোছনা সম নিয়ত ঝরিয়া পড়ে।
পরমাণু নিভে যায় ভাঙিয়া জড়ের কারা,
কে তুমি ডাকিছ মোরে করিয়া পাগল পারা।

তবে এ সাধই। সাধ হলে কি হবে, তা হবার নয় তাও জানি। জীবনের জটিল কর্মভার থেকে আমার মুক্তি নেই কোনদিন।” —আমার লেখা

রমা দেবীকে লেখা আর একটি পত্রের অংশ—

“মনের অবকাশ মানুষের জীবনে যে কত দরকারি জিনিস তা এই কর্মব্যস্ত, যন্ত্রযুগের অত্যন্ত হিসেবী ও সময়নিষ্ঠ মানুষেরা কি করে বুঝবে? এতে মানুষকে টাকা রোজগার করায়, ভাল খাওয়ায়, ভাল পরায়, ভাল গাড়ীঘোড়া চড়ায়—কিন্তু জীবনকে মরুভূমি করে রেখে দেয়। প্রকৃতির শ্যামল বনপত্র সম্ভার, নীল আকাশ, পাখীর কূজন, নদীর বনমর্মর, অস্ত দিগন্তের সান্ধ্য মায়া এ সব থেকে বহু দূরে এক জলহীন বৃক্ষলতাহীন মরু।”—তদেব।

এই দুটি উদ্ধৃতি বা বিভূতিভূষণের লেখার অপর কোন অংশ থেকে প্রকৃতির প্রতি তাঁর আন্তরিক আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যাবে। এই সব অংশ আর একজন প্রকৃতিপাগল বাঙালী কবির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—তিনি বিহারীলাল চক্রবর্তী। বিহারীলালের ভাবপ্রকাশের বাহন কবিতা—সেজন্য তাঁর রচনায় জীবনের কোলাহলের প্রতি বিরূপতা আর প্রকৃতির মধ্যে ডুবে যাওয়ার ব্যাকুলতা দুই-ই খুব তীব্র। কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণের রচনায় সেই তীব্রতা নেই বটে, কিন্তু তাঁর রচনায় আবেগের প্রবলতা সহজেই অনুভব করা যায়।

এই আবেগের একটা বড়ো কারণ যে তাঁর অনন্যলব্ধ অনুভূতি তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু এই অনুভূতি তাঁর প্রকৃতি-প্রেমের কারণ নয়। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে যাওয়ার আনন্দই তাঁর একমাত্র কামনা ছিল না। প্রকৃতির মধ্য থেকে একটা গভীর-তর সত্যের উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে ছিল। শক্তি সাধনা করলেও শক্তিলাভই যেমন তান্ত্রিকের চরম লক্ষ্য নয়, তেমনি প্রকৃতির কাছে বার বার ছুটে যেতে চাইলেও প্রকৃতিকেই তিনি চরম পাওয়া বলে মনে করেন নি। আরণ্যক ঋষি যেমন বনস্পতি ওষধির মধ্যে একটি মহত্তর সত্যকে ওতপ্রোত অনুভব করেছিলেন, বিভূতি-ভূষণও তেমনই প্রকৃতির রূপের মধ্যে গভীর সত্যের সন্ধান করেছেন। প্রকৃতি সিদ্ধি নয়, প্রকৃতি উত্তরসাধিকা। প্রকৃতির অকৃত্রিম অনুরাগী এক মহৎ সম্পদের অধিকারী হয়।

"প্রকৃতি তাঁর নিজের ভক্তদের যা দেন, তা অতি অমূল্য দান। অনেক দিন ধরিয়া প্রকৃতির সেবা না করিলে কিন্তু সে দান মেলে না। আর কি ঈর্ষার স্বভাব প্রকৃতিরানীর! প্রকৃতিকে যখন চাহিব, তখন প্রকৃতিকে লইয়াই থাকিতে হইবে, অন্য কোন দিকে মন দিয়াছ যদি, অভিমানিনী কিছুতেই তাঁর অবগুণ্ঠন খুলিবেন না; কিন্তু অনন্যমনা হইয়া প্রকৃতিকে লইয়া ডুবিয়া থাকো, তাঁর সর্ববিধ আনন্দের বর, সৌন্দর্যের বর, অপূর্ব শান্তির বর, তোমার উপর অজস্র ধারে এত বর্ষিত হইবে, তুমি দেখিয়া পাগল হইয়া উঠিবে, দিনরাত মোহিনী প্রকৃতিরানী তোমাকে শতরূপে মুগ্ধ করিবেন, নূতন দৃষ্টি জাগ্রত করিয়া তুলিবেন, মনের আয়ু বাড়াইয়া দিবেন, অমরলোকের আভাসে অমরত্বের দ্বারে উপনীত করাইবেন।"—আরণ্যক।

প্রকৃতির কাছ থেকে বিভূতিভূষণ যা পেয়েছেন তাকে সহজ ভাষায় আনন্দ বলা যেতে পারে। এই আনন্দ দৃষ্টি সুখ নয়, আবার ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের tranquile restoration-ও নয়। তত্ত্বোপলব্ধির দিকটা বাদ দিয়ে যদি রসাস্বাদের দিকটা নেওয়া যায়, তাহলে এই আনন্দকে

ঔপনিষদিক আনন্দ বলা যেতে পারে। এই আনন্দের স্বরূপের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন বা দায় বিভূতিভূষণের ছিল না। তিনি কেবল নূতন দৃষ্টি জাগ্রত করা, মনের আয়ু বৃদ্ধি করা বা অমরত্বের আভাস দিয়ে অমরলোকের প্রান্তে উপনীত করার কথা বলেছেন। পরম তত্ত্বের সন্ধানীকে আবৃত্তচক্ষু হতে হয়; প্রকৃতির কাছ থেকে আনন্দ পেতে হলে অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ হতে হবে। অন্তর্দৃষ্টির উন্মোচন না হলে প্রকৃতির যথার্থ সৌন্দর্য চোখে ধরা পড়ে না। তখন মানুষ শহরের মধ্যে আনন্দের নাম করে বহিরঙ্গ সুখের সন্ধান করে, প্রকৃতির সহজ প্রসারের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার কল্পনাও করতে পারে না। শহর থেকে দূরে গিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার নাম করে প্রমোদ কানন স্থাপন করে। ঐ রকম একটি প্রমোদ কাননের উৎসব সম্পর্কে বিভূতিভূষণের মন্তব্য—

"শহরের লোকে বিশ ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে শহরের উপকণ্ঠে—এই ধরনের সাজানো গোছানো বাগানবাড়ী করে মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধব নিয়ে হল্লা করে। এই সব insipid ধরনের outing-এর সংসর্গ আমায় ছাড়তে হবে এবার।"—উর্মিমুখর।

আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি প্রসঙ্গে কঠোপনিষদের উক্তি—

যমেবৈষ বৃণুতেস্তেন লভ্যস্
তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥

প্রকৃতি সম্পর্কেও বিভূতিভূষণ প্রায় সেই কথাই বলেছেন। প্রকৃতি অকৃপণ হাতে দিতে চান, কিন্তু হেলায় ফেলায় তাঁর দান নিতে পারা যায় না। যে প্রকৃতিগত প্রাণ, যে প্রকৃতিকে জীবনে বরণ করতে উৎসুক, তার কাছেই প্রকৃতি আপনার অপরূপা তনু উন্মোচিত করে দেয়। বিভূতিভূষণ প্রকৃতির সেবা করার কথা বলেছেন। এই সেবা সাধনার নামান্তর—আত্মময় দৃষ্টি দিয়েই প্রকৃতির সঙ্গে শুভদৃষ্টি হয়। এই দর্শনে দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গ বা মধ্যস্থতা কেবল অবান্তর নয়, প্রতিকূলও। বিভূতিভূষণের একটি মন্তব্য,—

"প্রকৃতির রাজ্যে মানুষকে যেতে হয় একাকী, তবেই প্রকৃতিরানী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন দর্শকের সামনে, নতুবা নয়। চুপ করে বসে থাকতে হয়, একমনে ভাবতে হয়, মাঝে মাঝে চারিদিকে চেয়ে দেখলে মনে আপনিই কত ভাবনা এসে পড়ে।

সে সব চিন্তার সঙ্গে কখনই পরিচয় ঘটে না লোকালয়ের ভিড়ে।

এমন কি, সঙ্গে কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকলেও প্রকৃতির সৌন্দর্য পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না।"—অভিযাত্রিক।

প্রকৃতির সৌন্দর্যের অনুভূতি, তাকে আনন্দ বা অন্য যে কোনো সংজ্ঞাই দেওয়া হোক না কেন তার স্বরূপ অবেদ্য না হলেও অনির্বচনীয়। ঐ আনন্দের আভাসমাত্র দিয়ে থেমে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় বিভূতিভূষণের ছিল না। প্রকৃতির বোধ তাঁর অনুভূতি থেকে চেতনায় পৌঁছেছে, কিন্তু ঐ বোধেরও পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয়। অন্তর্দৃষ্টি যখন খুলে যায়, তখন প্রকৃতির পরিচিত রূপের মধ্যেই একটা রহস্যগভীর অর্ধপরিচিত সত্তা যেন জেগে ওঠে। স্বজ্ঞায় যে, চেতনা, প্রকৃতির বাইরের রূপের মধ্যে কেবল তার অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এই রকম অবস্থা সম্পর্কে বিভূতিভূষণ বলেছেন,—

"কতবার দেখেছি এমন সব সময়ে যেন মাটির পৃথিবী আর জ্যোতির্লোকের গ্রহতারা এক হয়ে যায়—স্বপ্ন ভেঙে উঠে চাঁদের বাতির তলায় নিদ্রামগ্ন পৃথিবীর রূপ দেখে কতবার অবাক হয়ে গিয়েছি। খানিক চিনি খানিক চিনি না একে।

কি বিরাট ইঙ্গিত সমগ্র ছায়াপথের, পত্রপল্লবের মর্মরধ্বনির, শান্ত জ্যোৎস্নালোকের, ঝিল্লীমুখর নিশীথরাত্রি।

পথের ধারে শুধু ওদের ডাক, বহুদূর ব্যেপে। ঘর থেকে অন্য-রকম শোনাবে, পথ থেকে অন্যরকম।"—অভিযাত্রিক।

প্রকৃতির শান্ত নির্জন পরিমণ্ডল মানুষকে গভীর চিন্তার অবকাশ এনে দেয়। শহরে স্বার্থান্বেষী সুখলোভী মানুষের ভিড়ে মানুষের অন্তশ্চেতনা আত্মপ্রকাশের অবকাশ পায় না। নগরের ক্ষুব্ধ জীবন

থেকে অনেক দূরে গিয়েই মানুষ গভীরভাবে চিন্তা করার অবকাশ পেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মতোই বিভূতিভূষণও আরণ্যক সভ্যতাকেই বৈদিক বা ঔপনিষদিক সভ্যতার প্রসূতি বলেছেন। তিনি যে রবীন্দ্রচিন্তার প্রতিধ্বনিমাত্র করেছেন এমন নয়, তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি তাঁর কল্পনার সহায়ক হয়েছে। গভীর অরণ্যের মধ্যে ভ্রমণের বর্ণনায় তাঁর একটি মন্তব্য,—

"অতিরিক্ত নির্জন স্থান। চেয়ে চেয়ে দেখলুম, একটা লোক কোন দিকে চোখে পড়ে না—শুধু যা আমরাই আছি। ঋষিদের তপোবন এমনি নির্জন জায়গাতে ছিল। ভারতের সভ্যতার জন্মস্থান এই বনানী ; এখানেই বেদ, উপনিষদ, বেদান্তের জন্ম হয়েছিল—হৈ হট্টগোলযুক্ত শহরের বুকে নয়।"—বনে পাহাড়ে।

প্রকৃতি মানুষের কল্পনাকে অন্তর্মুখী হয়ে ওঠবার অবকাশ দেয়। প্রকৃতি যেখানে নির্বাসিতপ্রায় সেখানে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই মানুষের যা কিছু কল্পনা সীমাবদ্ধ থেকে যায়। প্রাত্যহিক জীবনের ছোটখাটো বিষয় প্রবল হয়ে উঠে চিত্তকে সংকুচিত করে ফেলে। কল্পনাশক্তি যদি বিন্দুমাত্র না থাকে, চেতনা যদি অসাড় হয়, তা'হলে নগর আর প্রকৃতি দুই-ই সমান। কিন্তু কল্পনা সজীব হলে প্রকৃতির বিরাট প্রসারে চেতনার বিস্ফার ঘটবেই। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যেন একটি আত্মিক যোগ আছে। এ প্রসঙ্গে 'বনে পাহাড়ে'র আর একটি অংশ মনে পড়ে গেল,—

"আমাদের চারিদিকে অনুচ্চ, রুক্ষ, অনুর্বর অসংখ্য পাহাড়—নানা আকৃতির নানা ধরনের। কোনোটার আকার পিরামিডের মত, কোনোটার বা মন্দিরের মত, কোনোটা নর্মান কাস্‌লের মত, কোনোটা বিরাটকায় শিবলিঙ্গের মত, কোনোটা গম্বুজাকৃতি, কোনোটার রং কালো, কোনোটা মেটেসিঁদুরের মত রাঙা, কোনোটা ধূসর, কোনোটা ঝকঝকে মিছরির মত সাদা কোয়ার্জ পাথরের। প্রত্যাসন্ন শীতের অপরাহ্ণের রাঙা রোদ কোনো কোনোটার মাথায়।

হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে খড়কাই নদীর দিক থেকে। পশ্চিমে বহুদূরে দিকচক্রবালের অনেকটা জুড়ে সুদীর্ঘ বরকেলা পাহাড়শ্রেণী, তারই পেছনে এখন টকটকে রাঙা সূর্যটা অস্ত যাচ্ছে। চারপাশের সেইসব অদ্ভুতদর্শন পাহাড় দেখে মনে হয় আমেরিকার কোনো ছন্নছাড়া মরুভূমির মধ্যে যেন বসে space-এর সমুদ্রে ডুবে আছি, থৈ থৈ space-এর সমুদ্র, কূলকিনারা দেখা যায় না।"

এই বিরাট Space-এর চেতনা প্রকৃতির আনুকূল্যেই বিভূতিভূষণের অন্তরে জেগেছে।

'দেবযান' উপন্যাসে একটি উক্তিতে প্রকৃতি সম্পর্কে বিভূতিভূষণের চরম তত্ত্বচিন্তা প্রকাশিত হয়েছে,—

"প্রকৃতির সৌন্দর্য মায়ার খেলা হোক—তবুও স্বীকার করি, দেখতে জানলে তা দেখেও সৃষ্টিকর্তা হিরণ্যগর্ভের প্রতি মানুষের মন পৌঁছতে পারে। ও-যে একটা সোপান।"

এই হিরণ্যগর্ভ পৌরাণিক ব্রহ্মা নন, ইনি উপনিষদের মহৎ, বৈশ্বানর—ইনি রবীন্দ্রকল্পনার বিশ্বদেবতা।

..................................৪..................................

আদ্যা শক্তি

ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতিপ্রেম প্রসঙ্গে অলডাস হাক্সলি মন্তব্য করেছিলেন যে, প্রকৃতির কেবল মনোহর রূপ দেখেছিলেন বলেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতিকে ভালোবেসেছিলেন। উষ্ণমণ্ডলে প্রকৃতির উগ্ররূপ দেখলে হয়তো ঐ প্রেম উবে যেত। বিভূতিভূষণ সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করার লোভ সংবরণ করা কঠিন। বিভূতিভূষণ প্রধানত বাংলাদেশে আর বিহার বা মধ্যভারতে প্রকৃতির যে রূপ দেখেছিলেন তা সাধারণত ভয়ংকর নয়। সুতরাং প্রকৃতির মনোহর রূপই তিনি

বেশি করে দেখেছেন, সেইজন্য প্রকৃতিপ্রেম তাঁর কল্পনার অবলম্বন হয়েছে—আসলে এই প্রকৃতিপ্রেম অনুকূল পরিবেশে গড়ে ওঠা একটি ভাবাবেশ; এইরকম একটা সিদ্ধান্ত করা অস্বাভাবিক নয়।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতিচিন্তা সম্পর্কে হাক্সলির মন্তব্যে মতভেদের অবকাশ আছে; বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেম সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করা একেবারেই অসঙ্গত। এ কথা সত্য যে, তিনি প্রকৃতির যে অংশে বিচরণ করেছেন সেই অংশে প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত মনোহর রূপই বেশি করে ধরা পড়ে। কিন্তু প্রকৃতির ভয়ংকরী মূর্তি যে তাঁর অজানা ছিল এমন নয়। প্রকৃতির সৌন্দর্যের ব্যাপক পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন; সেই জন্য তাঁর রচনায় প্রকৃতির মাধুর্যটুকুই বেশি ফুটেছে। তাঁর আনন্দপিপাসু কবিমন প্রকৃতির ললিতকান্তি উপভোগ করতে উৎসুক হয়েছে বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃতির রুদ্র রূপকে সচেতন-ভাবে উপেক্ষা করতে বা আড়াল করে রাখতে চাননি। প্রকৃতির সম্পূর্ণ মূর্তি তাঁর ভাবকল্পনায় ছিল। প্রকৃতির লালনী বা পালনী শক্তি তিনি যেমন উপলব্ধি করেছেন, তেমনই প্রকৃতির মারণী শক্তি সম্পর্কেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। মধ্যভারতের গ্রীষ্মের দুপুরের একটি বর্ণনা এর আগে উদ্ধার করা হয়েছে। বাংলাদেশের একটি ঝড়ের বর্ণনার একাংশ স্মরণ করা যেতে পারে,—

"এই হিংস্র অন্ধকার ও ক্রুর ঝটিকাময়ী রজনীর আত্মা যেন প্রলয়দেবের দূতরূপে ভীমভৈরবরূপে সৃষ্টি গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসিতেছে—অন্ধকারে, রাত্রে, গাছপালায়, আকাশে, মাটিতে তাহার গতিবেগ বাধিয়া শব্দ উঠিতেছে—সু-ইশ···সু-উ-উ ইশ···সু-উ-উ-উ-ই-শ···এই শব্দের প্রথমাংশের দিকে বিশ্বগ্রাসী দূতটা যেন পিছু হটিয়া বলসঞ্চয় করিতেছে—সু-উ-উ—এবং শেষের অংশটায় পৃথিবীর উচ্চ-নীচ তাবৎ বায়ুস্তর আলোড়ন, মন্থন করিয়া বায়ুস্তরে বিশাল তুফান তুলিয়া তাহা তাহার সমস্ত আসুরিকতার বলে সর্বজয়াদের জীর্ণ কোঠাটার পিছনে ধাক্কা দিতেছে—ই-ই-শ···। কোঠা দুলিয়া

ছুলিয়া উঠিতেছে…আর থাকে না। ইহার মধ্যে যেন কোন অধীরতা, বিশৃঙ্খলা, ভ্রমভ্রান্তি নাই—যেন দৃঢ়, অভ্যস্ত, প্রণালীবদ্ধ ভাবের কর্তব্যকার্য।…বিশ্বটাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দেওয়ার ভার যে লইয়াছে, যুগে যুগে এ রকম কত হাস্যমুখী সৃষ্টিকে বিধ্বস্ত করিয়া অনন্ত আকাশের অন্ধকারে তারাবাজির মত ছড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে যে মহাশক্তিমান্ ধ্বংসদূত—এ তার অভ্যস্ত কার্য… এতে তার অধীরতা উন্মত্ততা সাজে না…।”—পথের পাঁচালী।

বিভূতিভূষণ প্রকৃতির একমাত্র কোমলকান্ত রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন বা তিনি প্রকৃতির ললিত-মধুর রূপই কেবল নির্বাচন করেছিলেন এ কথা বলা সঙ্গত হবে না। এ কথা সত্য যে, প্রকৃতির হিংস্র মূর্তি তাঁর অতিপরিচিত ছিল না। আফ্রিকার নিবিড় অরণ্যের শ্বাপদসঙ্কুলতা, দুস্তর সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছলতা, ঊষর মরুভূমির প্রাণঘাতী দাহ, উত্তুঙ্গ পর্বতশিখর বা দুর্গম মেরুপ্রদেশের মৃত্যুশীতলতা—এইগুলির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে বা রচনার মধ্যে এইগুলির ভয়াবহতার চিত্রাঙ্কন না করলে যে প্রকৃতির রুদ্রতা সম্পর্কে চেতনার অভাব সূচিত হয়, এ ধারণা সত্য নয়। অঞ্চল-বিশেষের ভীষণতাই কি প্রকৃতির রুদ্রমূর্তির একমাত্র পরিচায়ক? যেখানে প্রকৃতির রূপ অপেক্ষাকৃত শান্ত সেখানেও প্রকৃতির রুদ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। ‘পথের পাঁচালী’ থেকে উদ্ধৃত ঝড়ের বর্ণনায় প্রকৃতির যে প্রলয়ঙ্করী মূর্তির কল্পনা আছে তার মর্মগত সত্যটুকু প্রকৃতির আপাত মনোরম দৃশ্যের মধ্য থেকেও উপলব্ধি করা যেতে পারে। ‘অপরাজিত’র একটি অংশে মৃত্যুরূপা প্রকৃতির কল্পনা অপূর্বভাবে ব্যক্ত হয়েছে,—

“এক জায়গায় বনের ধারে ঝোপের মধ্যে অনেক লতাগাছে গা লুকাইয়া একটা তেলাকুচা গাছ। তেলাকুচা বাংলার ফল—অপরিচিত মহলে একমাত্র পরিচিত বন্ধু, সেখানে দাঁড়াইয়া গাছটাকে দেখিতে বড় ভাল লাগিতেছিল।…তেলাকুচা লতার পাতাগুলো সব শুকাইয়া গিয়াছে, কেবল অগ্রভাগে ঝুলিতেছিল একটা আধপাকা ফল।

তারপর দিনের পর দিন সে ঐ লতার মৃত্যুযন্ত্রণা লক্ষ্য করিয়াছে। ফলটা যতই পাকিয়া উঠিতেছিল, বোঁটার গোড়ায় যে অংশ সবুজ ছিল, সেটুকু যতই রাঙা সিঁদুরের রং হইয়া উঠিতেছে লতাটা ততই দিন দিন হলদে, শীর্ণ হইয়া শুকাইয়া আসিতেছে।

একদিন দেখিল, গাছটা সব শুকাইয়া গিয়াছে, ফলটার বোঁটা শুকাইয়া গাছে ঝুলিতেছে, তুল-তুলে পাকা, সিঁদুরের মত টুকটুকে রাঙা—যে কোন পাখী, বনের বানর কি কাঠবেড়ালীর অতি লোভনীয় আহার্য। লতাটা এতদিন ধরিয়া ন' কোটি মাইল দূরের সূর্য হইতে তাপ সংগ্রহ করিয়া, চারিপাশের বায়ুমণ্ডল হইতে উপাদান লইয়া, মৃত জড়পদার্থ হইতে এ উপাদেয় খাবার তৈয়ারী করিয়াছিল, তাহার জীবনের চরম পরিণতি। ফলটা পাখীতে কাঠবেড়ালীতে খাইবে, এ জন্য গাছটাকে তাহারা ধন্যবাদ দিবে না, তেলাকুচা লতাটা অজ্ঞাত, অখ্যাতই থাকিয়া যাইবে, তবুও তাহার জীবন সার্থক হইয়াছে,—ঐ টুকটুকে ফলে ওর জীবন সার্থক হইয়াছে। যদি ফলটা কেউ নাই খায়, তাহাতেও ক্ষতি নাই, মাটিতে ঝরিয়া পড়িয়া আরও কত তেলাকুচার জন্ম ঘোষণা করিবে, আরও কত লতা, কত ফুল-ফল, কত পাখীর আহার্য।"

এই উদ্ধৃতিটি থেকে বিভূতিভূষণের কল্পনার গভীরতা অনুধাবন করা যেতে পারে। প্রকৃতির বাহ্যরূপে তিনি আনন্দ পেয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতির গভীরে প্রবেশ করে জীবনের রহস্যের সন্ধান করতে তিনি পরাঙ্মুখ হন নি। প্রকৃতি কেবল রূপসী নয়, কেবল ভয়ঙ্করী নয়। তার রুদ্রানী মূর্তি আর দক্ষিণা মূর্তি দুই-ই সত্য, কারণ দুটিই একটি মহত্তর সত্যের সঙ্গে সংযুক্ত। 'যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'—এই বিশ্বের সব কিছুর মধ্যেই প্রাণের প্রবাহ কম্পমান। তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখলে প্রকৃতি ঐ প্রাণের জনয়িত্রী—বিভূতিভূষণের ভাব-দৃষ্টিতে প্রকৃতি ঐ প্রাণের ধারয়িত্রী, লালয়িত্রী। জীবনের মধ্যে প্রাণের এক রূপ, মৃত্যুর মধ্যে সেই প্রাণেরই রূপান্তর। নিসর্গের

মনোহারিণী মূর্তি ঐ মূলা প্রকৃতির একটি প্রকাশ; প্রলয়ংকরী মূর্তিও বৃহত্তর জীবনচেতনায় শংকরী বলে প্রতিভাত হবে। এই দুই মূর্তি মূলত এক।

অবশ্য বিভূতিভূষণ তত্ত্বচিন্তা করেন নি। তিনি হৃদয়ের অকৃত্রিম অনুরাগের শক্তিতে প্রকৃতির অন্তস্তলে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। প্রকৃতি একই কালে তাঁকে মুগ্ধ করেছে আর তাঁর চেতনায় আত্মরহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে। তিনি স্বপ্রকৃতিবশত আবিষ্টতার ছবিই এঁকেছেন, তবে মধ্যে মধ্যে ক্রান্তদর্শী কবির মতো বৃহত্তর অথবা গভীরতর সত্যের আভাস দিয়েছেন।

বাংলার প্রকৃতির উপর বিভূতিভূষণের নাড়ীর টান ছিল সন্দেহ নেই। তিনি বাংলার গ্রামাঞ্চলে ঘুরেছিলেন; বিহার বা মধ্যপ্রদেশের নিবিড় অরণ্যভূমির সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। 'পথের পাঁচালী' থেকে শুরু করে 'ইছামতী' পর্যন্ত অনেক গ্রন্থে বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরের যোগের গভীর ছাপ ফুটে উঠেছে। 'অপরাজিত' 'আরণ্যক' প্রভৃতি উপন্যাসে বা কয়েকটি দিনলিপি বা ভ্রমণকথায় বাংলার বাইরের অরণ্যপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। দুই ক্ষেত্রেই তিনি প্রকৃতিকে জড়রূপে না দেখে সজীব সত্তার মতো অনুভব করেছেন। প্রকৃতিকে যদি নারীর সঙ্গে তুলনা করা যায় তা'হলে বলা যেতে পারে যে, বাংলার প্রকৃতি জননী বা ভগিনীর মতো বিভূতিভূষণের কবিচিত্তকে লালন করেছিল; বাংলার বাইরের নিবিড় অরণ্য-প্রকৃতি মোহিনী নায়িকার মতো তাঁর অন্তরে রহস্যের অনুভব জাগিয়ে তুলেছে। অবশ্য দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও প্রকৃতি অনুকূলা হয়ে প্রাণন-মননকে রসঋদ্ধ করে তুলেছে।

জীবনচর্যা

প্রকৃতিপ্রেম কোনো কোনো সাহিত্যকারের ক্ষেত্রে পলায়নী মনোবৃত্তি। অগভীর পাঠকের কাছে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেম অনুরূপ মনোভাবের পরিচায়ক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি আদৌ জীবন-পলাতক ছিলেন না ;, বরং জীবনের প্রতি তাঁর নিবিড় অনুরাগ ছিল। ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশে-ছিলেন, তাঁরা তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণচাঞ্চল্যের পরিচয় পেয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যের মধ্যেও জীবনপ্রেমের প্রাচুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। —অবশ্য ঐ জীবনের অর্থ প্রবৃত্তির উৎকট প্রকাশ বা বিস্তৃত মানসের প্রতিক্রিয়া নয়—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সমাজতাত্ত্বিক দৃগ্‌ভঙ্গি অনুসারে উপাদানসমাবেশ তো নয়ই। বিভূতিভূষণ জীবনে স্বস্থতার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রকৃতিই ঐ প্রতিষ্ঠার মূল সহায় ছিল সন্দেহ নেই।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেম সম্পর্কে দু'একটি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিভূতিভূষণ পল্লীর প্রকৃতিকে ভালোবাসতেন—পল্লীর সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে সন্দেহ নেই ; কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ রোমান্টিক যুগের ইংরেজ কবির মতো সমাজশিক্ষকের মঞ্চ থেকে প্রকৃতির বুকে ফিরে যাওয়ার কথা বলেন নি। বাংলার পল্লীর জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা মোহমুক্ত। তাঁর শেষতম উপন্যাস 'ইছামতী'র একাংশ উদ্ধার করলে বাংলার পল্লীর জীবন সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণার পরিচয় পাওয়া যাবে,—

"চণ্ডীমণ্ডপ হচ্ছে পল্লীগ্রামের একটি প্রতিষ্ঠান। এইখানেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিষ্কর্মা, ব্রহ্মোত্তর বৃত্তিভোগী, মূর্খ ব্রাহ্মণের

দল জুটে কেবল তামাক পোড়ায় আর দাবা পাশা (তাসের প্রচলন এ সব পাড়াগাঁয়ে আদৌ নেই, ওটা বিলিতি খেলা বলে গণ্য) চলে। প্রত্যেক গৃহস্তের একখানা করে চণ্ডীমণ্ডপ আছে, সকাল থেকে সেখানে আড্ডা বসে। তবে সম্পন্ন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে আড্ডা জোর বসে থাকে, কারণ সারা দিনে অন্তত আধ সের তামাক জোগাবার ক্ষমতা সব গৃহস্থের নেই।...

এরা সারাদিন এখানে বসে শুধু গল্প করে ও পাশা দাবা খেলে। জীবন-সংগ্রাম এদের অজ্ঞাত, ব্রহ্মোত্তর জমিতে বছরের ধান হয়, প্রজাদের কাছ থেকে কিছু খাজনা মেলে, আম-কাঁঠালের বাগান আছে, লাউ-কুমড়োর মাচা আছে, আজ মাছ ধারে কিনে গ্রামের জেলেদের কাছে, দু'মাস পরে দাম দেওয়াই বিধি। সুতরাং ভাবনা কিসের? গ্রাম্য কলু ধারে তেল দিয়ে যায় বাকারির গায়ে দাগ কেটে। সেই বাকারির দাগ গুণে মাসকাবারি দাম শোধ হয়। এত সহজ ও সুলভ যেখানে জীবনযাত্রা, সেখানে অবকাশ যাপনের এই রকম অলস ধারাই লোকে বেছে নিয়েছে। আলস্য ও নৈষ্কর্ম্য থেকে আসে ব্যর্থতা ও পাপ। পল্লীবাংলার জীবনধারার মধ্যে শেওলার দাম আর ঝাঁজি জমে উঠে। জলের স্বচ্ছতা নেই, স্রোতে কলকল্লোল নেই, নেই তার নিজের বক্ষপটে অসীম আকাশের উদার প্রতিচ্ছবি।"

তিনি পল্লীর প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন; ঐ সৌন্দর্য উপভোগের আনন্দ সত্য, কিন্তু বিভূতিভূষণ পল্লীকে নিয়ে কল্পনা-বিলাস করেন নি। পল্লীর জীবনের যথার্থ পরিচয় তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। 'ইছামতী' থেকে উদ্ধৃত অংশে পল্লীজীবনের সংকীর্ণতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তাঁর অন্য রচনায় ঐ সংকীর্ণতার একাধিক উল্লেখ বা রূপায়ণ আছে। তিনি তাঁর দিনলিপিতে সোজাসুজি বলেছেন,—

"আমাদের গ্রামের প্রকৃতি অদ্ভুত, কিন্তু মানুষগুলো বড় খারাপ। পরস্পর ঝগড়া, দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, পারিবারিক কলহ, জ্ঞাতিবিরোধ, সন্দেহ,

কুসংস্কার এতে একেবারে ডুবে আছে। লেখাপড়া বা সৎ চর্চার বালাই নেই কারো।"—ঊর্মিমুখর।

বিভূতিভূষণ যেমন গ্রামের জীবনকে আদর্শ বলে স্বীকার করেন নি, তেমনই গ্রামের জীবনকে অবজ্ঞাও করেন নি। গ্রামের প্রকৃতিকে তিনি ভালোবেসেছেন, কিন্তু গ্রামের জীবনের প্রাণহীন সংকীর্ণতা তাঁকে পীড়িত করেছে। তাঁর দিনলিপি থেকে এ বিষয়ে তাঁর সচেতন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়,—

"তবুও মনে হয় এসব জায়গায় বারোমাস আসা আমাদের মত লোকের চলে না। কারণ জীবন-নদীর স্রোতোধারা এখানে মন্দ গতিতে প্রবহমাণ—সক্রিয়, উন্নতিশীল, বেগবান্ জীবন এখানে অজ্ঞাত। বদ্ধ জলে পানা শেওলা জমে, জলকে শীঘ্র দূষিত করে ফেলে। যে চায় জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে, যাকে তার উপযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্ষমতা দিয়ে ভগবান সৃষ্টি করেন নি, যার জীবনের পুঁজি অনেক বেশী, তার জন্যে এসব জায়গা নয়। কিছুকাল এসে বেশ কাটানো যায় বা আসাও উচিত কিন্তু চিরদিন এখানে যে কাটাবে তাকে তা হোলে নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে সেবাব্রতে দীক্ষিত হতে হবে, যে বলবে আমার নিজের কিছু চাইনে, দেশের ছেলেদের জন্য স্কুল খুলবো, তাদের পড়াবো, দরিদ্রদের দুঃখ মোচন করবো, ম্যালেরিয়া তাড়াবো ইত্যাদি—সেরকম মানুষ হাসিমুখে সমস্ত অসুবিধা ও অন্ধকারকে বরণ করে নিয়ে এখানে এনে বাস করতে পারে।"—তদেব।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেমের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধ কিছু পরিমাণে জড়িত ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সৌন্দর্যচেতনা তাঁর প্রকৃতি প্রেমের মূল কথা নয়। প্রকৃতির সৌন্দর্যের তারতম্য বিচারও সেই জন্য তিনি করেন নি। তিনি বাংলা দেশে বা বাংলার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন, কিন্তু একটা কাল্পনিক মাপকাঠি দিয়ে প্রকৃতিকে বিচার করতে চান নি। বরং প্রকৃতির সৌন্দর্যকে এইভাবে বিচার করার প্রয়াস দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। 'বনে পাহাড়ে'র এক অংশে তাঁর উক্তি—

"ঘাটশিলা থেকে সাত আট মাইল দূরে বেশ একটি নির্জন বনভূমি ও ক্ষুদ্র ঝর্ণা আছে। তার প্রবেশপথটি সত্যই অতি সুদৃশ্য। শরৎকালে, পর্বতসানুর বনে অজস্র বনশিউলি ফুল ফুটে ঝরেছে শিলাতল বিছিয়ে, শিশিরার্দ্র বনস্থলীর সুগন্ধ মনে শান্তি আনে, তৃপ্তি আনে, নব নব কল্পনা জাগায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিন আমাদের সঙ্গে এক বড় ঘরের বধূ ছিলেন, তিনি সারা পথ কেবল ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতে লাগলেন—এ কি আর এমন ! কাশ্মীরে যা দেখেছি তার তুলনায় এ—

আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করছিনে। কাশ্মীর ভালো নয় কেউ বলবে না—তা বলে, যে একবার কাশ্মীর দেখেছে তার কাছে সব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিস্বাদ হয়ে যাবে, আর কিছু থেকে সে আনন্দ পাবে না, গাছপালা নদী প্রান্তরের সৌন্দর্য দেখার সহজ চোখ সে হারিয়ে ফেলবে ? এ যদি হয় তবে কাশ্মীর না দেখাই মঙ্গলজনক।"

প্রকৃতির ঐ ধরনের তারতম্য বিচার অহংকারের পরিচায়ক—হয়তো বা স্থূল সম্ভোগপিপাসার তির্যক প্রকাশ। যে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মানুষ উত্তরোত্তর গৃধ্নু হয়ে ওঠে—যা কিছু সেরা তা উপভোগ করার জন্য লোলুপ হয়ে ওঠে, সেই প্রবৃত্তিই প্রকৃতির সৌন্দর্যকে নিক্তিতে মেপে সূক্ষ্ম অহংকারে গড়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেমের মধ্যে ঐ অহংকারের লেশমাত্র নেই, এমন কি নিঃসক্ত সৌন্দর্যচেতনাও নেই। প্রকৃতি তাঁর জীবনে সহজে মিশে গিয়েছিল। প্রকৃতির গভীর রহস্য অনুভবের কথা তিনি বার বার বলেছেন বটে কিন্তু ঐ সাধনায় সিঁড়ি পেতে হলে স্বভাবের যে অধিকার দরকার তা বিভূতিভূষণের সহজাত ছিল। সেইজন্য প্রকৃতি-সন্দর্শন তাঁর সৌন্দর্যপিপাসার পরিতৃপ্তির একটা উপায় বা গতানুগতিক ফ্যাসানমাত্র ছিল না। ইংরেজীতে যাকে মুড বলে, সেই ক্ষণিক ভাবালুতার বশবর্তী হয়ে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করতে তিনি চান নি, জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ ঘটাতে চেয়েছিলেন।

পল্লীর মানুষের জীবন যে সংকীর্ণ এই চেতনার সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক যোগ স্থাপনের কল্পনা স্ববিরোধী বলে মনে হতে পারে। আসলে বিভূতিভূষণ গ্রামের জীবনকে যে সংকীর্ণ বলেছেন তার কারণ বৃহত্তর জীবনচিন্তার সঙ্গে গ্রামের মানুষের যোগের অভাব। তাঁর নিজের পক্ষে পল্লীর জীবনের মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ থাকা যে কঠিন ছিল তার কারণ তাঁর স্বভাবগত দূরায়ণ বাসনা। পল্লীর জীবনের সংকীর্ণতা দেখে তিনি পীড়িত হয়েছেন, কিন্তু শহরের কুশ্রীতা আর নিষ্প্রাণ কৃত্রিমতা তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তাঁর কল্পনাময় দৃষ্টিতে শহরের ধনীর অট্টালিকার তুলনায় দরিদ্র অরণ্যবাসীর নিবাস শ্রেয় বলে মনে হয়েছে,—

"কোল-বোংসা গ্রামে বাস করে হো জাতীয় অধিবাসীরা, ঘরদোর তাদের অত্যন্ত খারাপ—নিতান্ত দীনহীন, কিন্তু তারা এক রমণীয় পার্বত্য দৃশ্যের মধ্যে সর্বদা থাকে, ওদের কুটীরের দাওয়ায় বসলে নীল শৈলমালা ও বনকান্তারের কি শোভন রূপটিই চোখের সামান ফুটে ওঠে। অনেক বড়লোকের বাড়ী হয়তো কোনো এঁদো গলির মধ্যে একটি ইটের স্তূপমাত্র, দরজার একপাশে দেখা যাবে ডাস্টবিন, গোটা কতক কাক আর খেঁকি কুকুর আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এমন নীল বনানীর শোভা, এমন রক্তপলাশের উৎসব সেখানে কোথায়?"
—বনে পাহাড়ে।

বিভূতিভূষণ জীবনপলাতক ছিলেম না বলেই একাকী শহর থেকে দূরে গ্রাম বা অরণ্যের মধ্যে বাস করে প্রকৃতির শোভা বা রহস্য অনুভব করতে চাননি। রবীন্দ্রনাথের একটি ব্রহ্মসংগীতের প্রথম ছত্র —'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।' বিভূতিভূষণ মুখ্যত অধ্যাত্ম রসপিপাসু ছিলেন না, কিন্তু তিনি প্রকৃতির মধ্যে অনুরূপ আনন্দধারার নিরন্তর প্রবাহ অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে ঐ আনন্দের স্বাদ সহৃদয় পাঠকের অন্তরে সঞ্চার করে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা কখনও প্রচ্ছন্নভাবে, কখনও বা প্রত্যক্ষভাবে

কাজ করেছে। এমন কি তিনি এটিকে একটি কর্তব্য বলে অভিহিত করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। যৌবনের দিনলিপিতে তাঁর এই আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়,—

"জগতে অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে। গাছপালা, ফুল, পাখী, উদার মাঠঘাট, সময়, নক্ষত্র, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্নারাত্রি, অস্ত-সূর্যের আলোয় রাঙা নদীতীর, অন্ধকার আলোকময়ী উদার শূন্য—এসব থেকে এমন সব বিপুল, অবক্তব্য আনন্দ, অনন্তের উদার মহিমা প্রাণে আসতে পারে—সহস্র বৎসর ধরে তুচ্ছ জাগতিক বস্তু নিয়ে মত্ত থাকলেও সে বিরাট অসীম, শান্ত উল্লাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কোনো জ্ঞান পৌঁছায় না। জগতের শতকরা নিরানব্বই জন লোক এ আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত্যুদিন পর্যন্ত অনভিজ্ঞই থেকে যায়—শত-বর্ষজীবী হলেও পায় না···অনুরূপ শিক্ষা, অনুরূপ সাহচর্য, আদর্শ যেরূপ আনন্দের পথ দেখিয়ে দেবার জন্য প্রয়োজন হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে তা সকলের জোটে না।

সাহিত্যকারের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্তা সর্বসাধারণের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া। তারা ভগবানের প্রেরণা দিয়ে এই মহতী আনন্দবার্তা, এই অনন্ত জীবনের বাণী শোনাতে জগতে এসেছে, এই কাজ তাদের করতে হবেই—তাদের অস্তিত্বের এই শুধু সার্থকতা।"
—স্মৃতির রেখা, ভাগলপুর, ৩০. ৪. ১৯২৫।

······························৬······························

সাধনা

'দেবযান' উপন্যাস থেকে একটি উদ্ধৃতিতে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে সৃষ্টিকর্তা হিরণ্যগর্ভের প্রতি মানুষের মন পৌঁছানোর একটা সোপান বলে কল্পনা করা হয়েছে। দর্শনের ভাষায় তাঁর এই উক্তির অনুবাদ

করে বলা যায় যে, মায়ার সাহায্য নিয়েই মায়াধীশের কাছে পৌঁছানো যায়—প্রকৃতির সাধনা করলে শেষে একদিন পুরুষের কাছে পৌঁছানো যেতে পারে। অবশ্য বিভূতিভূষণ 'অকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধম্' যে ক্লীবলিঙ্গপদব্যঞ্জিত নির্গুণ ব্রহ্ম তার কথা বলেন নি, তিনি পরম ঐশ্বর্যবান্ সগুণ ব্রহ্মের কথা বলেছেন। 'কুশল পাহাড়ী' গল্পে একটি সাধুর মুখে ঈশোপনিষদের ঐ শ্লোকটির 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ' অংশটির যে ব্যাখ্যা তিনি বসিয়েছেন তা স্মরণীয়,—

"কবিই তিনি বটেন বাবা। এখানে বসে বসে দেখি। এই শাল গাছটাতে ফুল ফোটে, বর্ষাকালে ময়ূর ডাকে, ঝর্ণা দিয়ে জল বয়ে যায়, তখন ভাবি কবিই বটে তিনি। আমি কিছু পাইনি বাবা। ভড়ং দেখচো, এ সব বাইরের। ভেতরের জ্ঞান কিছু হয়নি। তবে দেখতে চেয়েছি তাঁকে। তাঁর এই কবিরূপ দেখে ধন্য হয়েচি।"

বিভূতিভূষণও প্রকৃতির মধ্যে এই কবিরূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এই মুগ্ধ হওয়ার জন্য তাঁর পক্ষে বিশেষ উপকরণের প্রয়োজন যে হয় না সে পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। অনেক জায়গায় দু'টি সহজ বাক্যে তিনি সৌন্দর্যমুগ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন,

"আজকাল ইসমাইলপুরের কাছারীটা বড় সুন্দর লাগে। দুর্ধলী ঘাসের ফুল, কন্টিকারীর বেগুনী ফুল, বনমূলোর ফুল, আকন্দের ফুল।" —স্মৃতির রেখা, ১. ৩. ১৯২৮।

দিনলিপিতে কোনো কোনো অংশে প্রকৃতির সৌন্দর্যমুগ্ধতা আধ্যাত্মিক আকুতির রূপ নিতে চেয়েছে। 'স্মৃতির রেখা' থেকেই আর একটি অংশ,—"হে অনন্ত, যুগে যুগে তুমি কখনো বদলে যাও না। সমস্ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, সমস্ত ধ্বংস-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অপরিবর্তিত, অনাহত তুমি যুগে যুগান্তরে চলেছ। এই দৃশ্যমান পৃথিবী যখন আকাশে বাষ্পপিণ্ড ছিল, তারও কত অনন্তকাল পূর্ব থেকে তুমি আছ, এই পৃথিবী তখন আবার জড় পদার্থের টুকরোতে রূপান্তরিত হয়ে দিকহারা উল্কার গতিতে দিগভ্রান্ত হয়ে অনন্ত ব্যোমে ছুটোছুটি করবে,

তখনও তুমি থাকবে। কালের অতীত, সীমার অতীত, জ্ঞানের অতীত কে তুমি—তোমাকে চেনা যায় না। অথচ মনে হয় এই যেন বুঝলাম, এই যেন চিনলাম। শেষ রাত্রের নদীর জলে যখন চিকচিকে মিষ্টি জ্যোৎস্না পড়ে, শেওলায় কূলে তাল দেয়, তখন মনে হয় সেখানে তুমি আছ, ছোট্ট ছেলে তার কচি মুখ নিয়ে ভুর ভুরে কচি গন্ধ সমস্ত গায়ে মেখে যখন নরম হাত দুটি দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে যেন মনে হয় সেখানে তুমি আছ, ওরাওণ যখন পৃথিবীর গতিতে সমস্ত রাত্রির পরে দূর পশ্চিমে আকাশে ঝুলে পড়ে, সেই রুদ্র প্রচণ্ড অথচ না-ধরা-দেওয়া গতির মধ্যে তুমি আছ, জনহীন মাঠের ধারে গ্রাম্য ফুলের দল যখন ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে অকারণে হাসে তখন মনে হয় তাদের সেই সরল প্রাণের মাধুর্য, তার মধ্যে তুমি আছ।"—কলকাতা, ২৭. ১০. ১৯২৪।

'কুশল পাহাড়ী'র সাধু সৃষ্টির মধ্যে ভগবানের কবিরূপ দেখেছেন। বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে সৃষ্টির অনুপম সৌন্দর্য তাঁকে স্রষ্টা সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। তিনি অরণ্যের মধ্যে বেদ-বেদান্তের জন্মের কথা বলেছেন। উপনিষদের আনন্দ ব্রহ্মের কল্পনা আরণ্যক সভ্যতার দান সন্দেহ নেই—অরণ্য ভূমির নিবিড় সৌন্দর্যের পরিমণ্ডলে লালিত জীবনেই সর্বময় আনন্দের উপলব্ধি সম্ভবপর হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যকে স্রষ্টাকে পাওয়ার সোপান বলেছিলেন—প্রথম বয়সের রচনায় তার আভাস সুস্পষ্ট। অরণ্যভূমি তাঁকে অধ্যাত্ম চিন্তায় উৎসুক করেছে। অবশ্য তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হন নি—তাঁর ভাবনা একটি গভীর আবেগের আকারে পরিস্ফুট হয়েছে। এর আগে 'অপরাজিত' আর 'আরণ্যক' থেকে উদ্ধৃত কয়েকটি অংশে বিভূতিভূষণের কবিমনের এই ভাবটির আভাস পাওয়া যায়। 'আরণ্যক' থেকে স্ফুটতর একটি অংশ উদ্ধার করা হল।—

"কতবার এই ক্লান্ত বর্ষণ মেঘ-থমকানো সন্ধ্যার এই মুক্ত প্রান্তরে সীমাহীনতার মধ্যে কোন দেবতার স্বপ্ন যেন দেখিয়াছি—এই মেঘ,

এই সন্ধ্যা, এই বন, কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্প, মঞ্চী, রাজু পাঁড়ে, ভানুমতী, মহালিখারূপের পাহাড়, সেই দরিদ্র গোঁড় পরিবার, আকাশ, ব্যোম, সবই তাঁর সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত—তাঁরই আশীর্বাদ আজিকার এই নব-নীল নীরদমালার মতই সমুদয় বিশ্বকে অস্তিত্বের অমৃতধারায় সিক্ত করিতেছে—এই বর্ষণ-সন্ধ্যা তাঁরই প্রকাশ, এই মুক্ত জীবনানন্দ তাঁরই বাণী, অন্তরে অন্তরে যে বাণী মানুষকে সচেতন করিয়া তোলে। সে দেবতাকে ভয় করিবার কিছুই নাই—এই সুবিশাল ফুলকিয়া বইহারের চেয়েও, ঐ বিশাল মেঘভরা আকাশের চেয়েও সীমাহীন, অনন্ত তাঁর প্রেম ও আশীর্বাদ। যে যত হীন, যে যত ছোট, সেই বিরাট দেবতার অদৃশ্য প্রসাদ ও অনুকম্পা তার উপর তত বেশী।

আমার মনে হয় যে দেবতার স্বপ্ন জাগিত, তিনি যে শুধু প্রবীণ বিচারক, ন্যায় ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কিংবা অব্যয়, অক্ষয় প্রভৃতি দুরূহ দার্শনিকতার আবরণে আবৃত তাহা নয়—নাড়া বইহারের আজিমাবাদের মুক্ত প্রান্তরে কত গোধূলিবেলায় রক্তমেঘস্তূপের কত দিগন্তহারা জনহীন জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া মনে হইত তিনিই প্রেম ও রোমান্স, কবিতা ও সৌন্দর্য, শিল্প ও ভাবুকতা—তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, সুকুমার কলাবৃত্ত দিয়া সৃষ্টি করেন, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া থাকেন নিঃশেষে প্রিয়জনের প্রীতির জন্য—আবার বিরাট বৈজ্ঞানিকের শক্তি ও দৃষ্টি দিয়া গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকার সৃষ্টি করেন।"

ভগবানের সৃষ্টির অনুপম মাধুর্য বা সৌন্দর্যকে বিভূতিভূষণ ঠিক ঐশ্বর্য বলতে চাননি। স্রষ্টির মধ্যে স্রষ্টার শক্তির সম্পদ অবশ্যই প্রকাশিত হয়, কাব্যের মধ্যে কবির কবিত্বশক্তির পরিচয় ফুটে ওঠে। কিন্তু সেইটাই শেষ কথা নয়। বিভূতিভূষণ ভগবানকে মহান্ স্রষ্টা বলে, মহা কবি বলে বন্দনা করেছেন। শিল্পীর যে আনন্দ, কবির যে আনন্দ—বিভূতিভূষণ এই সৃষ্টিকে অবলম্বন করে সেই আনন্দের স্বাদ

গ্রহণ করতে উৎসুক হয়েছিলেন। কবির রচনা সহৃদয় সামাজিকের অন্তর স্পর্শ করে—মহাকবির রচনা কবির প্রাণমন এক অপূর্ব স্বাদে ভরে দেয়। বিভূতিভূষণের পরিণত বয়সের দিনলিপি 'হে অরণ্য কথা কও' থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি থেকে তাঁর এই চেতনার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।—

[ক] "এই গভীর রাত্রে অরণ্য নিঃশব্দতার মধ্যে—দূরবর্তী অপরিচিত পাহাড়ী ঝর্ণার জলপতনধ্বনি ও দু একটা নৈশ পাখীর কূজন দ্বারা দ্বিখণ্ডিত যে গভীর নৈঃশব্দ্য, এর মধ্যে কান পেতে থাকলে যেন কার বাণী শুনতে পাওয়া যায়। শুনলামও তাঁর বাণী, শুনে সারা হৃদয়মন জয়ধ্বনি করে উঠলো সেই বিরাট স্রষ্টা, সেই সৌন্দর্যশিল্পী, সেই রহস্যময় অনন্তের উদ্দেশে! মুখে কিছু বলা যায় না।"

[খ] "বিশ্বশিল্পীর অপূর্ব সৃষ্টি এই পৃথিবী, এই পৃথিবীর বসন্ত, এই মানুষের মন। আমি যদি না থাকতুম, এ বসন্ত শোভা, এ শুক্লা-পঞ্চমীর জ্যোৎস্না কে আস্বাদন করতো? মানুষের মনের মধ্যে দিয়ে তিনিই তাঁর সৃষ্টির লীলারস আস্বাদন করচেন। যে সমজদার, যে রসিক শিল্পীমনের অধিকারী সে ধন্য—কারণ ভগবান তার চোখ দিয়ে, মন দিয়ে সৃষ্টির সৌন্দর্য উপভোগ করেন। সুতরাং সমজদারের চোখ ভগবানের চোখ, সমজদার রসিকের মন ভগবানের মন—যা সৃষ্টিমুখী হলে একটা গোটা বিশ্ব সৃষ্টি করে ফেলতে পারে চক্ষের পলকে।"

[গ] "আর শুধুই মনে আসে সে বিরাট দেবতার, কত ভাবে, কত দিক থেকে। বহু প্রাচীন দিনে ভারতবর্ষের এমনি কোন অরণ্যের শিলাতলে বসে ব্রহ্মসূত্রকার মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন রচনানুপপত্তেশ্চানু-মানম্—বিশ্বরচনা দেখলে মনে হয় যেন এর মধ্যে কোন বিরাট শিল্পচেতনা সব সময়ে সক্রিয়।

সেই মহান, বিরাট শিল্পীকে বন্দনা করি। জয় হোক বিশ্বের সে অধিদেবতার। মহাকবি তিনি, অনাদ্যন্ত শাশ্বত যুগ ধরে এই রকম শিলাস্তূপ ঝর্ণার তটে, অনন্ত নীহারিকামণ্ডলী ছড়ানো আকাশপটে,

বনকুসুমের পাপড়ির দলে, বিহঙ্গকাকলীতে, জাতির উত্থানপতনে, চাঁদের আলোয়, তরুণীর নির্মল প্রেমের ব্যথায়, শোকে, বিরহের গানে, অগ্নিপুচ্ছ ও ধূমকেতুদলের যাতায়াতে, দেশ ও মহাদেশের অবনমন পুনরুত্থানে তিনি আপন মনে তাঁর বিরাট এপিক কাব্য লিখেই চলেছেন।"

অরণ্যের সৌন্দর্য, বৃহত্তর অর্থে প্রকৃতির সৌন্দর্য বিভূতিভূষণের অন্তরে বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বের বোধ এনে দিয়েছে। দৃষ্টিই এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান সহায়ক হয়েছে, কিন্তু চোখের আলোই এ সৌন্দর্যের অনুভূতির পক্ষে যথেষ্ট নয়। অনুভূতি প্রাণন-মননের ক্রিয়া। চেতনাকে জাগিয়ে না তুললে বিশ্বের সব সৌন্দর্যের আয়োজনই নিষ্ফল হয়ে যায়। বিভূতিভূষণের একটি উক্তি,—

"ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে যে কত সৌন্দর্য আছে তা দেখবার সুযোগ ও সুবিধা কি সকলের ঘটে? চৈতন্যকে প্রসারিত করে দেওয়া চাই, নতুবা শুধু চোখ দিয়ে দেখলে কিছুই দেখা যায় না। মনকে তৈরি করে নিতে হয় এ জন্যে। এর সাধনা চাই। বিনা সাধনায় কিছু হয় না। উচ্চতর অনুভূতির জন্য মনের আকুতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আকুতি থেকে ইচ্ছা, ইচ্ছা থেকে কর্মপ্রবৃত্তি।"

বিভূতিভূষণ প্রচলিত অর্থে সাধক বা অধ্যাত্মপিপাসু ছিলেন না। তাঁর সাধনাকে সূক্ষ্ম অর্থে অধ্যাত্মসাধনা বলা যেতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তিনি গভীর আনন্দরসেরই সন্ধান করেছেন। এই আনন্দ তিনি বন্ধনের মধ্য থেকে অর্থাৎ প্রকৃতির মায়াবরণ স্বীকার করে আনন্দের সন্ধান করতে প্রয়াসী হয়েছেন। আবার এ প্রয়াসকে নিছক সৌর্যন্দানুভূতির আকাঙ্ক্ষা বলা যায় না। তিনি রূপে রূপে প্রকাশের আনন্দটুকু হৃদয়ে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। 'অভিযাত্রিক'-এ প্রধান শিক্ষক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের একাংশ,—

—"আমার মতে ইউনিভার্সকে বুঝতে চেষ্টা না করলে মানুষের কিছুই হল না।

—গ্রহনক্ষত্র, এই সব।

—শুধু গ্রহনক্ষত্র নয়, সব কিছু। পশুপক্ষী, গাছপালা, পৃথিবী, গ্রহ নক্ষত্র, Space—এক কথায় আমাদের জীবনের গোটা পটভূমিই। ইউনিভার্সকে না বুঝলে তার স্রষ্টা সম্বন্ধে কিছু বোঝা যাবে না। ভগবানের বিরাট ঐশ্বর্যরূপটা আগে প্রত্যক্ষ করি—তারপর তাঁর সম্বন্ধে ভাববো।"

এই তাঁর সম্বন্ধে ভাবাটা বিভূতিভূষণের কাছে গৌণ—তিনি এই বিশ্বের 'ঐশ্বর্যরূপ' অথবা বিশ্বরূপটাই প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা তাঁর কবিহৃদয়ের মূলা প্রকৃতি নয়। তিনি বিশ্বের অপরূপত্বই হৃদয়রসে জারিত করে সম্ভোগ করতে চেয়েছিলেন। তিনি ঈশোপনিষদের শ্লোকটির 'কবির্মনীষী' ইত্যাদি অংশের ভাবটুকু হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন, বলেছিলেন, 'যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।'—কিন্তু সত্যধর্মের দর্শনের জন্য হিরণ্ময় পাত্রখানি অপসারণ করার অন্তিম কামনা তাঁর ছিল না। রূপের লীলার বিচিত্র স্বাদ পাওয়াই তাঁর হৃদয়ের গূঢ় কামনা, তাঁর জীবনের সাধনা। তিনি স্পষ্টই বলেছেন,—

"ভগবানের সৃষ্টি দেখে বেড়াবো, এই তো চাই। তারপর আমার মুক্তি হোক না হোক, আমি স্বর্গে যাই না যাই—এ সব ভাবনা আমার নেই। আমি না থাকলেই বা কি? সেই অপূর্ব শিল্পী যিনি এই দৃশ্য সৃষ্টি করেছেন—যুগে যুগে তিনি থাকুন, তাঁর সৃষ্টি চলুক এমনি সুন্দরভাবে কল্প থেকে কল্পান্তরে, কত শত বিশ্বে, কত সহস্র ব্রহ্মাণ্ডে, রূপে রূপে তিনি লোকান্তর পূর্ণ করে মহাকালের সহস্র পথহীন পথে অনন্তকাল একা চলুন, চঞ্চল বালকের মত সরল, চপল আনন্দোচ্ছল নৃত্যচ্ছন্দে হেসে গেয়ে। তিনি দীর্ঘজীবী হোন।" চিরজীবী হোন।"—হে অরণ্য কথা কও।

..................................৭..................................

উৎস

বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেম বা প্রকৃতিচেতনা, যা মাঝে মাঝে আধ্যাত্মিক আকুতিতে পরিণত হওয়ার পথে এগিয়ে গেছে তার মূল উৎস অবশ্যই তাঁর নিজের বিশিষ্ট কবিসত্তা, তবে ঐ চেতনা পরিপুষ্ট হওয়ার বা পরিণত আকারে সাহিত্যের মধ্যে ব্যক্ত হওয়ার জন্য পূর্বসূরীদের কাছে তিনি কিছু কিছু ঋণী ছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে ঐতিহ্যের কাছে ঋণ না নিলে বিনা মূলধনে কেউ বড়ো কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না। ঐ ঋণ সহস্রগুণে পরিশোধ করাতেই কবি বা শিল্পীর সার্থকতা। ঐতিহ্যভ্রষ্ট সাহিত্য অর্কিডের মতো রূপসর্বস্ব পরিণামে নিষ্ফল।

বিভূতিভূষণের এই প্রকৃতি চেতনার উৎসের সন্ধানে প্রাচীন উপনিষদের যুগে যাওয়া যেতে পারে। উপনিষদের প্রথম ও চরম উদ্দেশ্য অবশ্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—তত্ত্বজ্ঞানের শাণিত অস্ত্রে মায়োপহিত সংসারের বন্ধন ছেদন; কিন্তু উপনিষদের ঋষিরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা মধ্যযুগের খ্রীষ্টান সাধকদের মতো জীবনবিমুখ ছিলেন না। জীবনসম্ভোগের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল না হলেও তাঁরা জীবনবিতৃষ্ণ ছিলেন না, বিশ্বের সৌন্দর্যের দিকে তাঁরা উদাসীনের মতো দৃষ্টিপাত করেন নি।

উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে বিভূতিভূষণের এক জায়গায় মিল আছে। উপনিষদ প্রধানত আরণ্যক সভ্যতার দান—যে তপোবনে উপনিষদ রচিত হয়েছিল বলে প্রসিদ্ধি আছে অরণ্যপ্রকৃতি সেখানে মানুষের জীবনকে যেন পরম স্নেহে লালন করেছিল। অরণ্যপ্রকৃতির স্নেহভরা কোলেই বিভূতিভূষণের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। বিভূতিভূষণের

কবিপুরুষ উপনিষদের ঋষিদের মতোই অরণ্যলালিত। তিনি বানপ্রস্থে গিয়ে অধ্যাত্ম চিন্তায় কাল কাটান নি বটে, কিন্তু উদ্ভিদ্‌ময় প্রকৃতির মধ্যেই তাঁর চেতনা পরিপুষ্টির উপযোগী রস আহরণ করেছে।

বিভূতিভূষণ উপনিষদের ঋষিদের কথা সজ্ঞানে চিন্তা করেছেন। নিবিড় অরণ্যভূমি দেখে তিনি উপনিষদের ঋষিদের কথা স্মরণ করেছেন। 'হে অরণ্য কথা কও' দিনলিপি থেকে উৎকলিত দু'টি অংশে তাঁর এ সম্পর্কে ভাবনার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে,—

[ক] "কত কি গাছ, কত ধরনের পাতা। বিশ্বরূপের কি রূপ। যেদিকে চোখ পড়ে অবাক চোখে চেয়ে থাকি। বরোজ পাতার বাঁশের বনে কচু ঝাড় বেতগাছের মত পাতা কি একটা গাছ, তারই পাশে বাঁশের ডগা নত হয়ে আছে—নিভৃত নিরালা বনভূমি, কোথায় সেই নাকটিটাড়ের শালবন, করঞ্জা পুষ্প-সুবাসিত অপরাহ্নের বাতাস, মাঠাবুরু পাহাড়ের শিখররাজি। বিরাট হস্তীমুণ্ডের মত পরিদৃশ্যমান কাঁড়দারুবুর শিখর—আর কোথায় বাংলার শ্যাম সৌন্দর্য। নদীজলে বিকেলে নাইতে নেমে ইছামতীর কালো জলে দেখি ভগবানের আর এক রূপ সৃষ্টি।

যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে
যিনি শোভন এ ক্ষিতি তলেতে

উপনিষদের ঋষিরা শুধু দার্শনিক ছিলেন না, দ্রষ্টা ছিলেন, কবি ছিলেন।"

[খ] "সুনিবিড় বনস্পতিশ্রেণীর ছায়ায় নদী বয়ে চলেচে, এক পাড়ে দুটি তিনটি কুটীর বনের মধ্যে। সাবাই ঘাস বিছানো। তার উপরে বসে ভগবানের সৌন্দর্য মনে মনে উপভোগ করলুম। চমৎকার স্থান বটে। পেছনের বড় বড় গাছে অপরাহ্নের রাঙা রোদ। যেন মুনিঋষিদের আশ্রম, মনে হয় পুরাকালে কোনো উপনিষদের কবি ও দার্শনিক ঋষি এমন সুন্দর নিভৃত শান্ত বনঝর্ণার তীরের কুটীরে পার্বত্য অরণ্যের ঘন ছায়ায় বনকুসুমের সুগন্ধ, চঞ্চল উদ্দামময়ী বন্য

নদীর নৃত্যচ্ছন্দের নূপুরধ্বনি ও বিহঙ্গকলতানের মধ্যে সমাহিত মনে উপনিষদ রচনা করেছিলেন, বিশ্বদেবের উপাসনা আপনা আপনি সরল ও সহজ আনন্দের মধ্য দিয়ে এখানে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তাঁর উদ্দেশে মনের কৃতজ্ঞতাই পূজার অর্ঘ্য।"

বিভূতিভূষণ অবশ্যই উপনিষদের অভিনিবিষ্ট পাঠক বা তত্ত্বান্বেষী ছিলেন না। উপনিষদের কোনো কোনো অংশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। সেগুলির মধ্যে কোনো কোনো মন্ত্র তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। ঐ সব মন্ত্রের মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা তিনি করেন নি। মন্ত্রের তত্ত্বার্থ না নিয়ে তিনি মন্ত্রকে তাঁর কল্পনানুসারে গ্রহণ করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে ঈশোপনিষদের দু'টি মন্ত্রের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। একটি ঈশোপেনিষদের অষ্টম মন্ত্র—

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণম্
অস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্
যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

এই মন্ত্রের 'কবির্মনীষী' এই বিশেষণাত্মক শব্দ দু'টি তিনি গ্রহণ করেছেন। 'কবি' শব্দটির অর্থ শাংকর ভাষ্যে 'ক্রান্তদর্শী—সর্বদৃক্।' বিভূতিভূষণের কাছে শব্দটি 'স্রষ্টা' বা 'শিল্পকৃৎ' অর্থবাচক। 'কুশল পাহাড়ী'তে সাধুর উক্তি স্মরণীয়। আগের পরিচ্ছেদে বিভূতিভূষণের কল্পনার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্ম বা আত্মার বিশেষণাত্মক অন্য শব্দগুলি তিনি উপেক্ষা করেছেন। পারমার্থিক তত্ত্বসম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল না। ঈশোপনিষদের ষোড়শ মন্ত্র—

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥

দ্বিতীয় চরণের অর্থ—রশ্মিগুলি দূর করো, তেজ সংবরণ করো। বিভূতিভূষণ একটি উদ্ধৃতিতে 'তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি' বলেছেন। উপনিষদ্ ভলো করে পড়লে তিনি এভাবে দ্বিতীয় চরণের শব্দকে তৃতীয় চরণের শব্দের সঙ্গে অন্বিত করতেন না। সম্ভবত 'সমূহ' শব্দটির প্রকৃত অর্থ তাঁর জানা ছিল না। তা ছাড়া তেজকেই কল্যাণতম রূপ বলে কল্পনা করার আগ্রহও এখানে ক্রিয়াশীল হতে পারে। ব্যাহৃতিসহ গায়ত্রী মন্ত্রে বিশ্বসবিতার বরণীয় ভর্গ থেকে ত্রিলোক আর ধীর উদ্ভবের যে কল্পনা আছে তা-ও হয়তো তাঁর নিজের কবিকল্পনার সঙ্গে মিশেছে।

উপনিষদের একটি মন্ত্রের সঙ্গে বিভূতিভূষণের কবিকল্পনার গভীর মিল দেখা যায়,—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যো ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

তিনি এই মন্ত্রটিরও উল্লেখ করেছেন। এই মন্ত্রটি বিভূতিভূষণের কবিভাবনার নির্যাস বলা যেতে পারে। বিভূতিভূষণ আরণ্যক ঋষির মতোই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিশ্বদেবতার 'আবেশ' কল্পনা করে প্রকৃতির অনুরাগের মধ্য দিয়ে পরম দেবতার আরতি করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রকৃতিচর্যা ধ্যানযোগের কবিজনোচিত রূপান্তর। উপনিষদের ঋষিদের মতোই তাঁর অরণ্যপ্রেম বা বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি অনুরাগও সুস্পষ্ট।

বিভূতিভূষণ উপনিষদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন প্রথমত হয়তো বা প্রধানত, রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রেরণায়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে উপনিষদের প্রভাবের প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়ে উপনিষদের কয়েকটি উৎকৃষ্ট অংশের সঙ্গে পরিচয়। বেশির ভাগ লেখকের ক্ষেত্রেই উপনিষদ বিশেষ

ভাবাদর্শের উৎস রূপেই কল্পিত হয়েছে, বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে এক দিক দিয়ে উপনিষদের ঋষির সঙ্গে যে বিভূতিভূষণের মিল ছিল সে কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। উপনিষদের ঋষি আর বিভূতিভূষণ—দ্বাবপি আরণ্যকৌ। উপনিষদের ঋষি অরণ্যপ্রকৃতির মধ্য থেকে রস আহরণ করে পরম তত্ত্বের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; আর বিভূতিভূষণ মুখ্যত বনপ্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন আর মাঝে মাঝে পরম পুরুষের সঙ্গে ঐ প্রকৃতির সংযোগ বা সম্পর্ক অনুভব করে ভাবাবিষ্ট হয়েছেন।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেমের মূলেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ ইংরেজী সাহিত্যের রোমাণ্টিক কবির প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতির উপাসনা আরম্ভ হয়। প্রকৃতির সঙ্গে সচেতনভাবে আত্মিক যোগস্থাপন ঊনবিংশ শতাব্দীর নবীন বাংলা কবিতার একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য। বিহারীলালের কাব্যেই সর্বপ্রথম খাঁটি প্রকৃতিগতচিত্ততা সার্থক হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের রচনায়—প্রধানত কাব্যে হলেও, সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই প্রকৃতিচেতনা বিশ্বচেতনা অপিচ অধ্যাত্মচেতনার সূত্রে গ্রথিত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে ভাবকল্পনার দিক দিয়ে মূল্যবান্ করে তুলেছে। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেমের মূলে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা আছে—অবশ্য ঐ প্রেমের মধ্যে তাঁর স্বকীয় কবিমর্মের আকুতিই বেশি করে ফুটে উঠেছে।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে যে প্রকৃতিচেতনা আছে তার মূলে রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রকৃতিভাবনার প্রেরণা যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে প্রকৃতিপ্রেম বিশ্বপ্রকৃতির অনুভূতির মধ্য দিয়ে বিশ্বদেবতার কল্পনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভূতিভূষণ প্রকৃতির সৌন্দর্যকে হিরণ্যগর্ভের কাছে পৌঁছবার একটা সোপান বললেও প্রকৃতিমুগ্ধতাই তাঁর সাহিত্যে বড়ো হয়ে উঠেছে। বিশ্বদেবতা বা হিরণ্যগর্ভের কল্পনা করলেও তিনি প্রধানত

প্রকৃতির বিচিত্র রূপ বা মাধুর্য অনুভব করেই তৃপ্ত হয়েছেন—সূক্ষ্মতর কোনো আকৃতি প্রবল হয়ে ওঠেনি।

এমন কি রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রকৃতিপ্রেম যেভাবে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-চেতনায় পরিণত হয়েছে বিভূতিভূষণের রচনায় সে ধরনের কোনো পরিণতি দেখা যায় না। বিভূতিভূষণ আদ্যন্ত প্রকৃতিপ্রেমে বিহ্বল। শিশুর কাছে মা যেমন সুন্দর, বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতিও তেমনই সুন্দর। বিমূর্তন রবীন্দ্রসাধনার প্রবণতা—বিভূতিভূষণ জীবনরস-পিপাসু। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় পদ্মা শেষে 'বলাকা'র "বিরাট নদী'তে পরিণত; বিভূতিভূষণের আদিতে ইছামতী, অন্তেও সেই ইছামতী। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রকৃতি আদিতে বিভূতিভূষণকে প্রেরণা জোগালেও তাঁর কবিচিত্ত এমন একটি মাধুর্যময় মায়ালোক সৃষ্টি করেছে রবীন্দ্রসাহিত্যে যার সন্ধান মেলে না।

৮

সিদ্ধি

"আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।"

—ঘাস, বনলতা সেন।

বিভূতিভূষণের রচনায় প্রকৃতিপ্রেমের নিবিড়তার পরিচয় পেতে পেতে জীবনানন্দ দাশের এই কবিতাটির কথা মনে আসে। জীবনানন্দ প্রকৃতির গভীরে চলে যেতে চেয়েছেন; বিভূতিভূষণ

প্রকৃতির নিবিড় বেষ্টনের মধ্যে থাকতে চেয়েছেন। তবে দু'জনের উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। জীবনানন্দ প্রকৃতির ব্যক্ত রূপের মধ্য দিয়ে বিচেতন বোধের সহায়তায় অব্যক্ত প্রকৃতিতে পৌঁছতে চেয়েছেন; তাঁর সাধনা বা সিদ্ধির ক্ষেত্রে রোধের প্রাধান্য হলেও ঐ বোধ একেবারে বুদ্ধিনিরপেক্ষ নয়, তবে সূক্ষ্ম বুদ্ধির নির্যাস বলা যেতে পারে। বিভূতিভূষণ প্রকৃতির সাধনা করেছেন আনন্দলোকে আত্মার উপনীতির জন্য। তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখলে জীবনানন্দ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী —অবশ্য যদি তাঁকে প্রকৃতিবাদী বা তান্ত্রিক বলা না হয়; আর বিভূতিভূষণ দ্বৈতবাদী। প্রকৃতি আর আত্মার পার্থক্যবোধ তাঁর মৌলিক চেতনা—প্রকৃতি আর পরমপুরুষের সম্পর্ক যে, সৃষ্টি আর স্রষ্টার এ কথা তিনি তো স্পষ্টভাবেই বলেছেন। তাঁর কাছে পরম পুরুষ আনন্দময় বা আনন্দস্বরূপ, মানুষ ঐ আনন্দের অভিসারী, প্রকৃতি ঐ আনন্দে উত্তরণের সেতু। প্রকৃতি সৌন্দর্য আর গূঢ় প্রেমের মধ্য দিয়ে মানুষকে ঐ আনন্দে পৌঁছে দেয়। ঐ আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মুক্তির নামান্তর। বিভূতিভূষণ অন্য কোনো মুক্তি চান না। তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে পরম পুরুষের আনন্দ উপলব্ধি করে মুক্তি পেতে উৎসুক। তাঁর একটি উক্তি,—

"মুক্তি! মুক্তি! মনের মুক্তি! আত্মার মুক্তি! এই সন্ধ্যায় সীমাহীন আকাশের দিগন্তলীন অভ্রবাহু যে দেবতার ছবি মনে আনে তিনি আর তাঁর এই শ্যামল বর্ষাপুষ্ট বনকুঞ্জ সুবাসিত লতাপুষ্প মুক্তি দিতে সমর্থ।"

এই মুক্তি অবশ্যই পরামুক্তি নয়। বিভূতিভূষণ মুক্তি চেয়েছেন বস্তুতান্ত্রিক সংকীর্ণ জগতের স্থূল বন্ধন থেকে, যাতে তিনি হৃদয় দিয়ে বিশ্বের অন্তহীন আনন্দরস আহরণ করতে পরেন। এই আনন্দ পারমার্থিক মুমুক্ষুর নয়, এই আনন্দ ভোক্তার—প্রধানত দ্রষ্টার। প্রচলিত অর্থে বিভূতিভূষণ সাধক ছিলেন না—কিন্তু তাঁরও একটি স্বগত সাধনা ছিল। প্রকৃতি যে সেই সাধনায় উত্তরসাধিকার

ভূমিকা গ্রহণ করেছে এ ইঙ্গিত আগেই করা হয়েছে। প্রকৃতির সহায়তাই বিভূতিভূষণের কবিজীবনে সিদ্ধি এনে দিয়েছে।

এই সিদ্ধি প্রকৃতির গূঢ় লীলার সহজ অনুভব। বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি a thing of beauty বলেই joy for ever হয়ে উঠেছিল এমন নয়। বিশ্বময় সৃষ্টির যে এক অখণ্ড তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে, প্রকৃতির মধ্যেই তিনি তার লীলারূপ উপলব্ধি করেছিলেন। এই জন্যই মুখ্যত অধ্যাত্ম পিপাসু না হলেও তিনি বিশ্বাত্মা বা হিরণ্যগর্ভের কল্পনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বের বিচিত্র রূপ একটি অখণ্ড লীলার সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে। একটি উক্তি,—

"যিনি সূর্যে নক্ষত্রে নিওন, আয়রন, হিলিয়াম, হাইড্রোজেন গ্যাসের আগুন জ্বেলে রেখেছেন তিনিই এই শ্যামল সবুজ শান্ত তৃণতরু, এই সৌন্দর্যভরা পল্লীদৃশ্যের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আগুনে, তিনিই জলেতে—অদ্ভুত contrast! সূর্যের বিশাল অগ্নিকটাহের সৃষ্টি শুধু এই শ্যামল বনশোভার, এই তৃণাবৃত প্রান্তরকে সম্ভব করবার, রূপ দেবার প্রাক্-আয়োজন মাত্র।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ-মধু পান।' বিভূতিভূষণ যে মধু পান করেছেন তা অরূপ-মধু কিনা বলা কঠিন, তবে তা যে মধু সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তা সীধু নয়। প্রকৃতির সাধনা তাঁকে সৌন্দর্যলোভী বা প্রমত্ত করে তোলে নি, বরং তাঁর সত্তায় একটি পরম শান্তরস সঞ্চার করেছে। এই শান্তরস বৈরাগীর, তবে সন্ন্যাসীর নয়। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নিরাসক্ত অথচ সপ্রেম দৃষ্টি তিনি প্রকৃতির কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। এই দৃষ্টির প্রসন্নতা তাঁর মানবচরিত্রেও সঞ্চারিত হয়েছে—তাঁর সৃষ্ট চরিত্র উদাসীন না হলেও অশান্তির কুম্ভীপাকে অসহ্য নিপীড়ন ভোগ করে না। অন্ন দু' একটি ব্যতিক্রম থাকলেও সাধারণত তাঁর চরিত্রে বিক্ষোভের জ্বালা নেই, প্রবৃত্তির দুর্মদ তাড়না নেই, আত্মপলায়নের দুঃসহ গ্লানি নেই। তাঁর কল্পিত চরিত্রে, কাহিনীতে, রচনাভঙ্গিতে বনশ্রেণীর মতোই

ঋজুতা। প্রকৃতি যেন তাঁর কবিচিত্তকে শান্তরসে জারিত করেছিল; অথবা তাঁর কবিচিত্ত যেন প্রকৃতির বিচিত্র রূপ থেকে শান্তরস বিন্দু বিন্দু পান করে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি যেখানে দ্রষ্টা সেখানে প্রকৃতির পরিচয় সুস্পষ্ট; তিনি যেখানে স্রষ্টা সেখানেও তিনি প্রকৃতিসিদ্ধ।

মানুষ

১

প্রকৃতি : মানুষ

যেসব সাহিত্যিক প্রকৃতিকে ভালবাসেন তাঁরা মানুষের প্রতি বিমুখ, এই রকম একটা ধারণা সার্বজনীন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা বিহারীলালের নজির অবশ্যই দেওয়া হয়, সমালোচকরা রবীন্দ্রনাথের উল্লেখও করতে পশ্চাৎপদ হন না। বিভূতিভূষণের রচনার অংশবিশেষ পড়লে অনুরূপ একটা ধারণা হওয়া অসম্ভব নয়। যেমন,—

"আমাদের গ্রামের প্রকৃতি অদ্ভুত, কিন্তু মানুষগুলো বড়ো খারাপ। পরস্পর ঝগড়া, দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, পারিবারিক কলহ, জ্ঞাতিবিরোধ, সন্দেহ, কুসংস্কার এতে একেবারে ডুবে আছে। লেখাপড়া বা সৎচর্চার বালাই নেই কারো।"—উর্মিমুখর।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, বিভূতিভূষণ প্রকৃতিপ্রেমিক, কিন্তু মানববিদ্বেষী, অন্ততপক্ষে মানববিমুখ; সেজন্য তিনি প্রকৃতির সাহচর্য চেয়েছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গ তাঁর ভালো লাগে নি। তিনি একাকী প্রকৃতির কাছে যাওয়ার কথাও একাধিক বার বলেছেন। 'হে অরণ্য কথা কও' থেকে একটি অংশে প্রকৃতির সৌন্দর্যময় একটি নির্জন পরিবেশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,—

"ভগবানের উপাসনা এখানে নীরব ও ভাবঘন, সমাহিত। বিশাল প্রান্তরের যেদিকে চাই—জ্যোৎস্নালোকিত ধরিত্রী যেন জন্ম-মরণ-ভীতি-ভ্রংশি কোন মহাদেবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলনের আনন্দে নিঃস্পন্দ সমাধিতে অন্তর্মুখী। শুধু দেখা যায় বসে বসে এর অপূর্ব রূপ, শুধু অনুভব করা যায় মনের গোপন অন্তরে এর সে নীরব বাণী। চারিদিকে নিঃশব্দ, একে তো নির্জন প্রান্তর—এত রাত্রে এখানে কেউ আসে না—ভূতের ভয়ে স্থানীয় লোক এদিকে নাকি থাকে না বেশি

রাত্রে—মানুষের গলার সুর এতটুকু কানে গেলে মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায় আমার। সুতরাং প্রাণভরে এই নির্জনতা ও নৈশব্দ্যের বাণী শুনলাম বসে বসে রাত পর্যন্ত।"

কিন্তু বিভূতিভূষণ যে গ্রামের প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রশংসা করে গ্রামের মানুষদের নিন্দা করেছেন, বা নির্জনে বসে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে চেয়েছেন মানববিমুখতা এর কারণ নয়। গ্রামের মানুষদের তিনি নিন্দা করেছেন, কারণ গ্রামবাসীদের ক্ষুদ্রতা তাঁকে পীড়িত করেছে। বিভূতিভূষণ যখন প্রকৃতির মধ্যে ডুবে যেতে চেয়েছেন, তখন তিনি এক রকম সাধনা তৎপর হয়েছেন। যে কোনো সাধনার সময় বাইরের কোনো লোকের অস্তিত্ব বা বাক্য সাধকের মনের একাগ্রতা নষ্ট করে দেয়। বিভূতিভূষণ যখন তন্ময় হয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য বা রহস্যগভীরতা উপলব্ধি করতে চেয়েছেন তখন নির্জনতাই তাঁর সেই প্রকৃতিধ্যানের পক্ষে আবশ্যিক—সেজন্য তাঁকে মানববিমুখ বলা সঙ্গত হবে না।

বিভূতিভূষণের দিনলিপির দু'টি উদ্ধৃতি থেকে তাঁর মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে,—

[ক] 'সৃষ্টি আছে, চন্দ্র আছে, অসীম বস্তুপিণ্ডগুলো আছে—কিন্তু মানুষ যদি না থাকতো, তবে কিছুই না। মানুষ আছে বলেই এই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব, সুখের দুঃখের আনন্দ-উৎস। অজানা গ্রহে নক্ষত্রে কি আছে জানি না, কিন্তু মনে হয় সে সব স্থান মরুভূমি নয়—তরুণ মুখের হাসি-কান্নায়, সে সব অজানা দূরের জগতও জাগ্রত প্রাণ-স্পন্দনে ভরা, সেখানেও বিচিত্র সন্ধ্যাকাশে বিচিত্র বন-পর্বতের নির্জনতায় বিরহী একা বসে প্রিয়ার কথা ভাবে, মা হারানো-ছেলের স্মৃতিতে চোখের জল ফেলেন। দেশ-কর্তারা বড় বড় কাজ করেন, বড় বড় যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়।

এই পৃথিবীতে এই মানুষের মনের সুখ-দুঃখ নিয়েই ভগবানের অপূর্ব কাব্য।"—স্মৃতির রেখা।

[খ] "দেশ বেড়িয়ে যদি মানুষ না দেখলুম তবে কি দেখতে বেরিয়েছি?

চিরযৌবনা নিসর্গসুন্দরী সব কালে সব দেশেই মন ভুলায়, মন ভুলায় তার শ্যামল চেলাঞ্চল, বনময় ফুলসজ্জা, মধুমল্লীর সৌরভভরা তার অঙ্গের সুবাস।

তাকে সব স্থানে পাওয়া যায় না সে রূপে, কিন্তু মানুষ সব জায়গাতেই আছে। প্রত্যেকের মধ্যেই একটা অদ্ভুত জগৎ, দেখতে জানলেই সে জগৎটা ধরা দেয়। তাই দেখতেই পথে বার হওয়া। মানুষের বিভিন্ন রূপ দেখবার আমার চিরকাল আগ্রহ, নতুন মানুষ দেখলেই মনে হয় ওর সঙ্গে বসে একটু আলাপ করে ওকে চিনি। দেখতে চেয়েছিলুম বলেই বোধ হয় কত রকমের মানুষই যে দেখালেন জীবনে।

মানুষকে জেনে চিনে লাভই হয়েচে, ক্ষতি হয় নি, একথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলবো, হয়তো বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপাতত ক্ষতি বলে মনে হলেও, ভবিষ্যতে মনের খাতায় তাদের অঙ্ক পড়ে গেছে লাভের দিকেই। মানুষের অন্তর একটি রহস্যময় বিরাট বিশ্ব, এর সীমা নেই, শেষ নেই। মানুষের অন্তর্লোক আবিষ্কারের অভিযান, উত্তর-দক্ষিণ-মেরু অভিযানের মতই কষ্ট ও অধ্যাবসায়-সাপেক্ষ, সেই রকমই বৈচিত্র্যময়।"—অভিযাত্রিক।

বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে প্রকৃতি আর মানুষ পরস্পর প্রতিযোগী তো নয়ই, এমন কি পরস্পরের পরিপূরকও বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি আর মানুষকে একই আবিঃস্বরূপের প্রকাশ বলে উপলব্ধি করেছিলেন। বিভূতিভূষণ সেই অদ্বৈত তত্ত্বে বিশ্বাসী না হলেও প্রকৃতি আর মানুষ দু'টিকেই সৃষ্টির উপভোগ্য রূপ বলে অনুভব করেছেন। সেই জন্যই প্রকৃতির টানে তিনি প্রকৃতির মধ্যে গেছেন আবার মানুষের টানে মানুষের মধ্যে এসেছেন। তবে প্রকৃতিকে পাওয়া যেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল; মানুষকে সেভাবে বেশির ভাগ সময়ই

পাওয়া যায় না। মানুষকে তিনি তাঁর স্বভাবের সহজ দিয়ে পেতে চেয়েছিলেন। যেখানে মানুষ সহজ, সেখানে তিনি মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন। কিন্তু যেখানে সে আপন মনের অন্তরালে সব চেয়ে দুর্গম সেখানে তিনি মানুষের নাগাল পান নি। তিনি মনো-রহস্য ভেদ করে মানুষের পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করেন নি। প্রকৃতির কাছ থেকে তিনি যেভাবে সহজে পেয়েছেন মানুষের কাছেও তিনি তেমনই সহজে পেতে চেয়েছেন। কথাসাহিত্যিকের ক্ষেত্রে এদিক দিয়ে তিনি বিরল উদাহরণ সন্দেহ নেই, কিন্তু এইটাই তাঁর স্বধর্ম। এই স্বধর্মের যোগেই তাঁর গল্পের মানুষ সহজ—তার মধ্যে কুটিলতা বা রহস্যগর্ভতা নেই। প্রত্যেকের মধ্যেই যেন প্রকৃতির স্বতস্ফূর্ত প্রকাশের মতো সহজের স্পর্শ আছে।

সাহিত্য-বিচারকের দৃষ্টিতে ঐ মানুষগুলি নিতান্তই সাদামাটা বলে মনে হবে—কথাসাহিত্যের চরিত্র হিসাবে সেগুলি অনুত্তরঙ্গ। বাস্তবিক পক্ষে অনেক অল্পশক্তিমান কথাসাহিত্যিকের সৃষ্ট অনেক চরিত্র সে তুলনায় দীপ্তিময় বলে মনে হবে। এর সব চেয়ে বড়ো কারণ এই যে, তিনি যেসব মানুষ দেখেছেন তাদেরই ফুটিয়ে তুলেছেন। কারণ তাঁর গল্পের মানুষ কাল্পনিক চরিত্র নয়, রূপদক্ষের নিপুণ হাতের শিল্পকর্ম নয়,—তিনি জীবনে যা দেখেছেন তাই তাঁর রচনার উপাদান হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পে বিভিন্ন ভূমিকায় যাদের দেখা পাই তারা সাজঘরের নয়, জীবনের।

তিনি যেমন প্রকৃতিকে দেখেছেন, তেমনই মানুষও দেখেছেন। ভ্রাম্যমাণ জীবনে তিনি লোকালয় থেকে দূরে পালাতে চান নি—প্রকৃতির মধ্যে একবার ডুব দিয়ে মানুষের কাছে ফিরে ফিরে এসেছেন। সব মানুষ ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখযোগ্য নয়, জীবনের রঙ্গভূমিতে তাদের বেশির ভাগেরই ভূমিকা কাটা সৈনিকের মতো। সভ্যতার ঘূর্ণাবর্তে জীবনের যে অংশ ফেনময়, সেখানে তাদের স্থান নেই। নাগরিক দৃষ্টিতে তাদের জীবনবৃত্ত নিরতিশয়

তুচ্ছ; কিন্তু বিভূতিভূষণ তাদের মধ্যেই অফুরন্ত রসের সন্ধান পেয়েছিলেন। যে সানুরাগ দৃষ্টি দিয়ে বিভূতিভূষণ বনপ্রকৃতিকে দেখেছেন, সেই দৃষ্টি দিয়েই মানুষকে দেখেছেন বলেই ঐ সব উপেক্ষিত মানুষের মধ্যে তিনি বিচিত্র অথচ পরিচিত জীবনস্বাদ পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

এ কথা সত্য যে, তিনি মানুষের সংকীর্ণতা দেখে ক্লিষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখ বা দারিদ্র্য দেখে তিনি মানুষকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করেন নি। বরং মানুষের দুঃখই তাঁকে অনেক সময় আকৃষ্ট করেছে। দরদী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র অত্যাচারিত লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। বিভূতি-ভূষণের ভূমিকা একটু স্বতন্ত্র। বিভূতিভূষণ তাদের প্রতি মমতাপন্ন হয়েছেন। বেশির ভাগ সময় তাদের সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে গেছেন। তাঁর 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপি থেকে একাংশ,—

"যে বুড়ীটা গ্রামের পাঁচজনের ঝাঁটালাথি খেয়ে কিছুদিন আগে ঘরে ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে জল অভাবে মৃত্যুতৃষ্ণা নিবারণ করতে না পেরে মরেছিল তার কথা ভেবে মন উদার শোক ও শান্তিতে ভরে আসবে—জগতের পবিত্র কারুণ্যের আশাহত ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে অন্তরের অনাহত ধ্বনি কানে বাজবে। যে পরের ব্যথায় কাঁদতে শেখেনি সে অতি দুর্ভাগ্য। এক অতি অদ্ভুত জীবনরস থেকে সে বঞ্চিত হয়ে আছে।"

'এক অতি অদ্ভুত জীবনরস'—কথাগুলি মনে রাখবার মতো। বিভূতিভূষণ হয়তো প্রকৃতির মধ্যে ঐ জীবনরস আহরণ করতে চেয়েছিলেন। মানুষের জীবনের যে অংশটা চড়া রঙে নিজেকে ঢেকেঢুকে আমাদের চোখের সামনে বিচরণ করে তার প্রতি বিভূতি-ভূষণের আকর্ষণ ছিল না। জীবন যেখানে সহজ হয়ে ফুটে উঠে, যেখানে রঙের প্রলেপ জীবনের সহজ স্বাদকে ঢেকে রাখে নি, বিভূতি-ভূষণ সেখানেই তাঁর উৎসুক হৃদয় নিয়ে এগিয়ে গেছেন। 'ঐশ্বর্য,

প্রাচুর্য অনেক সময় জীবনকে বিকৃত করে ফেলে। দুঃখে, কঠোর আঘাতে জীবনরস ক্ষরিত হয়। 'তৃণাঙ্কুর' থেকে একটি উদ্ধৃতি,—

"জীবন আত্মার একটা বিচিত্র, অপূর্ব অভিজ্ঞতা। এর আস্বাদ শুধু এর অনুভূতিতে। সেই অনুভূতি যতই বিচিত্র হবে, জীবন সেখানে ততই সম্পূর্ণ, ততই সার্থক।

সেইদিক থেকে দেখলে দুঃখ জীবনের বড় সম্পদ, দৈন্য বড় সম্পদ, শোক, দারিদ্র্য, ব্যর্থতা বড় সম্পদ, মহৎ সম্পদ। যে জীবন শুধু ধনে, মানে, সার্থকতায়, সাফল্যে, সুখে, সম্পদে ভরা, শুধুই যেখানে না চাইতে পাওয়া, শুধুই চারিধারে প্রাচুর্যের, বিলাসের মেলা—যে জীবনে অশ্রুকে জানে না, অপমানকে জানে না, আশাহত ব্যর্থতাকে জানে না, যে জীবনে শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় বহুদিন হারা মেয়ের মুখ ভাববার সৌভাগ্য নেই, শিশুপুত্র খেতে চাইলে পিটুলি গোলা খাইয়ে প্রবঞ্চনা করতে হয় নি, সে জীবন মরুভূমি। সে সুখসম্পদ ধনসম্পদ ভরা ভয়ানক জীবনকে আমরা যেন ভয় করতে শিখি।"

বিভূতিভূষণ এখানে ভাববাদীর দৃষ্টিতে দুঃখের প্রশস্তি গান করেন নি—তিনি অনুভূতির দিক দিয়ে জীবনকে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। সেই অনুভূতির বিচিত্রতা বহু মানুষের জীবনের সঙ্গে নিবিড় সংযোগের ফলেই সম্ভবপর। নাগরিক জীবনে মানুষ যেন ছাঁচে ঢালা হয়ে আসে—তথাকথিত শিক্ষা বা সভ্যতা মানুষের বিশিষ্টতাকে খর্ব করতে চায়। বিভূতিভূষণ প্রকৃতির কোলে লালিত অরণ্যভূমি বা গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনের ছবি বেশি করে এঁকেছেন। কারণ তাদের সংস্পর্শে এসেই তাঁর বিশ্বতোমুখী জীবনরসপীপাসা কতকটা পরিতৃপ্ত হয়েছে। তিনি অবশ্যই বোহেমিয়ান ছিলেন না, কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে তাঁর বাধে নি। তাদের জীবনের সঙ্গে জীবন মিলিয়ে দিতে না পারলেও তিনি তাদের জীবনের খুবই কাছাকাছি এসেছিলেন, তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। অরণ্যভূমিতে তিনি যেমন

প্রকৃতি দেখেছেন তেমনই মানুষও দেখেছেন। 'আরণ্যক' উপন্যাসের কথা বাদ দিলেও তাঁর দিনলিপিতে উপেক্ষিত সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর সহজ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। হো কুলি মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য,—

"এ বনের মধ্যে এরা অত্যন্ত সরল, অত্যন্ত সৎ।

ওদের মুখের দিকে চাইলেই সে কথা বোঝা যায়। ছেলেমানুষের মত পবিত্র, সরল, নিষ্পাপ মুখশ্রী। সরলতা ও নির্লোভতা ওদের মুখে সুকুমার রেখার অক্ষরে লেখা রয়েচে।"—বনে পাহাড়ে।

অরণ্যের দরিদ্র মানুষদের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন,—

"এই হোল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষকে বুঝতে গেলে এইসব লোকের সঙ্গে মিশতে হবে। কি সামান্য এদের খাওয়া, কত তুচ্ছ এদের শোওয়া, শীতকে এরা শীত জ্ঞান করে না। বুনো হাতী মানে না, বাঘ মানে না যদি ছু'টাকা কি দেড় টাকা গাড়ীর ভাড়া মেলে। তবুও খায় বনকচু সিদ্ধ আর ভাত।"—তদেব।

মানুষকে ভালো না বাসলে এইভাবে বলা সম্ভবপর নয়। বিভূতিভূষণ প্রকৃতি আর মানুষ দুইকেই সহজে ভালোবেসেছিলেন। যেখানে ঐ ভালোবাসা বাইরের কোনো আবরণে ঠেকে যায়নি, সেখানেই ঐ ভালোবাসার ছাপ ফুটে উঠেছে।

..................................২..................................

দেশ-কাল

বিভূতিভূষণ গল্প-উপন্যাসে প্রধানত বাংলা দেশেরই রূপ এঁকেছেন। বিহার বা মধ্যপ্রদেশের বনভূমি তাঁর 'আরণ্যক' উপন্যাস আর কিছু কিছু ছোটগল্পের মধ্যে পরিবেশরূপে কল্পিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা দেশের ছবি, বিশেষ করে চব্বিশ পরগণা, নদীয়া আর যশোহর

জেলার পরিবেশ তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। কয়েকটি উপন্যাস বা ছোটগল্পে তিনি কলকাতা বা অপর কোনো শহরকে গল্পের ভৌগোলিক অবস্থানভূমিরূপে কল্পনা করেছেন বটে কিন্তু গ্রাম আর মফঃস্বলের মধ্যেই তাঁর বেশিরভাগ গল্প সীমাবদ্ধ।

বাংলার ভিন্ন অঞ্চলের ছবিও তাঁর রচনায় অপেক্ষাকৃত কম। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসে তিনি দার্জিলিং-এর অবতারণা করেছেন বটে, কিন্তু দার্জিলিং-এর জীবনের যে বর্ণনা করেছেন তা নিতান্তই বর্ণবিরল। সমুদ্র দেখে সাময়িকভাবে মুগ্ধ হলেও সমুদ্র তাঁর কল্পনায় কোনো স্থায়ী ছাপ আঁকে নি। বিহার মধ্যপ্রদেশের অরণ্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল—তাঁর হৃদয়ের টান ছিল নদী, গাছ, পাখি, ফুলে, পাতায়, ফলে ভরা বাংলাদেশের একাংশে—যেখান দিয়ে ইছামতী বয়ে গেছে। ইছামতীর তীরে যে জীবনের ধারা বয়ে আসছে বিভূতিভূষণ সেই জীবনের রূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপি থেকে একটি অংশ,—

"খুব রোদ চড়েছে, কলবলিয়াতে স্নান করতে এলাম। ঠাণ্ডা জলে নাইতে নাইতে ভাবছিলাম—ঐ আমাদের গ্রামের ইছামতী নদী। আমি একটা ছবি বেশ মনে করতে পারি—এই রকম ধূ ধূ বালিয়াড়ী, পাহাড় নয়, শান্ত, ছোট, স্নিগ্ধ ইছামতীর দু'পাড় ভরে ঝোপে কত বনকুসুম, কত ফুলে ভরা ঘেঁটুবন, গাছপালা, গাঙশালিকের বাসা, সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট, আকন্দ ফুল, গত পাঁচশত বৎসর ধরে কত ফুল ঝরে পড়ছে—কত পাখী কত বনঝোপ আসছে যাচ্ছে। স্নিগ্ধ পাটা শেওলার গন্ধ বার হয়, জেলেরা জাল ফেলে, ধারে ধারে কত গৃহস্থের বাড়ী, কত হাসিকান্নার মেলা। আজ পাঁচ শত বৎসর ধরে কত গৃহস্থ এল, কত হাসিমুখ শিশু মায়ের সঙ্গে নাইতে এল—কত বৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশানশয্যা হল ঐ ঠাণ্ডা জলের কিনারাতেই, ঐ বাঁশবনের ঘাটের নীচেই। কত কত মা, কত ছেলে, কত তরুণ-তরুণী সময়ের পাষাণ-বর্ত্ম বেয়ে এসে

গিয়েছে মহাকালের বীথিপথ বেয়ে। ঐ শান্ত নদীর ধারে ঐ আকন্দ ফুল, ঐ পাটা শেওলা, বনঝোপ, ছাতিমবন।

এদের গল্প লিখবো, নাম হবে ইছামতী।'—১. ৩. ১৯২৮।

শেষ উপন্যাস 'ইছামতী'র প্রায় শুরুতেই তিনি বলেছেন,—

"সবুজ চরভূমির তৃণক্ষেত্রে যখন সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রির ছায়া পড়বে, গ্রীষ্ম দিনে শাদা থোকো থোকো আকন্দফুল ফুটে উঠবে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলবে নিকটবর্তী বনঝোপ থেকে, নদীর মৃদু বাতাসে তখন নদীপথযাত্রীরা দেখতে পাবে নদীর ধারে পুরানো পোড়ো ভিটের ঈষদুচ্চ পোতা বর্তমানে হয়তো আকন্দ ঝোপে ঢেকে ফেলেচে তাদের বেশি অংশটা, হয়তো দু-একটা উইয়ের ঢিবি গজিয়েছে কোনো কোনো ভিটের পোতায়। এই সব ভিটে দেখে তুমি স্বপ্ন দেখবে অতীত দিনগুলির, স্বপ্ন দেখবে সেই সব মা ও ছেলের, ভাই ও বোনের, যাদের জীবন ছিল এক দিন এইসব বাস্তুভিটার সঙ্গে জড়িয়ে। কত সুখদুঃখের অলিখিত ইতিহাস বর্ষাকালে জলধারাঙ্কিত ক্ষীণ রেখার মত আঁকা হয় শতাব্দীতে শতাব্দীতে এদের বুকে। সূর্য আলো দেয়, হেমন্তের আকাশ শিশির বর্ষণ করে, জ্যোৎস্নাপক্ষের চাঁদ জ্যোৎস্না ঢালে এদের বুকে।

সেই সব বাণী, সেই সব ইতিহাস আমাদের আসল জাতীয় ইতিহাস। মূক জনগণের ইতিহাস, রাজারাজড়াদের বিজয়কাহিনী নয়।"

কথাসাহিত্যে যে দেশের পরিচয় পাওয়া যায় সে দেশ নিছক ভৌগোলিক অবস্থিতিমাত্র নয়—মানুষকে নিয়েই দেশ। বিভূতি-ভূষণ বাংলার গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনকে তাঁর লেখায় রূপ দিয়েছেন। তিনি যাদের কথা বলেছেন তারা প্রায় সকলেই গ্রামের জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত—অবশ্য পুরোপুরি নাগরিক দু'চারটি মানুষের সন্ধান পাওয়া যে যায় না এমন নয়। গ্রামের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ই এর একমাত্র কারণ। অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষ দর্শন সাহিত্যের মূল

হওয়ায় বিভূতিভূষণ গ্রামের মানুষের জীবনের পরিচয় দিতে উৎসুক হয়েছিলেন—এ ছাড়া তাঁর স্বকীয় কোনো আদর্শবাদ ছিল বলে মনে হয় না।

বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাস বা ছোট গল্পে যে কালের ছবি এঁকেছেন, তা মোটামুটিভাবে তাঁর সমকাল। এইচ. জে. ওয়েলস প্রমুখ তীক্ষ্ণ কল্পনাবান সাহিত্যশিল্পীর মতো কাল-যন্ত্রে আরূঢ় হয়ে সুদূর ভবিষ্যতে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা তিনি করেন নি। প্রকৃতিতে রোমান্টিক হলেও অতীতের মায়ালোকে গিয়ে কল্পনার স্বর্গ সৃষ্টি করতেও চান নি। তাঁর কয়েকটি গল্পে ইতিহাসের পরিমণ্ডল আছে—'মেঘমল্লার', 'প্রত্নতত্ত্ব', 'শেষ লেখা' প্রভৃতি গল্পের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু বিভূতিভূষণ এই সব গল্পের মধ্যে ইতিহাসের রস সঞ্চার করতে চান নি—এগুলি তাঁর কল্পনার বিচিত্র গতিপথের কয়েকটি নিদর্শন। কল্পনা তাঁর প্রধান সহায় ছিল না বলেই তিনি ইতিহাসকে রচনার বিষয়ীভূত করতে চান নি, যে কালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, সেই কালেরই জীবনের কথা বলেছেন।

অবশ্য আধুনিক কাল তাঁর রচনায় স্থান পেলেও তিনি অনেক কাহিনীকে অদূরবর্তী অতীতের পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন। তিনি যখন বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় বা চতুর্থ দশকে লিখছেন তখন প্রথম বা দ্বিতীয় দশককে কাহিনীতে স্থান দিয়েছেন। তাঁর রচনার একটা বড়ো অংশ স্মৃতিরসে জারিত হওয়ায় এ রকম হয়েছে। একেবারে হাল আমলের কথাও যে তিনি বলেন নি এমন নয়। তাঁর 'অনুবর্তন' আর 'অশনি সংকেত' উপন্যাসে আর শেষ দিকের কয়েকটি ছোট-গল্পে প্রায় সমকালের ছবি ফুটে উঠেছে। বিভূতিভূষণের রচনা পাঠ করে তাঁর কাল সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা অভিনিবিষ্ট পাঠকের মনে হবেই। অবশ্য তাঁর রচনায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অংশের ছবি এমন নিখুঁতভাবে ফুটেছে যে, তাঁর জন্মতারিখ পনেরো কুড়ি বছর পেছিয়ে ধরলে অসুবিধা বোধ হবে না।

কাহিনীর কালের দিক থেকে বিভূতিভূষণের রচনাকে মোটামুটি ভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকের কাহিনী স্থান পেয়েছে—স্মৃতিচারণ এই সব কাহিনীর একটা উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। শেষ দিকে তিনি বিশেষ করে সমকালের কাহিনীই লিখেছেন। তাঁর 'অনুবর্তন' উপন্যাস বা বিশেষ করে ছোটগল্পগুলির মধ্যে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকের জীবনের ছাপ ফুটে উঠেছে। তাঁর শেষ উপন্যাস 'ইছামতী' উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় লেখা হলেও এই কাহিনীকে তাঁর সমকাল পর্যন্ত টেনে এনে একটি 'এপিক' উপন্যাস রচনা করার এক পরিকল্পনা তাঁর ছিল। অকালমৃত্যু তাঁর সে পরিকল্পনায় ছেদ এনে দিয়েছে।

৩

সমাজ চেতনা : ইতিহাস চেতনা

সেকালের সাহিত্যপাঠকরা সাহিত্যের মধ্যে আনন্দের সন্ধান করতেন—ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের পরিভাষায় যে আনন্দের নাম রস। পাশ্চাত্য দেশে সাহিত্যের নিষ্ঠাবান্ ঐ রসৈষণা নতুন নতুন পথের সন্ধান করেছে। এক কালে জীবনদর্শন আর চরিত্রচিত্রণ সাহিত্যের মুখ্য বিচার্য বিষয় বলে মনে করা হত। তারপর মনো-বিশ্লেষণ সাহিত্যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। পরে আবার সমাজ সম্পর্কে মানুষের তাত্ত্বিক দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠেছে—সমাজবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো বিভিন্ন মানবিক বিদ্যার চর্চা ব্যাপক হয়ে উঠেছে। সাহিত্যকে ঐসব একালীন বিদ্যা দিয়ে পরখ করার প্রয়াস এই শতকের সাহিত্যবিচারের বিশেষ প্রবণতা। বিশেষত কথাসাহিত্যের মধ্যে সমাজজীবনের ছবি ফুটে উঠেছে কিনা বা

লেখক যুগসচেতন কিনা, সে বিচার এ যুগের সাহিত্যসমালোচনার একটা বড়ো অঙ্গ—কোনো কোনো অত্যুৎসাহী সমাজবীক্ষক সাহিত্য-বিচারকের মতে সেটাই মুখ্য বিষয়।

যে সব লক্ষণ মিলিয়ে কোনো সাহিত্যিকের যুগসচেতনতার পরিমাপ করা হয়, বিভূতিভূষণের রচনায় সেগুলির বেশির ভাগই অতি দুর্লভ। শ্রেণীসংগ্রাম, সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন—এমন কি স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কেও বিভূতিভূষণের সাহিত্য নির্বাক। অপুর ধর্মঘটী কর্মীদের জায়গায় চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, হো মেয়ে-কুলিদের মজুরির স্বল্পতার জন্য মমতা প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন দু'একটি বিষয়ের উল্লেখ করে বিভূতিভূষণের সমাজচেতনা প্রমাণ করার প্রয়াস নিরর্থক। একালের সমাজতাত্ত্বিকরা সমাজের যেসব সমস্যার কথা চিন্তা করেন বিভূতিভূষণের রচনায় সেইসব সমস্যার আভাসমাত্র যেন পাওয়া যায় না। সেজন্য যদি কোনো সমাজচেতনা সম্পর্কে অত্যুৎসাহী সমালোচক বিভূতিভূষণকে জীবন-পলাতক গজদন্তমিনারবিহারী বলে অভিযোগ করতে চান তা'হলে তাঁকে বিশেষ দোষী করা যাবে না।

বিভূতিভূষণ অবশ্যই সমাজকে উপেক্ষা করেন নি। তিনি সমাজকে দেখেছেন, মানুষকে দেখেছেন—কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। একালের চিন্তানায়করা সমাজকে যে দৃষ্টিতে দেখেন বা তাঁদের মতানু-সারী লেখকমণ্ডলী সমাজের যেসব সমস্যা বা প্রবণতাকে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করতে উৎসাহী সেই সব বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল না। কোনো আদর্শবাদী গোষ্ঠীর মত বা কোনো সমাজচিন্তকের অভিমতকে সাহিত্যে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করার চেষ্টা তিনি করেন নি। মানুষের জীবন অযুততল মণিখণ্ড। তার প্রত্যেকটি তলে অসামান্য বর্ণাঢ্যতা, অন্তহীন রহস্য আছে। বিভূতিভূষণ যে তলটির দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন একালের সমাজসচেতন লেখকরা সেই তলটির সম্যক পরিচয় সম্পর্কে অনবহিত বা অনুৎসুক, অথবা তাঁদের আদর্শ

বা কল্পনাদৃষ্টিতে প্রতিভাত তলবিশেষকেই তাঁরা প্রধানতম বলে মনে করেন। 'প্রকৃতিরসিক' বিশেষণে ভূষিত করে প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখলে বিভূতিভূষণের প্রতি অবিচার করা হবে। প্রকৃতিকে ভালোবাসলেও মানুষের জীবনক্ষেত্রই তাঁর বিহারভূমি। তিনি মানুষের জীবনের ছবি এঁকেছেন। মানুষের সমাজের ছাপ তার মধ্যে আছেই। অধুনা প্রচলিত অর্থে সমাজচেতনা তাঁর রচনায় তেমন প্রখর ছিল না, কিন্তু মানবচেতনা তাঁর কথাসাহিত্যের প্রাণ।

দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য যে মানুষের মূল্যবোধের মধ্যে পরিবর্তন এনে দেয় বিভূতিভূষণ সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। 'আরণ্যক' উপন্যাসে অরণ্যবাসী এক অনার্য রাজার আবাসের বর্ণনা প্রসঙ্গে সভ্যতার মূল্যায়ন সম্পর্কে যে কথা তাঁর মনে এসেছে তা থেকে এ বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যাবে,—

"মিশরের প্রাচীন সম্রাটদিগের সমাধিস্থল থিব্‌স্‌ নগরের অদূরবর্তী 'ভ্যালি অফ দি কিংস্‌' আজ টুরিস্টদের লীলাভূমি, পাবলিসিটি ও ঢাক পিটানোর অনুগ্রহে সেখানকার বড় বড় হোটেলগুলি মরশুমের সময় লোকে গিজগিজ করে—'ভ্যালি অফ দি কিংস্‌' অতীতকালের কুয়াসায় যত না অন্ধকার হইয়াছিল, তার অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া যায় দামী সিগারেট ও চুরুটের ধোঁয়ায়—কিন্তু তার চেয়ে কোন অংশে রহস্যে ও স্বপ্রতিষ্ঠ মহিমায় কম নয় সুদূর অতীতের এই অনার্য নৃপতিদের সমাধিস্থল, ঘন অরণ্যভূমির ছায়ায় শৈলশ্রেণীর অন্তরালে যা চিরকাল আত্মগোপন করিয়াছে ও থাকিবে। এদের সমাধিস্থলে আড়ম্বর নাই, পালিশ নাই, ঐশর্য নাই মিশরীয় ধনী ফ্যারাওদের কীর্তির মত—কারণ এরা ছিল দরিদ্র, এদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল আদিম যুগের অশিক্ষিত অপটু সভ্যতা ও সংস্কৃতি, নিতান্ত শিশুমানবের মন লইয়া ইহারা রচনা করিয়াছে ইহাদের গুহানিহিত রাজপ্রাসাদ, রাজসমাধি, সীমানাজ্ঞাপক খুঁটি। সেই অপরাহ্লের ছায়ায় পাহাড়ের উপরে সে বিশাল তরুতলে দাঁড়াইয়া

যেন সর্বব্যাপী শাশ্বত কালের পিছন দিকে বহু দূরে অন্য এক অভিজ্ঞতার জগৎ দেখিতে পাইলাম—পৌরাণিক ও বৈদিক যুগও যার তুলনায় বর্তমানের পর্যায়ে পড়িয়া যায়।

দেখিতে পাইলাম যাযাবর আর্যগণ উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া স্রোতের মত অনার্য আদিম জাতি-শাসিত প্রাচীন ভারতে প্রবেশ করিতেন···ভারতের পরবর্তী যা কিছু ইতিহাস—এই আর্য সভ্যতার ইতিহাস—বিজিত অনার্য জাতিদের ইতিহাস, কোথাও লেখা নাই—কিংবা সে লেখা আছে এই সব গুপ্ত গিরিগুহায়, অরণ্যানীর অন্ধকারে, চূর্ণায়মান অস্থিকঙ্কালের রেখায়। সে লিপির পাঠোদ্ধার করিতে বিজয়ী আর্য জাতি কখনও ব্যস্ত হয় নাই। আজও বিজিত হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত অবমানিত, উপেক্ষিত। সভ্যতাদর্পী আর্যগণ তাহাদের দিকে কখনও ফিরিয়া চাহে নাই, তাহাদের সভ্যতা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, আজও করে না। আমি বনোয়ারী সেই বিজয়ী জাতির প্রতিনিধি, বৃদ্ধ দোবরু পান্না, তরুণ যুবক জাগরু, তরুণী কুমারী ভানুমতী সেই বিজিত, পদদলিত জাতির প্রতিনিধি—উভয় জাতি আমরা এই সন্ধ্যার মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি—সভ্যতার গর্বে উন্নতনাসিক আর্যকান্তির গর্বে আমি প্রাচীন অভিজাত বংশীয় দোবরু পান্নাকে বৃদ্ধ সাঁওতাল ভাবিতেছি, রাজকন্যা ভানুমতীকে মুণ্ডা কুলী রমণী ভাবিতেছি—তাদের কত গর্বের সহিত প্রদর্শিত রাজপ্রাসাদকে অনার্যসুলভ আলো-বাতাসহীন গুহাবাস, সাপ ও ভূতের আড্ডা বলিয়া ভাবিতেছি। ইতিহাসের এই বিরাট ট্রাজেডি যেন আমার চোখের সম্মুখে সেই সন্ধ্যায় অভিনিত হইল—সেই নাটকের কুশীলবগণ একদিকে বিজিত উপেক্ষিত দরিদ্র অনার্য নৃপতি দোবরু পান্না, তরুণী অনার্য রাজকন্যা ভানুমতী, তরুণ রাজপুত্র জাগরু পান্না—এক দিকে আমি, আমার পাটোয়ারী বনোয়ারীলাল ও আমার পথপ্রদর্শক বুদ্ধসিং।”

বিভূতিভূষণের উপন্যাস বা ছোটগল্পে যেসব মানুষের কাহিনী

আছে তারা প্রায় সকলেই নিম্নমধ্যবিত্ত বা দরিদ্র। কোনো সমাজ-তন্ত্র সচেতন লেখক হয়তো তাদের জীবন অবলম্বন করে শ্রেণী সংঘর্ষের চিত্র অঙ্কন করতে সচেষ্ট হতেন। যে লেখক সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষপাতী তাঁর দৃষ্টিতে জীবনের এই রূপটিই সত্য বা বাস্তব বলে মনে হবে। জীবনের এই অর্থনৈতিক বা সমাজশাসন সম্পর্কিত দিকটির মূল্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবনের এই দিকটাই যে মুখ্য বা সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য—এ কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করলেও সত্য নয়। তেমনই ফ্রয়েড প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী জীবনকে যে তত্ত্বদৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন তার মধ্যে গভীর সত্য আছে এ কথা মেনে নিলেও কথাসাহিত্যে ঐ তত্ত্বদৃষ্টির ব্যাপক প্রয়োগ ঘটলেই যে জীবনের চরম সত্যরূপ ফুটে ওঠে এ কথা স্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন কোণ থেকে জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে জীবনের রূপ বিভিন্ন বলে মনে হবেই। সেগুলির যে কোন একটি রসায়িত হয়ে সহৃদয় পাঠকের অন্তর স্পর্শ করলেই সাহিত্যসৃষ্টি সার্থক হয়ে ওঠে।

বিভূতিভূষণের রচনায় জীবনের দু'টি পরিচয় সুস্পষ্ট। তাঁর কল্পনায় একদিকে মানুষের হৃদয়গত সম্পর্ক ফুটে উঠেছে, অন্য দিকে আছে দূরায়ণ-বাসনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের দ্বৈধী আকুতিকে ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্কাইলার্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন—বিভূতিভূষণের কল্পনা রবীন্দ্রনাথের কল্পনার মতো সুদূরচারী হয়ে পরম সত্যের ধ্যানে আত্মপ্রসারী হয়নি; উপরন্তু তাঁর কল্পনার যে অংশ মানবসম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে গভীর জীবনরসের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজসম্পর্কের দিকে সচেতনভাবে দৃষ্টিপাত না করলেও বিভূতি-ভূষণের রচনায় জীবনের যে রূপের পরিচয় পাওয়া যায় তা বাস্তববাদ নিরপেক্ষ হলেও সজীব, সমাজসচেতনতার দাবি মেটাবার নাম করে তিনি আসল জীবনরস পরিবেশনে ফাঁকি দেন নি।

সেজন্য বিভূতিভূষণ জীবনের যে অংশের ছবি এঁকেছেন সেই অংশের রূপ কোথাও ধোঁয়াটে হয়ে ওঠে নি। সেই জন্যই তাঁর

রচনায় সমাজের—বিশেষ করে অনাগরিক সমাজের একেবারে খাঁটি পরিচয় পাওয়া যাবে। শ্রেণীবিরোধকে গল্পের বিষয়বস্তু করে না তুললেও শ্রেণীগত বৈষম্য সম্পর্কে তাঁর চেতনার অভাব ছিল না। অপু বা জিতুর জীবনে এই বৈষম্যের মর্মান্তিক পরিচয় পাওয়া যায়। 'অনুবর্তন' উপন্যাসে শ্রেণীবিরোধের আভাস সুস্পষ্ট—সমাজতাত্ত্বিক কোনো লেখকের হাতে পড়লে হয়তো ঐ গল্প সমাজতত্ত্বের ইতিকথায় পরিণত হত। বিভূতিভূষণ সমাজের অত্যন্ত দরিদ্র থেকে আরম্ভ করে উচ্চমধ্যবিত্ত পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মিশেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে—বিশেষ করে তাঁর ছোটগল্পে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ছবি ফুটে উঠেছে। বিভূতিভূষণ তাদের জীবনরসের স্বাদ পেতে উৎসুক হয়েছিলেন বলেই সমাজতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামান নি। তাঁর জীবনরসপিপাসা ঐকান্তিক ছিল বলেই তিনি যে জীবনের ছবি এঁকেছেন তার মধ্যে দেশ-কালের অব্যাকৃত রূপ ফুটে উঠেছে। এদিক থেকে বিচার করলে তাঁর রচনার মধ্যে তাঁর সমাজচেতনার গভীরতার পরিচয় পাওয়া যাবে—অবশ্য এই চেতনা বৌদ্ধিক নয়, তাঁর অনুভূতির সঙ্গে এই চেতনা মিশে গেছে।

বিভূতিভূষণের ইতিহাসচেতনা সম্পর্কেও ঐ একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যাবে। তিনি উনবিংশ শতকের শেষ অংশ থেকে বিংশ শতকের প্রায় মধ্যভাগের কথা বলেছেন। এই প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে মানুষের জীবনধারার যেমন পরিবর্তন ঘটেছে তেমনই মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্বকালের অপেক্ষাকৃত সরল জীবনভঙ্গি একালে কুটিল পথ ধরেছে, সহজ বিশ্বাসের স্থান নিয়েছে সন্দেহ আর অবিশ্বাস, প্রশান্তির বদলে এসেছে অশান্ত অসহিষ্ণুতা। বিভূতিভূষণ সচেতনভাবে এই পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করে কালধর্মের লক্ষণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেন নি, কিন্তু ইতিহাসের ধারায় বাঙালীর জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে তার পরিচয় তাঁর

রচনায় সুপ্রচুর। 'পথের পাঁচালী' আর 'আচার্য কৃপালনী কলোনী'র মধ্যে জীবনভঙ্গির পার্থক্য সুস্পষ্ট। 'অশনি সংকেত' উপন্যাসটির উল্লেখ অবশ্যই করা যেতে পারে। 'ইছামতী' উপন্যাসের মধ্যেও ইতিহাস-চেতনার ছাপ আছে—এখানেও তিনি পরিবর্তমান কালের ছবি এঁকেছেন; হয়তো এই উপন্যাসটি লেখার সময় সমকালীন লেখকদের মধ্যে ইতিহাস সম্পর্কে যে কৌতূহল বা ঔৎসুক্য দেখা দিয়েছিল তার প্রভাবও কিছু আছে। তবে সমাজচেতনার মতোই ইতিহাসচেতনাও মুখ্য বা বুদ্ধিজাত নয়, বিভূতিভূষণের অনুভূতি-নির্ভর কল্পনার অন্তর্লীন বোধ মাত্র

৪

মানবসম্পর্ক : প্রেম

বিভূতিভূষণের উপন্যাসের বেশির ভাগ নায়কের চরিত্রের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য উদাসীনতা। অপু থেকে আরম্ভ করে ভবানী পর্যন্ত প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রের মধ্যে তীব্র আসক্তির অভাব লক্ষ্য করা যায়। এই আসক্তির অভাব অবশ্যই নিবৃত্তির দ্যোতক নয়। বিভূতিভূষণের উপন্যাসের চরিত্র মানুষকে ভালোবেসেছে—কিন্তু ঐ ভালোবাসাকেই সর্বস্ব বলে মনে করে নি। তাদের প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা বৈরাগ্য আছে যে তারা বার বার বন্ধন ছেড়ে চলে গেছে।

বিভূতিভূষণের এই সব চরিত্রের মূলে যে তাঁর নিজেরই স্বভাবগত কবিচিত্ত সক্রিয় তা অনুমান করা কঠিন হয় না। শুধু শিল্পীসুলভ বৈরাগ্য নয়, কবি বিভূতিভূষণের অন্তরই ছিল মোহশূন্য—মানবিক কামনা তাঁর কবিচিত্তে তেমন তীব্র ছিল না। তাঁর গল্প-উপন্যাসে হৃদয়াবেগ সাধারণত উদগ্র হয়ে ওঠে নি।

তাঁর এই বিশেষ মনোধর্মটির জন্য দু'টি কারণ নির্দেশ করা হয়ে থাকে। প্রথমত, বিভূতিভূষণ প্রকৃতিপ্রেমিক—নিসর্গপ্রেম তাঁর অন্তরে নিরতিশয় গভীর ছিল বলেই মানবপ্রেম তাঁর হৃদয়ে প্রবল হতে পারে নি। দ্বিতীয়ত, বিভূতিভূষণের কবিচিত্ত অপরিণত—তা শৈশব আর কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পৌছয় নি; সেইজন্য তাঁর কল্পিত চরিত্রের মধ্যে শৈশব বা কৈশোরের সহজ ভালোলাগা আছে, যৌবনসুলভ বলিষ্ঠ কামনা নেই।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেম সম্পর্কে মতদ্বৈধতা থাকতে পারে না। এই প্রকৃতিপ্রেম তাঁর অন্তরে মানবিক প্রেমকে প্রশমিত করেছে—এই অনুমান অসঙ্গত হবে না। তবে মানুষ আর প্রকৃতি যে বিভূতিভূষণের রচনায় কখনও পরস্পর প্রতিযোগী হয়ে ওঠেনি এ কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। বরং বলা যায় যে, বিভূতিভূষণের কবিচিত্ত প্রকৃতির মধ্যে স্বচ্ছন্দ বিহার করেছে আবার মানুষের মধ্যে ফিরে আসতে উৎসুক হয়েছে। প্রকৃতি বিভূতিভূষণের কল্পনার বিহঙ্গের বিচরণভূমি, মানুষের নীড়ের আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথের বা শেলীর মতো সর্বাতিশায়ী রোমান্টিক কল্পনা বিভূতিভূষণের ছিল না—প্রকৃতির মধ্যে অফুরন্ত আনন্দের সন্ধান পেলেও মানুষের জীবনের মধ্যে তিনি অমৃতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। প্রকৃতির প্রেম তাঁকে কিছু পরিমাণে নিরাসক্ত (নির্মোহ বলাই সঙ্গততর) করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। হৃদয়াবেগের উদগ্র প্রকাশ বিভূতিভূষণের রচনায় যে ক্বচিৎ দেখা যায় এর জন্য তাঁর স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিপ্রেমকেও দায়ী করা যেতে পারে। তাঁর অনুভূতি প্রকৃতির বিস্তৃততর ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হওয়ায় তাঁর কবিচিত্তে যে অপেক্ষাকৃত প্রশ্রান্তির ভাব এসেছিল এ কথা অস্বীকার করা চলে না।

বিভূতিভূষণ সম্পর্কে দ্বিতীয় অভিমতটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কবিচিত্ত পরিণত হয়নি বলেই রচনায় যৌবনসুলভ আবেশ অথবা প্রৌঢ়সুলভ মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় না—এই অভিযোগ যে

কোনো বড়ো সাহিত্যিকের পক্ষেই তাঁর প্রতিভার উৎকর্ষ সম্পর্কে সন্দেহের নিদর্শন। বিভূতিভূষণের রচনায় যথার্থ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেলেও এই অভিমতটির প্রতিপাদক একাধিক প্রমাণ তাঁর রচনা থেকেই সংগ্রহ করা যেতে পারে। বিভূতিভূষণের রচনায় শৈশবের আনন্দচ্ছবি আছে। বাৎসল্যের যে অপূর্ব ছবি তিনি এঁকেছেন বা শিশুমনের বিচিত্র বিকাশের যে পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। 'পথের পাঁচালী'র অনেক অংশ রলঁ্যার 'জঁা ক্রিস্তাফ' উপন্যাসের শৈশবচিত্রের চেয়ে মনোহারী—অবশ্য 'পথের পাঁচালী'র মূল উৎস দৃষ্টি আর 'জঁা ক্রিস্তাফ'-এর প্রবণতা শ্রুতির দিকে। জঁা ক্রিস্তাফ পরে পূর্ণাঙ্গ পুরুষ হয়ে উঠেছে—কিন্তু ঐ পরিপূর্ণ পৌরুষের ছবি বিভূতিভূষণের রচনায় নেই। তাঁর উপন্যাস-গুলির উল্লেখযোগ্য চরিত্র অপু, জিতু বা ভবানীকে কোনো সময় যৌবনদীপ্ত মানুষ বলে মনে হয় না। ঐ সব চরিত্রের মধ্যে কৈশোরই যেন শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে আছে। কৈশোরের কল্পনা, কিশোরের রোমান্টিক প্রেমই এই চরিত্রগুলির বিশেষ উপভোগ্য বিষয়।

বিভূতিভূষণের কবিচিত্তে কৈশোরের অমলিন সৌন্দর্য আর সজীবতা একটা স্থায়ী সম্পদে পরিণত হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটি তাঁর প্রতিভার অপরিণতির লক্ষণ এই অভিযোগ বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায় না। যৌবনের লক্ষণ যে প্রেম তা তাঁর কথাসাহিত্যে একাধিকবার এসেছে। অবশ্য এই প্রেমেও অনেক সময় কৈশোরক আকুলতা থেকে গেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে অপু-অপর্ণার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। অপর্ণাকে প্রথম দর্শন, অপর্ণার সঙ্গে অপুর বিয়ে, দু'জনের গৃহস্থালী কৈশোরের স্বপ্নেরই ছবি—অপর্ণার মৃত্যুও অপুর কাছে প্রথমটা যেন খেলাঘরের খেলাভাঙ্গার মতো মনে হয়েছে। জিতুর প্রেমও যেন একটা ভাবকল্পনা—ছোট বউঠাকরুন, মালতী, হিরণ্ময়ী এরা তার জীবনে যখন এসেছে তখন জিতুর রক্তস্রোত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নি, বরং সব ক'টি চরিত্রের প্রেম স্বপ্নের ঘটনার মতো তাঁর জীবনে

সহজে মিশে গেছে। ভবানীর প্রৌঢ় বয়সের প্রেমও কৈশোরক কল্পনার একটি ভাবগম্ভীর রূপ।

এবার প্রেমের কয়েকটি ভিন্ন প্রকারের নিদর্শনের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'দেবযান' উপন্যাসে যতীন আর পুষ্পের প্রেম কৈশোর-স্বপ্ন, কিন্তু আশা আর যতীনের সম্পর্কের মধ্যে যে একটা গভীর আসক্তি ছিল তা সহজেই অনুভব করা যায়। 'দুই বাড়ি' উপন্যাসে নিধিরাম আর মঞ্জুর প্রেমের মধ্যে নবযৌবনের অনুরাগই লক্ষ্য করা যায়। 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসে বিপিন আর মানীর প্রেম বা বিপিনের প্রতি শান্তির গোপন প্রেম নিছক কৈশোরস্বপ্ন নয়—শ্রেণীগত ব্যবধান বা ঘটনা পারম্পর্য দাবদাহকে ঠেকিয়ে রেখেছে। এ ছাড়াও এই উপন্যাসে আরও দু'টি-তিনটি প্রেমের চিত্র আছে। বিপিনের বাবা বিনোদ চাটুজ্জে আর কামিনীর প্রেম নেপথ্যবর্তী হলেও উল্লেখযোগ্য। বিপিনের বিধবা বোন বীণার জীবনে যৌবনের নবানুরাগের তীব্রতা দেখা যায়—অবশ্য এখানে প্রণয়কাহিনী মাঝপথে থেমে গেছে। প্রেমের উদগ্রতার সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন স্কুলের পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী আর মতি বাগদিনীর ইতিবৃত্ত। বিশ্বেশ্বর মতি বাগদিনীর প্রেমে আত্মহারা হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করতে দ্বিধা বোধ করেন নি।

এই সর্বনাশা প্রেম 'অথৈ জল' উপন্যাসের মধ্যে এক আশ্চর্য রূপ নিয়েছে। এই উপন্যাসের নায়ক শশাঙ্ক গ্রামের এক যুবক ডাক্তার। গ্রামে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রবল, বিশেষত দুর্নীতির উপর সে একেবারে খড়গহস্ত। কঠোর নীতিবাগীশের মতো সে সমাজ শাসন করেছে। কিন্তু সে-ই শেষপর্যন্ত এক খেমটাওয়ালী কিশোরীর প্রেমে মজেছে। ঐ কিশোরীর প্রেম যে তাকে কী করে ধীরে ধীরে উন্মাদ করে তুলেছে বিভূতিভূষণ তা স্তরে স্তরে দেখিয়েছেন। ঐ মেয়েটির প্রতি তীব্র আকর্ষণ—তা প্রেম বা মোহ যা-ই হোক না কেন—শশাঙ্ককে সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রচ্যুত করেছে। সমাজের কথা বা স্ত্রী আর সন্তানদের কথা একেবারে ভুলে গিয়ে সে ঐ খেমটাওয়ালী

মেয়েটির সঙ্গে কলকাতায় বাসা ভাড়া করে থেকেছে, এমন কি তার সঙ্গে তল্পিদার হয়ে বিভিন্ন আসরে যেতেও কুণ্ঠা বোধ করে নি।

প্রণয়ের যে চিত্র এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে তার মধ্যে দৈহিক সম্পর্কের উল্লেখ না থাকলেও ঐ চিত্রকল্পনায় কৈশোরের স্বপ্নাবেশ নেই। যে তীব্র আকর্ষণ শশাঙ্ককে জ্ঞানহারা করে ফেলেছে তা যৌবনেই সম্ভবপর। বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসের কথাবস্তু অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছিলেন বা কল্পনায় সৃষ্টি করেছেন, তা জানা যায় না, তবে তিনি যে প্রেমের কাহিনী লিখেছেন তা দেহজ আকর্ষণেরই ইতিবৃত্ত। তার মধ্যে প্লাতোনিক প্রেমের আদর্শায়ন নেই ; নিধিরাম আর মঞ্জুর প্রেমের মনোবেদনায় সমাপ্তির তুলনায় এখানে জ্ঞানহারা মোহের পরিণাম ভয়ংকর—তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপে কাহিনীর অবসান ঘটায় নায়ক শশাঙ্ক কোনোমতে রক্ষা পেয়েছে এই মাত্র। 'অপরাজিত' বা 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসের মধ্যে দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ না রেখে শেষ দিকের রচনা অন্বেষণ করলে এমন অনেক প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে যেখানে প্রেম সম্পর্কে বিভূতিভূষণের দৃষ্টি পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একটি অনুমান কল্পনাপ্রবণ পাঠকদের কাছে নিবেদন করছি। বিভূতিভূষণের প্রথমা স্ত্রী বিবাহের প্রায় বৎসর কাল পরে মারা যান। তারপর বিভূতিভূষণ সংসারের দিক থেকে প্রায় উদাসীনের মতো দিন কাটান। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর প্রায় বাইশ বছর পরে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ। এই তারিখটি বিভূতিভূষণ সম্পর্কে আলোচনার পক্ষে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। এই তারিখের আগে লেখা উপন্যাস—পথের পাঁচালী, অপরাজিত, দৃষ্টিপ্রদীপ, আরণ্যক আর আদর্শ হিন্দু হোটেল। এই উপন্যাসগুলিতে বিভূতিভূষণের প্রতিভার স্বাক্ষর সম্পর্কে মতদ্বৈধ থাকতে পারে না—তাঁর সম্পর্কে সাধারণ পাঠক বা সমালোচকের ধারণা প্রধানত এই কয়খানি উপন্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় বিবাহের পর লেখা উপন্যাস—বিপিনের সংসার,

দুই বাড়ী, অনুবর্তন, দেবযান, কেদার রাজা, অথৈ জল, ইছামতী আর অশনি সংকেত।

অভিনিবিষ্ট পাঠকমাত্রেই অনুভব করবেন যে, পরের উপন্যাস-গুলিতে বিভূতিভূষণ প্রেমের চিত্র একটু স্বতন্ত্রভাবে এঁকেছেন। প্রথম দিকের উপন্যাসগুলিতে যে প্রেমের রূপায়ণ আছে তার মধ্যে স্বাদুতা থাকলেও তীব্রতা নেই; শেষের দিকের রচনায় প্রেমের—তা সে প্রেম মানবিক বা দৈহিক আকর্ষণ যা-ই হোক না কেন, তার মধ্যে তীব্রতার পরিচয় অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। প্রথম যুগে বিভূতিভূষণের রচনায় প্রেমের চিত্র বিরল। বিভূতিভূষণ যেন এ বিষয়ে কিছুটা সংকোচ অনুভব করেছেন, অন্ততঃপক্ষে এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ প্রবল নয়। প্রেমকথা চিত্রণে তিনি বিশেষ আগ্রহী না হলেও শেষের দিকে প্রেমের বর্ণনা নিঃসঙ্কোচ—অবশ্য তাঁর স্বভাবগত শালীনতাবোধ সেখানে প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে, তাঁর প্রেমকাহিনীর মধ্যে বেলেল্লাপনার স্থান নেই।

এ অনুমান হয়তো অসঙ্গত হবে না যে, প্রথম বিবাহ আর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর মাঝখানের সময়টুকুর মধ্যে প্রথম যৌবনের যে স্বপ্নমণ্ডিত আবেশ বিভূতিভূষণের অন্তর জুড়ে ছিল তাই তাঁর প্রথম দিকের রচনায় স্থান পেয়েছে। সংসারে অপেক্ষাকৃত অনাসক্তির জন্যই হয়তো নর-নারীর প্রেম তাঁর কল্পনাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে নি, প্রকৃতিপ্রেমের গভীরতাও এর অন্যতম কারণ হতে পারে। শেষ যৌবনে দ্বিতীয় বিবাহের পর যৌবনসুলভ সংরাগ তাঁর চিত্তকে উদ্বেজিত করেছে। তাঁর কবিকল্পনাও প্রেমের তীব্রতর আবেগকে কাহিনীর মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে উৎসুক হয়েছে। জীবনে অকালে ছেদ না এলে হয়তো মানবের আদিম সম্পর্কটির গভীরতর রূপের পরিচয় তাঁর রচনায় পাওয়া যেত। 'ইছামতী'র প্রসন্ন আমীনের অকাল-প্রণয় আর ভবানীর শান্ত প্রেম—এই দুই চিত্র কি বিভূতিভূষণের কল্পনার সম্ভাব্য পরিণামের দ্যোতক নয়?

··৫··

মানবসম্পর্ক : বাৎসল্য

বিভূতিভূষণের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন তাঁরা অনুভব করেছেন যে বিভূতিভূষণের অন্তরে একটি চিরশিশু ছিল। শিশুর অনাবিল সারল্য, সহজ চেতনা, বিমুগ্ধ কৌতূহল আর আত্ম-ভোলা ভাব তাঁর সহজাত ছিল। তাঁর রচনার মধ্যে ঐ যে ক'টি ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তার মূল ছিল তাঁর স্বভাবে। তিনি যেন শিশুর মতোই একান্ত সহজে জগৎকে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন; তাঁর মধ্যে আসক্তি ছিল না অথচ স্বাভাবিক আগ্রহের অভাব ছিল না।

শিশুর প্রতি বিভূতিভূষণের পক্ষপাত ছিল সচেতন। 'পথের পাঁচালী' লেখার সময় তিনি যে কেবল শিশুর জীবনের ছবিই আঁক-ছিলেন এমন নয়, শিশু তাঁর কবিকল্পনাকে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল। এই সময়ে ভাগলপুরে থাকাকালে এক দিনের (২৮. ৮. ১৯২৫) দিনলিপিতে শিশু সম্পর্কে তাঁর একটি অপূর্ব চিত্রময় কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়,—

"সব ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েগুলি পৃথিবীতে নেমে আসছে, নীল অকূল থেকে পৃথিবীর মাটির তীরে। মুখে তাদের প্রাণকাড়া দুষ্টুমির হাসি, চোখে দেবদূতের সরলতা। কোঁকড়া চুলে ঘেরা টুকটুকে মুখগুলি—সকলেরই হাতে ছোট্ট ছোট্ট সব মশাল।

চন্দন কাঠের তৈরী চন্দন কাঠের গুঁড়ো দিয়ে মশলা বাঁধা মশাল-গুলি, জ্বললে গন্ধে দিক আমোদ করে।

ওদের দিকে কেউ চাইছে না। বাঁশবনের অন্ধকার ছায়ায় সারাদিন ওদের কাটল, রাত আসছে, কিন্তু ওদের মশালগুলো কে জ্বালবে?

অনেক লোকে জ্বালতে এল, কেউ জ্বেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল, নিবে যে গেল তা পিছন ফিরে চেয়েও দেখলে না। কেউ বহুবার চেষ্টা করেও জ্বালাতে পারলে না, কেউ চেষ্টা করলে না জ্বালবার। কেউ চোখ নীচু করে চেয়েও দেখলে না যে শিশুদের হাতে মশাল আছে।

অথচ সব সময় শিশুরা অনন্ত নির্ভরপূর্ণ মিনতির চোখে চেয়ে রয়েছে সকলেরই দিকে, কে তার মশাল জ্বেলে দেবে? কে সে নিপুণ অথচ প্রেমিক মশালচী?

কত শিশু বুঝতে না পেরে আশাভঙ্গ হয়ে নিজেদের হাতের মশাল ফেলে দিলে, হয়ত যা জ্বলতে পারত অতি সুন্দর, যুগ যুগ ধরে বিশ্বের দিগ্‌দিগন্ত যে সৌরভে আকুল হয়ে উঠত, তা অনাদৃত হয়ে পড়ল কাদায়। অবোধ শিশুদের বলে দেবার, দেখিয়ে দেবার, মশাল তুলে জ্বেলে দেবার তো কেউ নেই।

গহন অরণ্যের অন্ধকার বীথি বেয়ে কে একজন আসছে। বাঁশবনের ছায়া স্নিগ্ধ হয়েছে কার সুন্দর মুখের হাসিতে? তার হাতে মস্ত বড় মশাল, শুভ্র আলোয় সমস্ত অন্ধকার আলো হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

গহনান্ধকার বেণুবীথির অজানা ওপার থেকে সে এসেছে চির-রাত্রির অন্ধকার দূর করতে। ভগবানের বিশ্বের সে একজন মশালচী—

আয়রে, আয় আয় আয়।

হাসিমুখে কোঁকড়া চুল দুলিয়ে, আলোর জ্যোতিতে আকৃষ্ট হয়ে শিশু পতঙ্গের দল সব ছুটে এল ওদের ছোট্ট ছোট্ট চন্দন-মশলার বাঁধা মশাল। চার ধার ঘিরে কাড়াকাড়ি, সবাই আগে চায়।

কত ধৈর্যের সঙ্গে নতুন মশালচী আলো জ্বালতে লাগল, যাদের নিবে যাচ্ছিল তাদের বার বার ফুঁ দিয়ে—কত অসীম ধৈর্যের সঙ্গে। সকলেরই জ্বলল।

ছোট্ট ছোট্ট জ্বলন্ত মশাল হাতে শিশুরা নাচতে নাচতে আনন্দ-ভরা হাসিমুখে অন্ধকার কুঞ্জপথের এদিকে ওদিকে বেরিয়ে সব চলে

গেল। আর কোথাও কেউ নেই। অপর কোন অরণ্যানীর গহন নীরব পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর করতে, অপর কোন অনাগত বংশধরদের হাতের মশাল অমনি করে জ্বেলে দিতে। নিত্যকালের ওরা হল যে মশালচী।"
—স্মৃতির রেখা।

. শিশু সম্পর্কে তাঁর কল্পনা ছ'টি ধারায় বয়ে গেছে। কখনও তিনি শিশুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবনের দিকে চোখ মেলেছেন, আবার কখনও তিনি যেন শিশু থেকে স্বতন্ত্র হয়ে শিশুর জীবনের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছেন। শিশুর জগতের যে ছবি 'পথের পাঁচালী' বা 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এর প্রথম অংশে বা কোনো কোনো ছোটগল্পে আছে তার মধ্যে বিভূতিভূষণের শিশুর সঙ্গে একাত্মতাবোধ এক পরম আশ্চর্য। যে অনুভূতি বিভূতিভূষণের প্রতিভার সব চেয়ে বড়ো সম্পদ এখানে তার চরম নিদর্শন পাওয়া যায়। শিশুর জগতের ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি যেন শিশু হয়ে গেছেন, অথচ তাঁর স্বকীয় কবি-দৃষ্টি সেখানে অক্ষুণ্ণ আছে। এ যদি শিল্পক্ষমতার নিদর্শন হয়, তা'হলে বিশ্বসাহিত্য এতখানি নৈপুণ্যের পরিচয় খুব অল্পই পাওয়া যাবে। মনে হয়, বিভূতিভূষণ একটা অর্ধসচেতন অনুভূতির প্রেরণায় শিশুর জগৎ সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

শিশু সম্পর্কে তাঁর কবিচিত্ত যেখানে সচেতন সেখানে তিনি মূলত বাৎসল্য রসের আশ্রয় নিয়েছেন। 'পথের পাঁচালী'র হরিহর বা সর্বজয়ার মধ্যে এই বাৎসল্য চরিত্রের অঙ্গ হয়ে উঠেছে—সর্বজয়ার ক্ষেত্রে এই বাৎসল্য 'অপরাজিত' পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। বিভূতি-ভূষণ শিশুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যে শিশুবিশ্ব রচনা করেছেন তা এক অভিনব সৃষ্টি, কিন্তু এই বাৎসল্য রস বাংলা সাহিত্যের চিরায়ত ধারার একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অবশ্য এই বাৎসল্য কেবলমাত্র একটি অনুভূতিগ্রাহ্য রসে সীমাবদ্ধ থাকে নি, বিভূতিভূষণের কল্পনায় এই বাৎসল্য শেষপর্যন্ত যেন একটি তত্ত্বে পরিণত হতে চলেছে। তাঁর শেষ দিকের লেখা থেকে ছ'টি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে। 'কুশল

পাহাড়ী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'খেলা' গল্পে মতিলাল আর তার শিশু পুত্রের মধ্যে যে নিগূঢ় সম্পর্কের কল্পনা আছে তার মূলে বাৎসল্য থাকলেও নিছক সন্তান-বাৎসল্যকে অতিক্রম করে একটা তত্ত্ব যেন উঁকি দিচ্ছে। মতিলালের একটি চিন্তা উদ্ধার করা যেতে পারে।—

"এই সব স্থূলবুদ্ধি লোকে কি বুঝবে—খোকা তাকে কতখানি ভালবাসে বা খোকাকে সে কতখানি ভালবাসে। এদের কাছে বলে লাভ নেই। পিতাপুত্রের সেই সূক্ষ্ম অবিচ্ছেদ্য ভালবাসার গূঢ় তত্ত্ব, যা মুখে বলা যায় না, যার বলে এক বছরের শিশু তার অত বয়সের বড় বাপের মনের ভাব বুঝতে পারে, সে জিনিসের ব্যাখ্যা যার তার কাছে করে কি হবে?"

'ইছামতী' উপন্যাসে শিশু যে তত্ত্বের আকার নিয়েছে তা আরও সুস্পষ্ট। এই উপন্যাসের নায়ক ভবানী প্রকৃতিতে দার্শনিক—অবশ্য তার দর্শন কবিসুলভ কল্পনাই। তাঁর নিজের শিশুপুত্রকে অবলম্বন করে তাঁর অন্তরে যেসব ভাব-কল্পনা জেগেছে তার মূলে বিভূতি-ভূষণের চিন্তা বা কল্পনা অবশ্যই আছে। ভবানী শিশুপুত্রকে অবলম্বন করে অধ্যাত্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। একটি অংশ,—

"এই শিশু অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ, সুতরাং সেই অগ্নিই নয় কি? তিনি নিজেও তাই নয় কি? এই বনঝোপ, এই পাখীও তাই নয় কি?

এই নিষ্পাপ শিশুর হাসি ও অর্থহীন কথা অন্য এক জগতের সন্ধান নিয়ে আসে তাঁর কাছে। এই শিশু যেমন ভালবাসলে তিনি খুশি হন, তিনিও তো ভগবানের সন্তান, তিনি যদি ভগবানকে ভালোবাসেন, ভগবানও কি তাঁর মত খুশি হন না।...

এই শিশুর সঙ্গ ওদের চেয়ে কত ভালো, এ মিথ্যে বলতে পারে না, বিষয়ের প্রসঙ্গ ওঠাবে না। পরনিন্দা পরচর্চা এর নেই, একটি সরল ও অকপট আত্মা ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে এসে সবেমাত্র ঢুকেচে অনন্ত লোক থেকে, পৃথিবীর কলুষ স্পর্শ করেনি। কত দুর্লভ এদের সঙ্গ, সাধারণ লোকে কি জানে?"

এই চিন্তাটি বৈষ্ণবীয় বাৎসল্যরসের সাধনার সংকেত নয়—বিভূতি-ভূষণ বৈষ্ণবের মতো শিশুকে ভগবানের প্রতীক বা প্রত্যক্ষ রূপ বলে স্বীকার করে বাৎসল্যরসাত্মক ভক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হতে চান নি। শিশু ভগবৎসাধনার একটি অবলম্বন, তাঁর চিন্তা যেন খ্রীষ্টের একটি উপদেশের সগোত্র।

'Verily I say unto you, Except ye turn, and become as little children, ye shall in no wise enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven. And whosoever shall receive one such little child in my name receiveth me.' —Saint Mathew, Chapter XVIII.

শিশু তাঁর কল্পনাদৃষ্টিতে সাধনার উত্তরসাধক। শিশুকে ভালোবেসে তার মতো হতে পারলে চিত্ত মলিনতা থেকে মুক্ত হয়ে ভগবৎমুখী হবে। অবশ্য প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণ শিশু আর প্রকৃতিকে একটি অখণ্ড কল্পনার সূত্রে গ্রথিত করতে উৎসুক হয়েছেন,—

"ভবানী বাঁড়ুজ্জে মুগ্ধ হয়ে ভাবেন, কোন মহাশিল্পীর সৃষ্টি এই অপরূপ শিল্প, এই শিশুও তার অন্তর্গত। এই বিপুল কাকলীপূর্ণ অপরাহ্ণে, নদীজলের স্নিগ্ধতায় শ্রীভগবান বিরাজ করচেন জলে স্থলে, ঊর্ধ্বে, অধে, দক্ষিণে, উত্তরে, পশ্চিমে, পূবে। যেখানে তিনি, সেখানে এমন সুন্দর শিশু অনাবিল হাসি হাসে, অমন সুন্দর বসন্তবৌরি পাখীর হলুদ রংয়ের দেহে ঝলক ফুটে ওঠে। ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে বনকলমী ফুল ঐ রকম ফোটে জলের ধারে ঝোপে ঝোপে। তাঁর বাইরে কি আছে? জয় হোক তাঁর।"—ইছামতী।

'পথের পাঁচালী' বা 'অপরাজিত'-এর মধ্যে অপুকে অবলম্বন করে শিশুর যে জীবনচিত্র আঁকা হয়েছে তার মূলে বিভূতিভূষণের নিজের

অভিজ্ঞতাই ব্যক্ত হয়েছে। নিজের শৈশব-স্মৃতি বা শৈশব-কল্পনাকেই তিনি শিল্পের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ করে পেতে চেয়েছেন। হৃদয়ের সরসতা অবশ্যই যৌবন বয়সেও শিশুর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার দুর্লভ শক্তিকে সঞ্জীবিত রেখেছিল। কিন্তু এই দু'টি উপন্যাসের মধ্যে হরিহর বা সর্বজয়ার যে বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায় তার মূলে বিভূতিভূষণের কল্পনাই সক্রিয়; কাজলের প্রতি অপুর ভালোবাসা সম্পর্কেও ঐ কথা বলা যায়। ঐ কালে বাৎসল্য সম্পর্কে তাঁর স্বকীয় অনুভূতি ছিল না—সহানুভূতি আর কল্পনাই তাঁর সহায়ক হয়েছে। অবশ্য ঐ সহানুভূতির গভীরতাই তাঁর সৃষ্টিকে সত্য করে তুলেছে। 'কুশল পাহাড়ী'র 'খেলা' বা 'সীতানাথের বাড়ী ফেরা', বিশেষ করে 'ইছামতী'র মধ্যে বাৎসল্যের যে চিত্র আছে তার মূলে তাঁর অভিজ্ঞতা অর্থাৎ স্বকীয় অনুভূতিই ক্রিয়াশীল। এখানেও অবশ্য কল্পনা ছিল, কিন্তু ঐ কল্পনা তাঁর অনুভূতিকেই বিচিত্র রূপময় করে তুলেছে। সম্ভবত সেই জন্যই অনেক অংশে আবেগের কিছুটা তীব্রতা অনুভব করা যায়। জীবনগত অনুভূতি উপলব্ধিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

..................................৬..................................

মানবসম্পর্ক : সখিত্ব

বৈষ্ণব সাহিত্যের কল্যাণে সখ্য শব্দটি বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত—সখ্যরসও যে একটি বিশিষ্ট ভাব বা তত্ত্বকে অবলম্বন করে আছে বাঙালীর অন্তরে তার রূপও সুপ্রতিষ্ঠিত। সেজন্য সমার্থক অথচ বাংলায় অল্পপ্রযুক্ত সখিত্ব শব্দটি ব্যবহার করা হল—শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ অনুসরণ করলে বিভূতিভূষণের মানবচেতনার পরিচয় স্ফুটতর হবে বলে মনে হয়।

বিভূতিভূষণ সখ্যরসের ছবি অবশ্যই এঁকেছেন—'পথের পাঁচালী,' 'অপরাজিত' থেকেই সখ্যরস সৃষ্টির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভিন্নাকৃতি 'সখিত্ব' শব্দটি ব্যবহারের উদ্দেশ্য এই যে, বিভূতিভূষণ যে দৃষ্টিতে মানুষের দিকে চেয়ে ছিলেন তার মূলগত ভাবটি ঐ শব্দটিতে আরও বেশি করে অনুধাবন করা যাবে, বিভূতিভূষণ মানুষকে যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তা সখার দৃষ্টি। ঐ দৃষ্টির মধ্যে শিল্পীর নিরাসক্তি কিছু পরিমাণে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সখার পক্ষপাত শিল্পী-সঙ্গত সংযমের বাঁধ অতিক্রম করেছে। বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসে, বিশেষত তাঁর ছোটগল্পগুলিতে মানুষের পরিচয় দিতে চেয়েছেন। ঐ পরিচয়কে সত্য করে তোলার আগ্রহই তাঁর লেখায় বড়ো হয়ে উঠেছে। এজন্য তাঁর রচনা কোথাও কোথাও শিল্প হিসাবে হয়তো নিখুঁত হয়নি, কিন্তু তাঁর হৃদয়বত্তার পরিচয় তাতে লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি।

সখার দৃষ্টিও প্রেমের দৃষ্টি। বিভূতিভূষণের অন্তরে মানুষের জন্য যে সখিত্ব বোধ জেগেছিল তার প্রেরণায় তিনি মানুষের হাসিকান্নামাখা জীবনের সঙ্গে মনে মনে একাত্মতা অনুভব করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রকৃতিতে অনাসক্তি বা নির্মোহ থাকায় ঐ সখিত্ব বা প্রেম সাধারণত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নি, কিন্তু ঐ হার্দিক চেতনাটি তাঁর রচনার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে। ঐ চেতনাটি থাকার জন্য একদিকে যেমন শিল্পকর্মের দিকে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল না, তেমনই তিনি কুশলী মনোবিজ্ঞানীর মতো মানুষের হৃদয়কে চিরে চিরে দেখাতে চান নি। তিনি কোনো চরিত্রকে বিশ্লেষণ করতে চান নি; বরং তিনি মানুষকে একটি অখণ্ড দৃষ্টি দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে উৎসুক হয়েছিলেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বিভূতিভূষণ সমগ্র মানুষকে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেন নি; পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তাঁর রচনায় পাওয়া যাবে না। তিনি কোনো বিশেষ মানুষের দিকে যখন চেয়েছেন, তখন তাঁর যে রূপটি তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, তিনি তাঁর

সেই রূপটিকেই জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছেন। ঐ রূপ বা পরিচয়ের অন্তরালে কোন গোপন রহস্য আছে কিনা সে সন্ধান তিনি করেন নি। সখার দৃষ্টিতে সখার যে পরিচয় ব্যক্ত হয় তা অবশ্যই মানুষের সমগ্র পরিচয় নয়, কিন্তু ঐ পরিচয়ের মধ্যে খণ্ডতা বা অপূর্ণতা থাকে না। বিভূতিভূষণের সৃষ্ট চরিত্র এই দিক দিয়ে সম্পূর্ণ।

তাঁর গল্প বা উপন্যাসে যেসব চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে, তাদের মধ্যে প্রায় সব ক'টি চরিত্রই সখ্যরসে জারিত—সখার প্রীতি সেগুলিকে লালন করেছে। কেবল যুবক বা মধ্যবয়সীর চরিত্র নয়, শিশু বা বৃদ্ধের চরিত্র যখন তিনি এঁকেছেন, তখনও এই সখিত্ব তাঁর চেতনায় ক্রিয়াশীল হয়েছে। তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে সমান হয়ে গেছেন। শিশুর সঙ্গে শিশু হয়ে যাওয়ার পরিচয় তাঁর কল্পনায় অজস্র পাওয়া যায়। বহু ক্ষেত্রে তিনি বৃদ্ধের হৃদয়ের বেদনা বা বাসনাটুকু নিজের হৃদয়ে অনুভব করেছেন। সখার সহ-অনুভূতিই তাঁর লেখায় মানুষকে জীবন্ত করে তুলেছে। 'জীবন্ত করে তোলা'র অর্থ অবশ্যই প্রবৃত্তির উদ্দাম প্রকাশের বর্ণনা করা নয়—জীবনে তিনি মানুষকে যেমনটি দেখেছেন তেমন করেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিছুটা কল্পনা অবশ্যই তিনি মিশিয়েছেন, কবিকর্মও কিছুটা ছিল; তবুও জীবনে আসলে দেখা মানুষের রূপটি তাঁর কাছে এমন প্রিয় বলে মনে হয়েছে যে, তিনি সেই রূপের সঙ্গে তাঁর পাঠকদের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে উৎসুক হয়েছেন।

সেই জন্যই সাধারণত তাঁর রচনায় অসূয়া বা ঈর্ষা নেই। বেশির ভাগ মানুষের সঙ্গেই তাঁর হৃদয়ের সংযোগ ঘটেছে—তিনি সাধারণ বা দরিদ্র মানুষের দিকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চান নি, মানুষকে তিনি তার দুর্বলতা সমেতই সখার মতো আপন করে নিয়েছিলেন। অহংকার বা কুটিলতা তাঁর স্বভাবগত ছিল না।

একমাত্র মানুষের অহংকারে তাঁর হৃদয় প্রতিহত হয়েছিল। ধনের অহংকার, প্রতাপের অহংকার যেখানে তিনি দেখেছেন সেখানে তাঁর

হৃদয় সংকুচিত হয়েছে। বৈষ্ণবীয় সখ্যরসে ঐশ্বর্যের ভাবনা নেই; অর্থাৎ যেখানে ঐশ্বর্যের গরিমাবোধ আছে সেখানে সখ্যরসের স্ফুরণ হতে পারে না। বিভূতিভূষণের সখিত্বচেতনাও অসার ঐশ্বর্যের অহংকারে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে। তীব্র আঘাত করার প্রয়াস তিনি করেন নি, কারণ ঐ প্রয়াস তাঁর কবিধর্মের প্রতিকূল; তিনি কোথাও কোথাও অনুযোগ মাত্র করেছেন। নগরে লালিত মানুষের সংকীর্ণতা, ধনী বা প্রতিপত্তিশালীর আত্মম্ভরিতা তাঁকে পীড়িত করেছে। তাঁর সখিত্বকামী কবিচিত্ত হৃদয়ে প্রবেশের পথ খুঁজে না পেয়ে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, কিন্তু তীব্র বিক্ষোভে আত্মহারা বা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে নি। যাদের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের মিল হয় নি, তাঁরা তাঁর রচনায় সাধারণত অনুপস্থিত—ক্বচিৎ কোথাও দু'চারটি আঁচড়ে তাদের আংশিক ছবি দেখা যায়।

এই সখিত্ববোধই সম্ভবত তাঁর প্রেমচেতনাকে অপেক্ষাকৃত অল্প-পরিস্ফুট করে তুলেছে। সখার প্রেম প্রণয়ীর হৃদয়াবেগের মতো সুতীব্র হয় না, বিশেষত সখার প্রেমে প্রণয়ের দেহোদ্ভব আকর্ষণের নিরতিশয় উষ্ণতা থাকে না। সখিত্ব চেতনার প্রবলতা বিভূতিভূষণের রচনায় নর-নারীর প্রেমের আবেগকে প্রশমিত করেছে। বাস্তবিক পক্ষে অপু আর অপর্ণা, অপু আর লীলা, জিতু আর মালতী বা হিরণ্ময়ী, যতীন আর পুষ্প, যতীন আর মঞ্জু, হীরেন আর কুমী—তাঁর গল্প-উপন্যাসের এই সব নায়ক-নায়িকার হৃদয়সংযোগের মূল কারণ সখিত্ব না প্রণয়, তা বলা কঠিন। দু' একটি বিরল নিদর্শন থাকলেও নরনারীর আকর্ষণের ক্ষেত্রেও বিভূতিভূষণ সখিত্বকে স্থায়ী ভাবরূপে স্থাপন করে প্রণয়কে যেন সঞ্চারী রূপে কল্পনা করেছেন।

এই সখিত্বের চেতনা কেবল মানব সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়। মনে হয়, বিভূতিভূষণ প্রকৃতির দিকে যে দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন তার মধ্যেও এই চেতনা ক্রিয়াশীল। তিনি প্রকৃতিরানীর সেবার কথা বলেছেন, কিন্তু সে সেবা দাসের মতো নয়। বরং তিনি

যেন সখার মতো, খেলার সাথীর মতো প্রকৃতির সঙ্গে মিশতে চেয়েছেন। প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করে তাঁর অন্তরে যে চেতনা জেগেছে তা ইংরেজীতে যাকে সাব্লাইম বলে সেই সমুচ্চ মনোভাব নয়, বরং প্রকৃতির মধ্যে তাঁর কবিচিত্ত স্বারস্যই অনুভব করেছে— তাঁর কল্পনাপ্রবণতা ঐ রসানুভূতির বিভিন্ন স্বাদের কারণ হয়েছে।

জীবন জিজ্ঞাসা

জীবনের তাৎপর্য

প্রত্যেক যথার্থ ভাবুকই কঠোপনিষদের ধীর বিপশ্চিতের মতো আবৃত্ত চক্ষু। তিনি কেবল জীবনের বাইরের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-ধ্বনিতে মুগ্ধ হন না; ইন্দ্রিয়ের পথ বেয়ে জীবনের যে সমারোহ তাকে অতিক্রম করে জীবনের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করার একটা প্রয়াস তিনি নিয়তই করেন। ঐ ভাবুক দার্শনিক হলে যুক্তির পথ বেয়ে যাত্রা করেন; তাঁর সাধনার শেষে থাকে একটি তত্ত্ব। কিন্তু তিনি দার্শনিক না হয়ে কবিও হতে পারেন। বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক যথার্থ কবিই ভাবুক। কবি বলতে এখানে অবশ্যই সৃষ্টি ধর্মী লেখকের কথা বলা হচ্ছে। যে কবি জীবনের গভীরে পৌঁছতে উৎসুক নন, তাঁর সৃষ্টি মরশুমী ফুলের মতো দু'দিনের জন্য রূপের পশরা সাজিয়ে শেষ হয়ে যায়। ঐ ক্ষণিক সৌন্দর্যের মূল্য যে নেই এমন নয়, কিন্তু তার মধ্যে সেই মহত্ব থাকে না, যা কাব্যরসের আস্বাদকে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর বলে নির্দেশ করার স্পর্ধা দেয়। জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করে তার তাৎপর্য, উদ্দেশ্য বা সার্থকতা সন্ধান করার উৎকণ্ঠাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রাণ। ঐ প্রাণবত্তা না থাকলে রচনা যতই মনোজ্ঞ হোক না কেন, তা নিছক শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে। যিনি রচনাশিল্পী মাত্র নন, যিনি কবিও, জীবনের অর্থ অন্বেষণের আকুলতা তাঁর গোচরে বা অগোচরে হোক, তাঁর লেখার মধ্যে ফুটে উঠবেই।

বিভূতিভূষণ অবশ্যই দার্শনিকের মতো জীবনের তাৎপর্যের সন্ধান করতে উৎসুক হন নি। তবে জীবনকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তার ছাপ তাঁর রচনার মধ্যে বহুভাবে পড়েছে। জীবনের যে অংশটা কোলাহলমুখর, আড়ম্বরে উদ্বেল, তার প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ

ছিল না। বিলাসের বাহুল্য, সম্ভোগের উত্তুঙ্গ কামনা, স্থূল উপকরণ-সর্বস্বতা তাঁকে পীড়িত করেছে। বিভূতিভূষণের অন্তশ্চেতনা যেন বৃহদারণ্যক উপনিষদের মৈত্রেয়ীর মতো আকুল হয়ে বলতে চেয়েছে, 'যেনাহং নামৃত স্যাম্, কিমহং তেন কুর্যাম্' ?

'যাত্রাবদল'-এর 'সার্থকতা' নামে একটি গল্পের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। এই গল্পে একটি ছোট গ্রামের বাসিন্দা পঞ্চু মুখুজ্জে প্রথম যৌবন থেকে আশা করেছে যে, সে বিদেশে গিয়ে চাকরি করে উন্নতি করবে। কিন্তু তার সে সাধ পূর্ণ হয় নি ; গ্রামের বাইরে গিয়ে উন্নতি করার সুযোগ তার জীবনে আসে নি। ব্যর্থ আশা পোষণ করে সে বার্ধক্যের দ্বারে এসে পৌঁছেছে। অপর দিকে ঐ গ্রামেরই একটি ছেলে ননী নর্মদা নদীর তীরে হোসেঙ্গাবাদে কাঠের ব্যবসা করে উন্নতি করেছে। সে যখন নিজের মোটরে করে কয়েক দিনের অবকাশ যাপন করতে গ্রামে এসেছে তখন তার 'উন্নতি'র জৌলুসে গ্রামবাসীদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। কিন্তু গ্রামের শান্ত পরিবেশে ননীর মনে যে চিন্তা এসেছে তার মধ্যে জীবনের 'সার্থকতা' সম্বন্ধে বিভূতিভূষণের চেতনার পরিচয় পাওয়া যাবে,—

"প্রথম জীবনের দারিদ্র্য, প্রথম বিদেশযাত্রা, ব্যবসায়ে উন্নতি, বিবাহ—তার মনে হল, যাকে সে এতদিন সাফল্য ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে এসেছে জীবনে, আসলে তার মূল্য কি! তার যেন আজ একটা নতুন চোখ খুলেচে, জীবনের পাতাগুলো নতুন ভাবে পড়তে শিখেচে, জীবনে যা নিয়ে এতদিন ভুলে আছে আজ মনে হচ্চে তা ভিতরের সম্পদ নয়, বাইরের পালিশ মাত্র।

তাও নয়। জীবনটা যে এতদিন জ্যামিতির সরল রেখার মত প্রস্থবিহীন, গভীরতাহীন একটা পথে চলে এসেছে—গভীরতর অনুভূতির অভাবে সে বুঝতে পারে নি যে, জীবনের আর একটা বিস্তার আছে আর এক দিকে, সেটা তার গভীরতা, নিজের মনের মধ্যে ডুব দেওয়ার অবকাশ কখনো তো হয় নি।"

এই মনের মধ্যে ডুব দেওয়ার অর্থ অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা নয়—বাইরের উপকরণসম্ভার থেকে মন ফিরিয়ে এনে আত্মসমাহিতের মতো জীবনের আনন্দ উপভোগ। রবীন্দ্রনাথ বা উপনিষদের ঋষির মতোই বিভূতিভূষণ জগতের মূলগত আনন্দের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। পারমার্থিক সাধনায় সিদ্ধির কথা বাদ দিলে ঐ আনন্দকে অনুভব করাই বিভূতিভূষণের কাছে মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। 'তৃণাঙ্কুর' থেকে একটি অংশ,—

"সে রকম নিভৃত, শান্ত, শ্যামল মাঠ ও কালো জল নদীতীর না হোলে মনের আধ্যাত্মিক পুষ্টি কেমন করে হবে? শহরের কর্মকোলাহলে ও লোকের ভিড়ে তার সন্ধান কোথায় মিলবে? তাই যখন জটাখালির ভাঙা কাঠের পুলটাতে দু'ধারের মজা গাঙ ও বাঁওড় এবং মাথার উপর অনন্ত নীলিমা, নীচে ঘন সবুজ গাছপালা, ধান ক্ষেত, বাবলা গাছের সারি, দূরের বটের ডালে বৌ-কথা-ক পাখীর ডাক—এ সবের মধ্যে প্রতি বৈকালে গিয়ে বসতাম, তখন মনে হত আর শহরে ফিরে যাবার আবশ্যক নেই। জীবনের সার্থকতা অর্থ-উপার্জনে নয়, খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে নয়, লোকের মুখের সাধুবাদে নয়, ভোগে নয়—সে সার্থকতা শুধু আছে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ভেতরে, বিশ্বের রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করার আনন্দের মধ্যে, এই সব শান্ত সন্ধ্যায় বসে এই অসীম সৌন্দর্যকে অনুভব করায়।"

বিভূতিভূষণ প্রকৃতিপ্রেমিক ছিলেন। সে জন্য প্রকৃতির বুকে ফিরে যাওয়ার বাসনা তাঁর লেখায় বার বার ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্যের যে অন্তহীন সমারোহ আছে, যে উদার প্রসার আছে তা মানুষের প্রাণকে বিশ্বলীন আনন্দের অনুভূতির সুযোগ করে দেয়। কিন্তু প্রকৃতির কাছে যাওয়ার অর্থ লোকালয় থেকে নির্বাসন নয়। বিভূতিভূষণ জীবনকে এড়িয়ে প্রকৃতির নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে চান নি। প্রকৃতির মাধুর্যানুভব তাঁর জীবনসাধনার

একটি বিশিষ্ট অংশমাত্র—জীবনের আনন্দকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়াই তাঁর আদর্শ। 'স্মৃতির রেখা'য় তিনি বলেছেন,—

"জীবনকে প্রাণ ভরে ভোগ করাই জীবনের সার্থকতা। উদার ভাবে প্রসারিত মনে ভোগ বা বেঁচে থাকবার আর্ট।' এটুকুও শিখতে হয়।"—ইসমাইলপুর, ১৪.১.১৯২৮।

'আরণ্যক' উপন্যাস থেকে কয়েকটি ছত্র,—

"মানুষ কি চায়—উন্নতি না আনন্দ? উন্নতি করিয়া কি হইবে যদি তাহাতে আনন্দ না থাকে? আমি এমন কত লোকের কথা জানি, যাহারা জীবনে উন্নতি করিয়াছে বটে, কিন্তু আনন্দকে হারাইয়াছে। অতিরিক্ত কোনো মনোবৃত্তির ধার ক্ষইয়া ক্ষইয়া ভোতা—এখন আর কিছুতেই তেমন আনন্দ পায় না, জীবন তাহাদের নিকট একঘেয়ে, এক রঙা, অর্থহীন, মন সান বাঁধানো—রস ঢুকিতে পায় না।"

বিভূতিভূষণের লেখায় জীবনের সার্থকতা আর ব্যর্থতা দুইয়ের ছবিই আছে। নাগরিক জীবনের চড়া রঙের ছবি এঁকে তিনি ব্যঙ্গ বা অবজ্ঞার কালি ছেটান নি—সে প্রবৃত্তি বা রুচি তাঁর ছিল না। নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতার পরিচয় তাঁর অনেক লেখায় ফুটে উঠেছে—তিনি স্থূল দৃষ্টিতে সফল বলে অনুমিত জীবনের অকৃতার্থতার আভাস দিয়েছেন। তবে তথাকথিত অভিজাত সমাজে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মেশেন নি—যেখানে অভিজ্ঞতা সংকীর্ণ সেখানে কল্পনার অতিচারও তাঁর কবি প্রকৃতিগত ছিল না। তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে জীবনের সংকীর্ণতার যে পরিচয় পেয়েছিলেন তার রেখাঙ্কন করেছেন। তাঁর অনেক লেখার মধ্যে দুই প্রান্তবর্তী দু'টি উপন্যাসের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। একটি 'অপরাজিত' আর একটি 'অনুবর্তন।' 'অনুবর্তন'-এর মধ্যে বিভূতিভূষণ শহরেরই একটি বিদ্যালয়ের কথা বলেছেন। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত, কিন্তু তাদের জীবন এমনই এক সংকীর্ণ সীমার

মধ্যে আবদ্ধ যে, তাঁরা বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচয় থেকে বঞ্চিত। যাঁরা গ্রামে বাস করেন, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই যে শিক্ষা ও সুযোগের অভাবের জন্য ছোটগণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য হন। কিন্তু যাঁরা শিক্ষিত নগরবাসী, জীবনকে বহুভাবে বহুদিকে প্রসারিত করে দেওয়ার সম্ভাবনা তুলনায় তাঁদের অনেক বেশি আছে। বিভূতিভূষণ এই শিক্ষকদের যে চিত্র এঁকেছেন তাঁদের সংকীর্ণতার একটা বড়ো কারণ তাঁদের দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে যুঝতেই তাঁদের শক্তি প্রায় শেষ হয়ে গেছে; অন্য কিছু করার আগ্রহ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছে। শিক্ষকদের জীবনের এই সংকীর্ণতার পরিচয় 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপুর জীবনেও সাময়িকভাবে পাওয়া যায়। অবশ্য সে এই সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে সংযুক্ত করেছে। বৃহত্তর জীবনের স্বাদ অপুর কাছে পরম লোভনীয় বলে মনে হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের অর্থ পৃথিবীব্যাপ্ত জীবনধারার সঙ্গে আত্মিক সংযোগ। এই জীবনধারার এক অংশ প্রকৃতির মধ্যে প্রবাহিত; আর এক অংশ বিভিন্ন দেশে প্রসারিত। 'অপরাজিত' উপন্যাসের শেষ অংশে দেখি যে, অপু বালক পুত্র কাজলকে নিশ্চিন্দিপুরে রেখে গেছে, যাতে সে প্রকৃতির মধ্য থেকে জীবনরস আহরণ করে সজীব হয়ে উঠতে পারে। আর সে নিজে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর জীবনধারা বা জীবনসাধনার সঙ্গে নিজের রসপিপাসু চিত্তকে যুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে বার হয়েছে। প্রথম উপন্যাসযুগ্মকের পরিসমাপ্তিতে জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে যে বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা বিভূতিভূষণের জীবনসাধনার সার সত্য।

বিভূতিভূষণ জীবনের তাৎপর্যের সন্ধান করতে গিয়ে কখনও তত্ত্বচিন্তা করেন নি, বরং জীবনে জীবন যোগ করার আদর্শই মনেপ্রাণে স্বীকার করেছিলেন। 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপিতে তিনি তাঁর নিজের ভাবনার অনুকূল আইনস্টাইনের একটি যে উক্তি

উদ্ধার করেছেন তা থেকে তাঁর সচেতন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে,—

"Pure logical thinking can give us no knowledge whatsoever of the world of experience. The knowledge of Reality begins with experience and terminates with it. Reason gives the structure to the system and the data of experience and their mental relations are to correspond exactly with the consequences in theory." —Einstein, Herbert Spencer Lecture, Oxford, 1933.

অবশ্য নিছক অভিজ্ঞতাই সত্যোপলব্ধির একমাত্র পথ নয়। অভিজ্ঞতার বিচিত্রতা যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন প্রশান্ত চিত্তে ঐ অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করার। সত্যের বিচিত্র প্রকাশ আমাদের কাছে ধরা পড়ে না, তার কারণ এই যে, আমাদের মনই প্রস্তুত থাকে না। সত্যের প্রকৃত উপলব্ধি হয় ধ্যানের মধ্য দিয়ে। বিভূতিভূষণ এই ধ্যানযোগে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রকৃতির সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকার কথা তিনি একাধিকবার বলেছেন। 'স্মৃতির রেখা' থেকে কয়েকটি ছত্র,—

"জীবনে বড় আনন্দকে ধ্যানে আগে পেতে হয় এবং ধ্যান ভিন্ন তার সন্ধানই মেলে না। হৈ-হাই বাজারের মেছোহাটার কলরবে ধ্যানকে কখনো আসনপিঁড়ি হয়ে বসবার সুযোগ দেয় নি এরা। সে বেচারী সুযোগ খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে তারপর কম্বল গুটিয়ে অসাফল্যের পথ চেয়ে অন্তর্হিত হয়েছে।" —রাজগিরি, ১৩. ১১. ১৯২৭।

বিভূতিভূষণ ঐ ধ্যানের সহযোগেই জীবনের গভীর আনন্দের অনুভূতি পেয়েছিলেন। ঐ গভীর আনন্দের অনুভূতি তাঁর মনের স্বপ্নালুতা নয়, তা তাঁর কবিদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত সত্য, তা

তাঁর হৃদয়ের একটি সুদৃঢ় বিশ্বাস। 'স্মৃতির রেখা' থেকে আর একটি অংশ,—

"জীবন ছাড়াও একটা অপার্থিব জীবনধারা কল্পনা করতে পারা যায় যাতে আনন্দ বা সৌন্দর্য আরও ক্রমপরিস্ফুট হবে—সৌন্দর্যের সত্যের উপভোগই জীবনের উদ্দেশ্য, এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই।"—সাজকী, ২১.১.১৯২৮।

বিভূতিভূষণের জীবনদৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র একটি সুপরিচিত গানের কথা অবশ্যই মনে পড়ে,—

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ
ধন্য হল ধন্য হল মানব জীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
শ্রবণ আমার গভীর সুরে
হয়েছে মগন॥

রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিতে যে আনন্দ ধরা পড়েছে তার মূলে তাঁর উপনিষদের ঋষিসুলভ প্রজ্ঞার প্রেরণাই প্রবল; বিভূতিভূষণ যে, জীবনে অফুরন্ত আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন তার মূলে আছে তাঁর জীবনপ্রেম। ঐ প্রেমই তাঁকে জীবনের পরম সত্যরূপে আনন্দকে উপলব্ধি করতে প্রণোদিত করেছে—'সৌন্দর্যের সত্য' ঐ আনন্দেরই সংজ্ঞান্তর। চেতনার মূলে ঐ প্রেম ছিল বলে তিনি জীবনের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। স্থূল সম্ভোগপিপাসা বা বৈষয়িকতার কার্পণ্য যেখানে তাঁর হৃদয়কে প্রতিহত করে নি, সেইখানে তিনি কি প্রকৃতিতে কি মানুষের মধ্যে আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন। লালসা ছিল না বলেই তিনি সহজ প্রাণে আনন্দ বা সৌন্দর্যের সত্যের মধ্যে অবগাহন করতে পেরেছিলেন। 'ঊর্মিমুখর'

থেকে উদ্ধৃত একটি অংশে তাঁর পিপাসু হৃদয়ের অভীপ্সার পরিচয় পাওয়া যাবে,—

"এবার ট্রপিকসের কোনো দেশে (যদিও বাংলা ওর মধ্যে পড়ে না) জন্মেছি, দূর কোনো জন্মান্তরে যাবো ইউরোপে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা বৃহস্পতি কি অন্য কোনো গ্রহান্তরে, কি কোন দূর নক্ষত্রে—আমি অমর আত্মা, আমি দেশকালের অতীত—কোন দেশ আমার কোন দেশ পর? সকলকেই ভালবাসতে চাই স্বদেশবিদেশ নির্বিশেষে, সকলের সব ভালটুকু নিতে চাই—এই আমার, এই আমার—এ সংকীর্ণতা যেন থাকে না। এই দেশে জন্মেচি, মানুষ হয়েচি কিন্তু এ দেশের সঙ্গে নিজেকে অনেকটা মিশিয়ে দিলেও যেন খানিকটা আছি কৌতূহলী দর্শকের মত, এই বৃক্ষলতা-বহুল সবুজ দেশে এসে দেখে এবার আশ্চর্য হয়ে গেছি, প্রতিদিন দেখচি আজ ৪০ বছর ধরে, তবু তৃপ্তি নেই, এ নিত্য নতুন আমার কাছে, কোনো দিন বুঝি এর রূপ একঘেয়ে লাগবে না।"

'তৃণাঙ্কুর' থেকে একটি ছত্র,—

"সত্যিই জীবনটা অপূর্ব শিল্প—কি বলে প্রকাশ করি এর গভীর অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য, এর নবীনত্ব, এর চারু কমনীয়তা।"

সৌন্দর্য বা আনন্দের সন্ধানী হলেও বিভূতিভূষণ টেনিসনের Lotuseater-দের মতো সুখসর্বস্ব ছিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি জীবনের বেশির ভাগ অংশ দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েছিলেন—শেষ জীবনে কিছুটা স্বচ্ছলতা এসেছিল এই মাত্র। দুঃখকে এড়িয়ে কল্পনার স্বর্গলোক সৃষ্টি করতে চান নি—তিনি যে জীবনপলাতক ছিলেন না তার নিদর্শন তাঁর সাহিত্যেই অজস্র পাওয়া যাবে। বরং তিনি দুঃখকে, বেদনাকে জীবনের বড় সম্পদ বলে স্বীকার করেছেন—আদর্শবাদের দৃষ্টিতে নয়, সত্যানুভূতির দিক থেকেই স্বীকার করেছেন। 'স্মৃতির রেখা'য় তাঁর ভাবনাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে,—

"Sadness জীবনের একটা অমূল্য উপকরণ—Sadness ভিন্ন জীবনে profundity আসে না—যেমন গাঢ় অন্ধকার রাত্রে আকাশের তারা সংখ্যায় ও উজ্জ্বলতায় অনেক বেশি হয়, তেমনই বিষাদবিদ্ধ প্রাণের গহন গভীর গোপন আকাশে সত্যের নক্ষত্র-গুলি স্বতঃস্ফূর্ত ও জ্যোতিষ্মান্ হয়ে প্রকাশ পায়—তরল জীবনা-নন্দের পূর্ণ জ্যোৎস্নায় হয়ত তারা চিরকালই অপ্রকাশ থেকে যেত।

সেই হিসাবে emotional sadness জীবনের একটা খুব বড় সম্পদ।"

বিভূতিভূষণের অন্তরে প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছে তার একটা বড়ো কারণ এই যে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে অবগাহন করলে চিত্ত আনন্দরসে প্লাবিত হয়। বিশ্বের অন্তর্লীন আনন্দের প্রবাহের স্বাদ পাওয়ার একটা বড়ো সহায় প্রকৃতি। মানুষের ভালোবাসাও যে এই আনন্দের সন্ধান দিতে পারে তার পরিচয় তাঁর গল্প-উপন্যাসে পাওয়া যায়। তিনি নিভৃত ধ্যানের প্রশস্তি বহুবার গেয়েছেন, কারণ ধ্যানের মধ্য দিয়েই চিত্ত একাগ্র হয়ে সেই আনন্দের অভিমুখীন হতে পারে। তিনি emotional sadness অর্থাৎ রবীন্দ্র-কাব্যোক্ত বেদনাকে জীবনের বহুমূল্য উপাদান বলে স্বীকার করেছেন; তারও কারণ এই যে, ঐ বেদনার মধ্য দিয়ে হৃদয়ের সুগভীর অনুভবশক্তি জাগ্রত হয়ে আনন্দের প্রকাশকে সম্ভব করে তুলতে পারে। তিনি ঐ আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিলেন এ কথা জোর করে বলা যায় না। কারণ বিশুদ্ধ আনন্দে চিত্তের প্রতিষ্ঠা একমাত্র অধ্যাত্ম সাধকের ক্ষেত্রেই সম্ভব—অধ্যাত্ম চেতনাবান্ উপনিষদিক ঋষির ব্রাহ্মী স্থিতি কেবল বিভূতিভূষণ কেন, রবীন্দ্রনাথের মতো আনন্দবাদী কবির ক্ষেত্রেও সম্ভাব্য নয়। যে কবি সাধক নন, তাঁর কাছে পরম সত্য ক্ষণিক দ্যুতির মতো উদ্ভাসিত হয়। পৌরাণিক কথায় নারদের ক্ষণিক ভগবদ্দর্শন, পিতামহীর

মৃত্যুর পর শ্মশানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুভূতি কিংবা সদর স্ট্রিটের বাড়িতে সূর্যোদয়কালে যুবক রবীন্দ্রনাথের চকিত আনন্দোপলব্ধির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। বিভূতিভূষণও ঐ ক্ষণিক প্রকাশের সত্যটি উপলব্ধি করেছেন,—

"এ রকম এক একটা সময় আসে যখন বিদ্যুৎ চমকে অনেকখানি অন্ধকার রাস্তা একবারে দেখতে পাওয়ার মত সারা জীবনের উদ্দেশ্য ও গভীরতা যেন এক মুহূর্তে জানতে পারা যায়, বুঝতে পারা যায়। শুধু সৌন্দর্যই এই বিদ্যুৎ—আলোর কাজ করে মানসিক জীবনে। কিন্তু এই সৌন্দর্য বড় আপেক্ষিক বস্তু। একে সকলে চিনতে পারে না, ধরতে পারে না। কানকে, চোখকে, মনকে তৈরী করতে হয়, সঙ্গীতের কানের মত সৌন্দর্যের জ্ঞান বলে একটা জিনিসের অস্তিত্ব আছে।"—তৃণাঙ্কুর।

সৌন্দর্যের বিদ্যুতে গভীর আনন্দের সাক্ষাৎকারই বিভূতি-ভূষণের দৃষ্টিতে জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা—ঐ সৌন্দর্য প্রকৃতি বা মানবহৃদয় যে কোনো আধার থেকে উৎসারিত হতে পারে।

.................................২.................................

মৃত্যুচেতনা

জীবনজিজ্ঞাসা শুদ্ধমাত্র প্রাণনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রাণনকে অতিক্রম করে যে মৃত্যু তার উপলব্ধিতেই জীবনের চরম জিজ্ঞাসার অবসান। মৃত্যুর আলোতেই জীবনের স্বরূপ ফুটে ওঠে। বিশেষত ভারতীয় ভাবাদর্শে লালিত যে কোনো বড়ো লেখকের জীবনদৃষ্টির পরিচয় পেতে হলে মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর চেতনার পরিচয় নেওয়া একান্তই আবশ্যিক কর্তব্য। যাঁর রচনায় মৃত্যু সম্পর্কে ভাবনা

বা চেতনা নেই তিনি প্রতিভাধর বা কুশলী শিল্পী হলেও তাঁর জীবন-দৃষ্টিকে খণ্ডিত বলে অনুযোগ করতে হয়।

বিভূতিভূষণের রচনায় মৃত্যুর আবির্ভাব অনেক জায়গায় স্থান পেয়েছে। তাঁর 'দেবযান' উপন্যাসে মৃত্যু আর পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর যে কল্পনা তা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। এ ছাড়াও তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যু থেকে শুরু করে শেষ গ্রন্থ 'কুশল পাহাড়ী'র 'ঝগড়া' গল্পের কেশব গাঙ্গুলীর মৃত্যুর ছবিতে মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ বস্তুবাদী দার্শনিকের মতো মৃত্যুকে একটি প্রাকৃতিক পরিণাম বলে মনে করেন নি। উনবিংশ শতকের নীতিবাদীর মতো 'মনে করো শেষের সেদিন ভয়ংকর' বলে তিনি মৃত্যুর একটা ভয়াবহ চিত্র রচনা করতেও চান নি। বরং মৃত্যু তাঁর কল্পনায় মোহন মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। পরিচিত দৃষ্টান্ত হিসাবে 'অপরাজিত' উপন্যাসে সর্বজয়ার মৃত্যুর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। মৃত্যুর আগে সর্বজয়া অপুর স্বপ্ন দেখেছে। অতীতের সুখস্মৃতির আবেশের পথ বেয়েই তাঁর জীবনে মৃত্যু এসেছে,—

"ও ছেলেমানুষ খঞ্জন পাখীর মত ডাগর চোখের নীল চাহনি...চুল কোঁকড়া কোঁকড়া...মুখচোরা, ভালমানুষ লাজুক...বোকা...জগতের ঘোরপ্যাঁচ কিছুই একেবারে বোঝে না...কোথায় যেন সে যায়...নীল আকাশ বাহিয়া বহুদূরে...বহু দূরের দিকে, সুনীল মেঘপদবীর অনেক উপরে...যায়...যায়...যায়...মেঘের ফাঁকে যাইতে যাইতে মিলাইয়া যায়...

বুঝি মৃত্যু আসিয়াছে। ...কিন্তু তার ছেলের বেশে তাকে আদর করিয়া আগু বাড়াইয়া লইতে...এতই সুন্দর!...

কি হাসি? কি মিষ্টি হাসি ওর মুখের।"

বিভূতিভূষণ বালক বয়স থেকেই মৃত্যুর সংস্পর্শে এসেছিলেন। কিন্তু অপরের মৃত্যু দেখলেও মৃত্যু সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অনুভূতি জীবিত

কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। মৃত্যু সম্পর্কে বিভূতিভূষণের চেতনা অত্যুচ্চ কবিকল্পনা—মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর কল্পনা তাঁর জীবন-চেতনারই অংশ। এই চেতনা বা কল্পনা তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিবিশেষের উপদেশ বা কোনো গ্রন্থ পাঠ করে পেয়েছিলেন এমন নয়, এটি তাঁর অন্তর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 'পথের পাঁচালী' লেখার সমকালের ডায়েরি 'স্মৃতির রেখা' থেকে একটি অংশ উদ্ধার করে তাঁর মৃত্যুচেতনা যে বৃহৎ জীবনচেতনার অঙ্গীভূত তার সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে,—

"আমাদের এই দেহটা যেমন পৃথিবীর, মৃত্যুটাও তেমনি এই পৃথিবীর। পৃথিবীর দেহটার সম্বন্ধ ঠিক জন্মের মতই। মৃত্যুটা শাশ্বত জিনিস নয়, পৃথিবীর সঙ্গেই তার সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এদের পারে—এই অনিত্য মৃত্যুর পারে, পৃথিবীর পারে এক অনন্ত জীবন—পৃথিবীর এই মৃত্যু-স্পৃষ্ট না হয়ে অক্ষুণ্ণ অপরাজিত দাঁড়িয়ে আছে তা তোমার আমার সকলের।"—১ বৈশাখ, ১৩৩৫।

'অপরাজিত' উপন্যাসে মধ্যভারতের অরণ্যে একটি পাকা তেলাকুচা ফল দেখে তাঁর মনে মৃত্যু সম্পর্কে যে চেতনা জেগেছে তাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। প্রকৃতির মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর যে পালা জীবনকে অবলম্বন করে নিরন্তর চলেছে তার মধ্যে তিনি যেন সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয়ের তত্ত্বটি উপলব্ধি করেছিলেন। ঐ উপলব্ধি কালক্রমে মানবজীবনের সুমহৎ সত্যরূপে তাঁর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জন্ম-মৃত্যু দিয়ে গাঁথা জীবনের সত্যটি তাঁর অন্তরে যে স্থান পেয়েছিল এর মূলে ভারতীয় সংস্কারও কিছু পরিমাণে সক্রিয় ছিল একথা বলা যেতে পারে। উপনিষদের যুগে আত্মার অবিনাশিত্বের যে তত্ত্ব উপলব্ধ হয়েছিল, বৌদ্ধযুগে জন্মান্তরবাদে তার পরিণতি। 'দেবযান' উপন্যাস ঐ জন্মান্তরবাদের কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ বিশেষ কল্পনার কথা বাদ দিলেও জন্মান্তর

তত্ত্বটি তিনি তারকবি কল্পনা দিয়ে মণ্ডিত করে নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা তত্ত্বের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথে বৌদ্ধজাতক বা হিন্দু পুরাণাদির জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না; তবে জন্মান্তর সম্পর্কে ভারতীয় সংস্কারের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব মিলিয়ে তিনি জীবন-প্রবাহের অখণ্ডতার সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন—'চিত্রা' কাব্যের 'জীবনদেবতা', 'অন্তর্যামী', বা 'ছিন্নপত্র'-এর ছু'একটি চিঠিতে তার রসরূপ আর 'বলাকা' কাব্যের 'চঞ্চলা' (৮নং) বা 'শাজাহান' (৯নং) কবিতায় তার তত্ত্বরূপ কাব্যাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের মতো জাতীয় সংস্কারকে বিজ্ঞানের সত্যের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন করে পেতে চান নি; তবে জন্মান্তরের কল্পনাটিকে তিনি জীবনানুভূতির মধ্য দিয়ে পেতে চেয়েছিলেন—তাঁর কবিদৃষ্টিই এক্ষেত্রে তাঁর সহায় হয়েছে। তিনি জন্ম-মৃত্যুর সত্যটিকে একটি বিচ্ছিন্ন তত্ত্বরূপে বিবৃতক রতে চান নি; তাঁর কল্পনার সঙ্গে তাঁর জীবনচেতনা আর অধ্যাত্ম-চেতনার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। 'তৃণাঙ্কুর' থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করলে তাঁর পরিণত চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে,—

"মনে হয় যুগে যুগে এই জন্মমৃত্যুচক্র কোনো এক বড়ো দেবশিল্পীর হাতে আবর্তিত হচ্ছে, হয়তো ছুহাজার বছর আগে জন্মেছিলাম ইজিপ্টে, যেখানে নলখাগড়ার বনে, শ্যামল নীল (Nile) নদের রৌদ্রদীপ্ত তটে কোন দরিদ্র ঘরের মা, বোন, বাপ, ভাই, বন্ধু, বান্ধবদের দলে এক অপূর্ব শৈশব কেটেচে, তারপর এতকাল পরে আবার ষাটটি বছরের জন্য এসেচি এখানে—আবার অন্য মা, অন্য বাপ, অন্য ভাইবোন, অন্য বন্ধুজন। পাঁচ হাজার বছর পরে আবার কোথায় চলে যাবো কে জানে? এই Cycle of Birth and Death তিনি নিয়ন্ত্রিত করচেন আমি তাঁকে কল্পনা করে নিয়েচি—তিনি এক বড় শিল্পী। এই সকল জন্মের সুখ-ছুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা

হয়তো কোন দূর জীবনের উন্নততর, বৃহত্তর, বিস্তৃততর অবস্থায় সব মনে পড়বে—সে এক মহনীয়, বিপুল, অতি করুণ অভিজ্ঞতা।

কে জানে যে, আবার এ পৃথিবীতেই জন্মাবো। ওই যে নক্ষত্রটা বটগাছের সারির মাথায় সবে উঠেচে—ওর চারি পাশে একটা অদৃশ্য গ্রহ হয়তো ঘুরচে, তার জগতে যেতে পারি—বহু বছরের Globular Cluster দের জগতে যেতে পারি—কে বলবে এসব শুধুই কল্পনাবিলাস? এ সব হয় না, তা কে জানে? হয়তো নিছক কল্পনা নয় এসব—বৃহত্তর জীবনচক্র যুগে যুগে কোন অদৃশ্য দেবতার হাতে এভাবে আবর্তিত হচ্চে।

শত শত জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যাঁর চলাচলের পথ—জয় হউক সে দেবতার—তাঁর গতির তেজে সম্মুখের ও পশ্চাতের অমুক্তির অন্ধকার জ্যোতির্ময় হউক, নিত্য সৃষ্টি জয়মান হউক তাঁর প্রাণ-চক্রের নিত্য আবর্তনশীল বিরাট পরিধিতে।

গুন্ গুন্ করে বানিয়ে-বানিয়ে গাইলুম। আপনিই মুখে এসে গেল—

"গভীর আনন্দ রূপে দেখা দিলে এ জীবনে
হে অজানা অনন্ত—"

নিজেকে দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় শিল্পী, নিজের দৃষ্টি দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় দ্রষ্টা, নিজের সৃষ্টি দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় স্রষ্টা।"

বিভূতিভূষণ 'দেবযান' উপন্যাসে মৃত্যুর পর যে বিভিন্ন লোকে মানুষের আত্মার কথা বলেছেন তার সঙ্গে উপনিষদের কোনো কোনো কল্পনার সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু মৃত্যুকে অবলম্বন করে উপনিষদের মধ্যে যে অধ্যাত্ম চিন্তা উদ্ভূত হয়েছে সে দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। কঠোপনিষদে মৃত্যুর পর মানুষের কোথায় গতি হয় বলে নচিকেতা যমকে প্রশ্ন করেছিলেন; তার উত্তরে যম যে উত্তর দিয়েছিলেন তার মধ্যে ঔপনিষদিক দর্শনের পরিচয় পাওয়া

যায়। মৃত্যুর পরে বিভিন্ন লোকে মানুষের গতির কল্পনা করলেও ঐ উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব সম্পর্কে বিভূতিভূষণের কোন আগ্রহ ছিল না। উপনিষদের শেষ চারিটি মন্ত্র (১৫-১৮) মৃত্যুকালীন উক্তি বলে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। বিভূতিভূষণ ষোড়শ মন্ত্রের শেষাংশে 'যত্তে কল্যাণতমং তত্তে রূপং পশ্যামি' তাঁর রচনায় উদ্ধার করলেও মৃত্যুকালে পরম সত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার যে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা উপনিষদটির এই অংশে প্রকাশিত হয়েছে বিভূতিভূষণের কল্পনাকে তা আকৃষ্ট করে নি। বিভূতিভূষণ সত্যের কল্যাণতম রূপ দর্শনের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু রূপদর্শনই তাঁর লক্ষ্য—রূপাতীত সত্যের উদ্‌ঘাটন নয়। তাঁর কবিদৃষ্টি অপিচ কবিপ্রকৃতির বিশিষ্টতাই এর জন্য দায়ী। নির্বাণ তাঁর চরম লক্ষ্য ছিল না, বিচিত্রলোকে অভিনব সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয়ের আনন্দ উপভোগই তাঁর কাম্য ছিল। সেইজন্য মৃত্যু তাঁর কাছে ঐহিক বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় বলে বিবেচিত হয় নি, মৃত্যু তাঁর কল্পনায় জীবনের নতুন নতুন ক্ষেত্রে-বিচরণ করার অবলম্বন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষ কাল থেকে কালান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে যাত্রা করতে পারে।

বিভূতিভূষণের এই মৃত্যুচেতনা স্পষ্টতই তাঁর জীবনানুরক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। বিভূতিভূষণ জীবনকে ভালোবাসতেন—শুধু ভালোবাসতেন বললে যথেষ্ট হয় না, জীবনের বিচিত্র রস তিনি আস্বাদ করতে চেয়েছেন। সেইজন্য মৃত্যুর কথা চিন্তা করে তিনি ভীত না হয়ে বরং যেন কিছুটা আনন্দিতই হয়েছেন। ভগবান যুগ যুগ ধরে সৃষ্টির যে খেলা খেলছেন তার মধ্যে সুগভীর আনন্দ আছে। মৃত্যু এ সৃষ্টির লীলার মধ্যে কোথাও অকাল সমাপ্তি ঘটায় না; মৃত্যু আছে বলেই মানুষ সৃষ্টির এক অংশ থেকে আর এক অংশে যাত্রা করতে পারে। সেইজন্যই মৃত্যু তাঁর কাছে কোন শঙ্কার কারণ হয় নি। 'হে অরণ্য কথা কও' থেকে একটি অংশ,—

"অনুভূতির প্রথম কথা হোল—মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠলো—অভীঃ, ভয় নেই।

কিসের ভয় নেই? কোনো কিছুরই না। "ন মৃত্যুর্নশঙ্কা।" ভগবান যুগ-যুগান্তর কল্প থেকে কল্পান্তর আমার ও তোমার হাত ধরে চলেচেন, আনন্দ ও প্রেমের স্নিগ্ধ ধারার মধ্য দিয়ে। সকল জন্ম-মরণ পার করে তিনি নিয়ে চলেচেন। জরা নেই, মৃত্যু নেই। এমন কত বসন্ত দ্বিপ্রহরে কত ঘেঁটুফুল সুবাস বিতরণ করবে অনাগত জীবনদিনে কত গ্রামে—কত মাতাপিতার স্নেহ আদর পরিবেশিত হবে। কত ভবিষ্যৎ রাত্রির জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল হবে সেই সুমধুর আয়ুষ্কালগুলি, কত কোকিল ডাকবে, কত রক্তশিমুল ফুল ফুটবে। জীবন ও জন্ম দু'দিনের, ভগবান সখা ও সাথী অনন্তকালের। জীবের ভয় কি? অবিনশ্বর তুমি, অবিনশ্বর আমি—আমরা ভগবানের চিরদিনের লীলাসহচর, ভগবানও চিরদিন আমাদের লীলাসহচর।"

শেষ ক'টি ছত্রে যে অধ্যাত্মচেতনার সুর ফুটে উঠেছে তা বিভূতিভূষণের বিশিষ্ট কল্পনার পরিচায়ক হলেও উদ্ধৃতিটির প্রথম দিকেই তাঁর মূল উপলব্ধি ফুটে উঠেছে। প্রকৃতি আর মানবের জীবনের মধ্যে 'আনন্দ ও প্রেমের স্নিগ্ধ ধারায়' অভিষিক্ত হওয়াই বিভূতিভূষণের কবিপ্রাণের আকাঙ্ক্ষা। মৃত্যু মহাজীবনের অঙ্গরূপে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে।

........................৩........................

পরলোক : অতিপ্রাকৃত

মানুষ অন্তর্মুখী হয়ে যত প্রশ্ন করেছে সেগুলির অন্যতম মৃত্যুর পরে আত্মার কী গতি হয় সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা। কঠোপনিষদে

যম যখন নচিকেতাকে বর দিতে চেয়েছেন, তখন নচিকেতা তাঁর শেষতম বরে মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন,—

'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে ?
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
বারাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ ২০ ॥'

—প্রথম অধ্যায়, প্রথম বল্লী।

—"মানুষ মরার পর কেউ বলেন তার আত্মা থাকে, আবার কেউ বলেন ঐ আত্মা থাকে না। এই যে সংশয়, এটি আপনার উপদেশে আমি জানব।—এই আমার তৃতীয় বর।"

প্রাচীন কাল থেকেই সব দেশের মানুষ পরলোক সম্পর্কে বিচিত্র কল্পনা করে এসেছে। সম্ভবত সব দেশেই ধর্মাশ্রিত পুরাণে পরলোক সম্পর্কে কল্পনা আছে। উনবিংশ শতক থেকে ইউরোপ আর আমেরিকায় প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাপক চর্চা দেখা যায়। স্যার অলিভার লজ প্রমুখ পাশ্চাত্য প্রেততত্ত্ববিদের নাম সুপরিচিত। তবে প্রেততত্ত্ব বা পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কে যেসব তথ্য বিভিন্ন গ্রন্থে বা পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায় সেগুলোর সবটাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না; আবার সবটাই নস্যাৎ করে দেওয়াও সঙ্গত নয়। বিশেষত ভারতবর্ষে আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্পর্কে যে চেতনা বা পুনর্জন্ম সম্পর্কে যে বিশ্বাস জাতীয় সংস্কারে পরিণত হয়েছে তার দিকে দৃষ্টি রাখলে পরলোক সম্পর্কে কল্পনা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় বলে মনে হবে না। বিশেষত ঐ কল্পনা যদি উৎকৃষ্ট কবিকল্পনা হয় তা হলে সেটি কেবলমাত্র চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে তাই নয়, ঐ কল্পনা অবলম্বন করে সমুচ্চ জীবনচেতনাও প্রকাশিত হতে পারে। অর্থাৎ নিছক কল্পনাবিলাস না হলে পরলোক-তত্ত্ব জীবনদর্শনের অংশবিশেষ বা পরিপোষক হয়ে উঠতে পারে। বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে ঐ সম্ভাবনাই সত্য হয়েছে।

প্রধানত 'দেবযান' উপন্যাসই বিভূতিভূষণের পরলোক কল্পনার

আধার। এখানে তিনি পরলোক সম্পর্কে যে কল্পনা করেছেন তার মূলে প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন গবেষণার প্রভাব কিছুটা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু বিভূতিভূষণ প্রধাণত ভারতীয় কল্পনারই অনুসরণ করেছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে যে পুনর্জন্ম বা দেহান্তর-বাদ (সংসার)-এর কল্পনা আছে তা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল কিনা বলা কঠিন। বরং প্রাচীন উপনিষদে পরলোক সম্পর্কে যে কল্পনা আছে তার প্রেরণা হয়তো কিছুটা ছিল। প্রশ্নোপনিষদের প্রথম প্রশ্নে পরলোক সম্পর্কে যে কল্পনা আছে তা স্মরণীয়।—

"সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিস্তস্যায়নে দক্ষিণোত্তরঞ্চ। তদ্ যে হ বৈ তদিষ্টা পূর্তে কৃতমিত্যুপাসতে। তে চান্দ্রমসসমেব লোকমভিজয়ন্তে। ত এব পুনরাবর্তন্তে তস্মাদেতে ঋষয়ঃ প্রজাকামাঃ দক্ষিণং প্রতি-পদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযানঃ ॥৯॥

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদভয়মেতৎ পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্তন্ত ইত্যেষ নিরোধস্তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১০ ॥"

—"সংবৎরই প্রজাপতি, তার দু'টি অয়ন—দক্ষিণ আর উত্তর। যাঁরা ইষ্ট ও কল্যাণধর্ম সাধন করেন, তাঁরা চন্দ্রলোক জয় করেন। সেখান থেকে আবার ফিরে আসেন। এই সব ঋষি প্রজাকাম হয়ে দক্ষিণ পথ অবলম্বন করেছেন। এই সেই রয়ি—যা পিতৃযান ॥ ৯ ॥

আর উত্তরায়ণে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা আর বিদ্যার দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করে আদিত্যলোক জয় করা হয়। এই-ই প্রাণের আয়তন, এই-ই অমৃত, এই-ই অভয় এই-ই পরাগতি। এখান থেকে আর ফেরে না। এই সংবৎসর বিদ্যাহীনদের নিরোধ। সেই অর্থে এই মন্ত্র ॥ ১০ ॥"

সহজ ভাষায় বলা যায় যে, উপনিষদের ঋষি দু'টি মার্গের কথা বলেছেন—একটি দক্ষিণায়ন, আর একটি উত্তরায়ণ। দক্ষিণ মার্গের সাধনা করেন তাঁরাই যাঁরা কর্মী। কর্মের সূত্র ধরে তাঁরা মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে যান—তাঁদের সে পথ পিতৃযান। সেখানে সুকৃতের ফল

ভোগ করার পর তাঁরা আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর যাঁরা অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসু, তাঁরা উত্তরায়ণ অবলম্বন করে সূর্যলোক লাভ করেন—সেখান থেকে আর ফিরে আসেন না। যিনি কর্মব্রতী, তাঁর কৃত তাঁকে জন্ম থেকে জন্মান্তরে নিয়ে যায়—মধ্যের অবকাশটুকু তাঁরা চন্দ্রলোকে, পিতৃলোকে অবস্থান করেন। যাঁরা অধ্যাত্মসাধক তাঁরা কর্মের অতীত—সেজন্য তাঁদের দেবযান; সেখান থেকে অথবা সাধনার পূর্তির জন্য পুনরায় দেহ ধারণ করে তাঁরা অবশেষে পরামুক্তি লাভ করেন।

বিভূতিভূষণ যে উপনিষদের তত্ত্ব সরাসরি গ্রহণ করেছিলেন এমন নয়; উপনিষদের তত্ত্বের যেসব ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ পরের যুগে হয়েছে সেগুলির সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল বলে মনে হয় না। ভারতের সাধকরা পরলোক সম্বন্ধে যে বিচিত্র কল্পনা করে এসেছেন, বিভূতিভূষণ তাকে নিজের কবিদৃষ্টি দিয়ে যেন শোধন করে নিয়েছেন। তাঁর মূল ভাবকল্পনা ভারতীয় ভাবাদর্শের সঙ্গে অবিরুদ্ধ। 'দেবযান' উপন্যাসের একটি চরিত্রের উক্তির কিছু অংশ উদ্ধার করলে তাঁর কল্পনার মূল কাঠামোর পরিচয় পাওয়া যাবে।—

"বাসনা থেকে পাপ, গোলমাল। এখানকার জীব বাসনা ক্ষয় করে এসেচে বহু জন্ম ধরে। এদের নিম্নশ্রেণীর বাসনা জাগে না তীব্র-ভাবে। উচ্চ জ্ঞানের, শিল্পের, সংগীতের বা ভগবৎসাধনা নিয়ে এরা থাকে। ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন এদের অনেকের হয়েচে। সুতরাং যেসব জিনিস জীবনে স্বপ্নের মত অস্থায়ী তাদের অসারত্ব এরা বুঝেছে। অত্যন্ত সাধু, নিঃস্পৃহ, সরল, উচ্চস্তরের জীবন এখানকার—মানে এইসব গ্রহের।…

তোমাকে এখানে একদিন তো জন্ম নিতেই হবে। কারণ এই স্বর্গলোক, যেখানে তোমরা আছ, এও মায়ার অধীন। হয়তো বহু-কাল এখানে থাকবে, স্তর থেকে স্তরান্তরে যাবে—কিন্তু স্বর্গও দু'দিনের। ব্রহ্মচক্রে জন্ম-মৃত্যু আবর্তিত হচ্ছে। মানুষ আবার জন্মাবে,

আবার মরবে, আবার জন্মাবে—যতদিন বাসনার শেষ না হয়, অসত্য থেকে সত্যে, মৃত্যু থেকে অমৃতে, অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে না যায়। ভগবানকে জানলে জীব নিজেকে জানতে পারবে—তখন ছুটি। স্থূল দেহে শেষ জন্ম সাধারণত এইসব গ্রহে হয়—এখানে আত্মদর্শনের ও সাধনার সুযোগ ও সময় অনেক বেশী। দয়া করে বিশ্বের অধিদেবতা জ্ঞানী ও মুমুক্ষু জীবদের এখানে পুনর্জন্ম করান।"

বিভূতিভূষণ কল্পনাযোগে উপনিষদ বা পরবর্তীকালের বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব আর একালের বিজ্ঞান এক সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন। ইউরোপ বা আমেরিকায় প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে যেসব গবেষণা চলেছে তা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল কিনা বলা কঠিন। 'মিডিয়াম'-এর সাহায্যে প্রেতাত্মার সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের যে প্রয়াস কোন কোন মহলে অনুশীলিত বিভূতিভূষণ সে সম্পর্কে নীরব। আধুনিক প্রেততত্ত্বের চেয়ে দার্শনিক পরলোকতত্ত্বই যে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি তত্ত্বান্বেষী না হলেও ভারতীয় দর্শনের অনুরাগী বা কৌতূহলী পাঠক ছিলেন। উপনিষদ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে দর্শনবিদ্ হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'উপনিষদ-জীবতত্ত্ব' তিনি পড়েছিলেন কিনা জোর করে বলা যায় না, তবে এই গ্রন্থে যে বিভিন্ন লোকের কল্পনা আছে তার সঙ্গে দেবযানের মূলগত কল্পনার অনেকটা মিল দেখা যায়।

বিভূতিভূষণ শুদ্ধমাত্র কৌতূহলের বশে কথাসাহিত্যের একটি নতুন ক্ষেত্রে বিচরণ করার আগ্রহ নিয়েই যে 'দেবযান' রচনা করেছিলেন এরকম অনুমান করা অসঙ্গত। এই উপন্যাসে তিনি একটি অভিনব পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে পাঠককুলের মনোহরণ করতে চান নি ; তিনি গভীর জীবনদৃষ্টির প্রেরণাতেই এই উপন্যাস রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাতিস্মর' প্রমুখ গল্পগুলির সঙ্গে 'দেবযান'-এর মৌলিক পার্থক্য আছে। শরদিন্দু ঐ গল্পগুলি মধ্যে অপূর্ব শিল্প-সৌন্দর্যের পরিচয় দিলেও ঐগুলির মধ্যে জীবনের

তাৎপর্য বা পরিণতি সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসা নেই। সেখানে যে জীবনদর্শন আছে তা প্রকাশ করার জন্যে জন্মান্তর তত্ত্বের অবতারণা করার প্রয়োজন ছিল না। বিভূতিভূষণ 'দেবযান' উপন্যাসের মধ্যে পরলোকের চিত্রাঙ্কন করে তাঁর মনোগত সত্যানুভূতিকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাঁর অন্য রচনায় প্রকৃতির সৌন্দর্য বা মানুষের প্রেমে অবগাহন করে সৃষ্টিব্যাপী অন্তহীন আনন্দের সন্ধানের আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তাঁর সেই মৌলিক জীবনদৃষ্টি আবৃত হয়নি, তবে তিনি পরলোকতত্ত্ব বা কর্মফল-ভোগ-তত্ত্বের সঙ্গে মিশিয়ে ভারতীয় সাধনার চিরায়ত আদর্শের সঙ্গে নিজের কল্পনাকে সংযুক্ত করতেই বেশি উৎসুক হয়েছেন। উপনিষদিক ব্রহ্মবাদ, কট্টর অদ্বৈতবাদ, বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ সৃষ্টি সম্পর্কে একালের বৈজ্ঞানিক কল্পনা—অনেক কিছু উপাদান এক সঙ্গে মিশিয়ে তিনি যেন তাঁর স্বভূমিকা থেকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। উপন্যাসের মুখবন্ধ-রূপে তিনি উপনিষদ, গীতা এবং শ্রীঅরবিন্দ আর আঁরি বের্গসঁর রচনা থেকে অংশবিশেষ উৎকলন করেছেন। বের্গসঁকে বাদ দিলে অপর উৎসগুলির চরম সিদ্ধান্ত সৃষ্টির ব্রহ্মমুখীনতা। বিভূতিভূষণ দ্বৈতবাদেই বিশ্বাসী—অদ্বৈততত্ত্বে পর্যাবসান তাঁর কল্পনায় সৃষ্টির পরিণাম। 'দি লাইফ ডিভাইন' গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ যেমন সত্তার ক্রমোত্তরণের কথা বলেছেন, বিভূতিভূষণও তেমনই সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর পার হয়ে মানুষের ব্রহ্মলীনতার কল্পনা করেছেন। অবশ্য উপন্যাসের একেবারে শেষভাগে তিনি বেদান্তের বিবর্তবাদের যে কবিজনোচিত কল্পনা করেছেন তা বিশেষভাবে আকর্ষণীয়।—

"অনন্ত শয্যায় অনন্ত নিদ্রায় মগ্ন উনি। এক এক নিঃশ্বাসে যুগ-যুগান্ত কেটে যায়। তুমি ওঁর চরণ বন্দনা করবে? ওঁর উপাসনা হয় না। কে করতে পারে ওঁর উপাসনা? উনি কাউকে দেখেন না, কারো উপাসনা গ্রহণ করেন না। বিশ্বজগৎ ওঁর স্বপ্ন—উনি ঘুম ভেঙে জেগে উঠলে জগৎস্বপ্ন লয় হয়ে যাবে যে। সৃষ্টি অন্তর্হিত হবে।

কিন্তু তা হয় না—সৃষ্টিও অনন্ত, ওঁর সুপ্তিও অনন্ত। উনিই বিশ্বের আদি কারণ—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ক্ষীরোদশয়নশায়ী মহাদেবতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের। তুমি, আমি, স্বর্গ, নরক, জন্ম-মরণ, দেব-দেবী, ঈশ্বর, পাপ-পুণ্য, দেশ ও কাল—সবই ওঁর স্বপ্ন। সব তিনি। তিনি ছাড়া আর কিছু নেই—কে কার উপাসনা করবে? ওঁর স্বপ্ন ছাড়া আর উনি ছাড়া আর কি আছে?"

'দেবযান' উপন্যাস ছাড়াও অন্যত্র দু'এক জায়গায় এমন কিছু কিছু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। কিন্তু অতিপ্রাকৃত রস পরিবেশন করার দিকে বিভূতিভূষণ প্রায়ই মন দেন নি। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসে জিতু অলৌকিক বিষয় দেখেছে; কিন্তু সেখানে ভিন্নতর আবেদনই প্রধান। জিতুর অন্তর্মুখীন চিন্তাই "দৃষ্টিপ্রদীপ'-এর মুখ্য আকর্ষণ।

'মেঘমল্লার' গল্পটির কথাও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। মন্ত্র-বলে দেবীর আবির্ভাব ও বন্দীত্ব, মন্ত্রপূত জল ছিটানোর ফলে দেবীর মুক্তি ও প্রদ্যুম্নের পাষাণে পরিণতি গল্পটির মূল ঘটনা দু'টি অতিপ্রাকৃত। কিন্তু এই অতিপ্রাকৃত কাহিনীর বাতাবরণ মাত্র, প্রদ্যুম্নকে অবলম্বন করে যে একটি ললিতকরুণ বৈরাগ্যময় সুর ধ্বনিত হয়েছে সেইটাই এই গল্পের প্রাণ। 'শেষ লেখা' গল্পে অপ্রাকৃত বিষয় থাকলেও অতিপ্রাকৃত রস মুখ্য নয়। একালের অতিপ্রাকৃত রসের গল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরদার গল্পগুলির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ঐসব গল্পের সঙ্গে এই গল্পের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে।

অবশ্য কোন কোন গল্পে অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক পরিমণ্ডল প্রধান হয়ে উঠেছে। 'অলৌকিক' গল্পসংকলনে কয়েকটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে। তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'প্রত্নতত্ত্ব' গল্পে এক প্রত্নতাত্ত্বিক বন্ধু তাঁর স্বপ্নের কথা বলেছেন। ঐ স্বপ্নে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান আবির্ভূত হয়েছেন। 'হাসি'

গল্পটিতে অতিপ্রাকৃত রসের কিছুটা আবেদন আছে। সুন্দরবনের একাংশে গভীর রাত্রির অন্ধকারে জনহীন জনপদের ধ্বংসস্তূপের চারিপাশে ঘূর্ণায়মান কোন অভিশপ্ত অশরীরী আত্মার পৈশাচিক উল্লাসভরা অট্টহাসি এই গল্পে স্থান পেয়েছে। 'মুটি মন্তর' গল্পে অপ্রাকৃত ঘটনার মধ্য দিয়ে নীতিউপদেশ দেওয়ার প্রয়াস আছে। 'জহরলাল ও গড' প্রমুখ গল্পের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে।

'আরণ্যক' উপন্যাসে মাঝে মাঝে খণ্ডকাহিনীতে অতি-প্রাকৃতের আভাস আছে; অবশ্য সেখানে জনশ্রুতি বা ভিন্ন চরিত্রের উক্তিই প্রধান অবলম্বন। বিশেষত সমগ্র 'আরণ্যক' উপন্যাসটির মধ্যে এমন একটা অখণ্ড সুর ধ্বনিত হচ্ছে যে, স্বতন্ত্রভাবে কোন সুরকে বিশ্লিষ্ট করে দেখা সম্ভব নয়। 'কেদার রাজা' উপন্যাসের শেষে বারাহী দেবীর আবির্ভাবের কল্পনা কথাবস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করায় শেষপর্যন্ত অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসজনিত একটা সম্ভ্রমবোধ জাগে; তবে এখানে প্রত্যক্ষভাবে অলৌকিকের অবতারণা করা হয় নি।

বিভূতিভূষণ কত সহজে যে অতিপ্রাকৃত আর মানুষের মনের অচেতন বিশ্বাসকে মেলাতে পারতেন তার পরিচয় পাওয়া যায় 'খুঁটিদেবতা' গল্পে। এই গল্পে নন্দলালের স্ত্রী 'শেষ সম্বল গহনার বাক্স চুরি যাওয়ার' পর তক্তপোষের একটা বাঁশের খুঁটিকে সম্বোধন করে বলত—'ওগো খুঁটি, আমি তোমার কাছে দরখাস্ত করছি, তুমি এর একটা উপায় করে দাও, পায়ে পড়ি তোমার। একটা উপায় তোমায় করতেই হবে। আর কাউকে বলতে পারিনে, তোমাকেই বলচি।' যে মামাশ্বশুর গয়নার বাক্স চুরি করেছেন সেই রাঘব চক্রবর্তী চোদ্দ পনেরটি রাত অনিদ্রায় কাটাবার পর একদিন ভোরে দেখলেন, 'তাঁহার খাটের পাশের বাঁশের খুঁটিটা যেন ধীরে ধীরে একটা বিরাটকায় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার মাথার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল; ব্যঙ্গের সুরে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল—মূর্খ! ঘুমোবার ইচ্ছে থাকে তো কালই গয়নার বাক্স ফেরত দিস্। ভাগ্নে-

বউয়ের গহনা চুরি করেছিস, লজ্জা করে না।' অতিপ্রাকৃত এখানে চমক সৃষ্টি করেনি, সহজ বিশ্বাস অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করেছে।

৪

অধ্যাত্মচেতনা

'জহরলাল ও গড' গল্পটি কিছুটা কৌতুকের সুরে বলা হয়েছে। এই গল্পের প্রারম্ভে রাষ্ট্রনায়ক জওহরলালকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্যে অগণিত মানুষ স্টেশনে ভিড় করেছে। তাঁকে নিয়ে জনতা চলে যাওয়ার পর স্টেশন যখন ফাঁকা হয়ে গেছে তখন লেখক এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁর পরিচয় পেয়ে তিনি জেনেছেন যে, তিনি ভগবান। ভগবানের সঙ্গে তাঁর যে কথোপকথন হয়েছে তার মধ্যে স্মিত কৌতুকরস থাকলেও রঙ্গ বা ব্যঙ্গরসের কোনটিই নেই। গল্পটির শেষ দিকে ভগবান বলেছেন, 'ব্যাপার কি জানো, আদিম নীহারিকাটা ঘুরিয়ে দেবার পরে বিশ্বসৃষ্টি আপনা আপনি হচ্ছে, আমার কোনো কাজ নেই। আজ কোটি কোটি বৎসর ধরে বেকার বসে আছি। ঘুরে ঘুরে বেড়াই, কোথায় কি হচ্ছে দেখি। এখন আমি শুধু দ্রষ্টা ও সাক্ষী মাত্র। জগতে দেখতে পাই আমায় কেউ চায় না, কেউ বোঝে না—একা একা থাকি। সর্বত্রই আছি অথচ কেউ ফিরে চেয়েও দেখে না। কেউ মানে না আজকাল আর, বলে উনি তো বেকার। জগৎ আপনা আপনিই চলেচে, ওঁর আবশ্যকতা কি?'

এই ক'টি ছত্র পড়লে ঈশ্বর সম্পর্কে বিভূতিভূষণের কল্পনার কিছুটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। এই গল্পে ভগবানকে নিয়ে তিনি মৃদু কৌতুকের অবতারণা করেছেন বটে কিন্তু ভগবানকে তিনি উড়িয়ে দিতে চান নি। তিনি বিশ্বস্রষ্টারূপে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। অবশ্য এই বিশ্বাস লোকপ্রচলিত অর্থে ভক্তিতে পরিণত হয়

নি। বরং তিনি তামসিক ভক্তির বিপক্ষেই ছিলেন। 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' গল্পে তিনি জনৈক বিধবার ব্যাপকার্থে কাশীর তথাকথিত পারলৌকিক সদগতিকামী সমাজের আচরণের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। কাশীধামে প্রাণহীন, আচারসর্বস্ব, বাগাড়ম্বরময় ধর্মজীবনের ভানের চেয়ে বাংলার পল্লীতে সহজ জীবনযাত্রার মধ্যে অবগাহন যে শ্রেয় এইটাই এই গল্পের বিষয়বস্তু। তিনি প্রত্যক্ষভাবে ধর্মের বহিরঙ্গ অনেক ব্যাপার অনুমোদন করেন নি। 'হে অরণ্য, কথা কও' দিন-লিপিতে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথের মন্দির দেখে মুগ্ধ হওয়ার কথা তিনি স্বীকার করেছেন,—

"সন্ধ্যায় জগন্নাথের মন্দির দেখে এলুম। শ্রীচৈতন্য যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন, সে স্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে সর্বশরীর যেন অবশ হয়ে গেল।"

কিন্তু ঐ মুগ্ধতা ভক্তিরসাবেশ নয়। একটু পরেই তিনি বলেছেন,—

"পাণ্ডারা এক স্থানে তাঁর আঙ্গুলের ছাপ দেখায়—আমার বিশ্বাস হোল না তাঁর আঙ্গুলের ছাপ—আর দেখালেই বা কি? শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন অধ্যাত্ম বিষয়ে পথ দেখাতে, ধর্ম-উপদেশ দিতে। তাঁর প্রচারিত নামধর্মের মাহাত্ম্য কেউ যদি ভাল না বোঝে, তবে তাঁর আঙ্গুলের ছাপ দেখে সে কোন্ স্বর্গে যাবে?"

'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপিতে তিনি লোকায়ত ভক্তিবিহ্বলতার তীব্র নিন্দা করেছেন। বিভূতিভূষণ সমাজবীক্ষক ছিলেন না, কিন্তু অন্ধবিশ্বাস 'যে কী ভাবে জাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঐ অন্ধবিশ্বাসই দৃষ্টির সহজ উন্মেষের প্রতিবন্ধক।—

"কতকগুলো মিথ্যা সংস্কার ও কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাস ওঝার প্রচলিত কতকগুলো False Philosophy এদেশের অশিক্ষিতা মেয়েদের মনের সর্বনাশ করেচে। জীবনের সহজ দর্শন এদের নেই,

বুড়ো বয়সেও ভাল করে এখনও চোখ ফোটেনি—কি করা যায় এদের জন্যে, সর্বদাই সে কথা ভাবি। শিক্ষা দ্বারা মানুষ নিজেকে পায়। এইটাই জীবনের বড় লাভ। ভগবানকে পাবার আগে নিজেকে লাভ করা যে আবশ্যক তা এরা ভুলে গিয়ে শুধু ভগবান বলে নাকে কাঁদতে থাকে, নিতান্ত দুর্বল জড়মতির মত।"

ভক্তিগদ্‌গদতার লোকপ্রিয় আদর্শকে তিনি স্বীকার করেন নি। তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদী ছিলেন না বটে কিন্তু সতেজ জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে যে জীবনের পরম সত্যকে লাভ করা যায় এই সত্য বিশ্বাস করতেন। তামসিকতাকে তিনি মনেপ্রাণে অবজ্ঞা করেছেন, রাজসিকতাও তাঁর অভিপ্রেত ছিল না; সাত্ত্বিকতার মধ্যে যে একটা প্রবল শক্তি আছে, তারই প্রেরণায় তিনি জীবনরহস্যের উন্মোচনে প্রয়াসী হতে বলেছেন। 'আরণ্যক' উপন্যাসে তাঁর উক্তি,—

"শুধু যে আত্মা নিরলস অবকাশ যাপন করে জ্ঞানের আকুল পিপাসায়, যার প্রাণ বিশ্বের বিরাট ও ক্ষুদ্রত্বের সম্বন্ধে সচেতন আনন্দে উল্লসিত—জন্মজন্মান্তরের পথ বাহিয়া দূর যাত্রার আশায় যার ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বর্তমানের দুঃখ, শোক বিন্দুবৎ মিলাইয়া গিয়াছে—সে-ই তাঁদের সে রহস্যরূপ দেখিতে পায়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

ভক্তিমূঢ়তাকে নিন্দা করলেও বিভূতিভূষণ, শিক্ষাহীন হলেও মানুষের প্রাণের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষাকে মুহূর্তের জন্য উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করেন নি। 'কেদার রাজা' উপন্যাসে দেখি যে, গল্পের নায়িকা শরৎ প্রচলিত ধারণা অনুসারে শিক্ষাহীনা হলেও মনের সুতীব্র আগ্রহে কালিঘাটের মন্দিরে এক অপূর্ব প্রেরণা পেয়েছে।—

"মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে একজন সন্ন্যাসিনী ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে—ওর নজর পড়লো। তার চারি পাশ ঘিরে অনেক মেয়ে-ছেলে জড় হয়ে কেউ হাত দেখাচ্ছে, কেউ শুধু ওষুধ নিচ্ছে, কেউ বা শুধু কথা শুনচে। শরৎ সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে এই দেবমন্দিরের পবিত্রতা অনুভব করতে চাইছিল—যে ঘরে সে আজ দু'দিন কাটিয়ে

এসেছে তার সমস্ত গ্লানি, অপবিত্রতা, পাপ এই দেবায়তনের ধূপধুনার সৌরভে, শঙ্খঘণ্টার ধ্বনিতে, সমবেত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণের নিবিড় আগ্রহে যেন ধুয়ে যায়, মুছে যায়, শুভ্র হয়ে ওঠে, নির্মল হয়ে ওঠে। কালীঘাটের মন্দিরের সেবকদের লোভ যেখানে উগ্র, পূজার্থীদের অর্থ শোষণ করবার হীন আকাঙ্ক্ষা সব ছাপিয়ে যেখানে প্রবল হয়ে উঠেচে—পূজার মধ্যে ব্যবসা এসে ঢুকেচে—সে সব দিক পল্লীবাসিনী শরতের জানা নেই। তার মুগ্ধ মনের ভক্তি ওর চোখে যে অঞ্জন মাখিয়েচে, তার সাহায্যে প্রাচীন ভারতের সংস্কারপূত বাহান্ন পীঠের এক মহাপীঠস্থান জাগ্রত হয়ে উঠেচে ওর মনে, বুদ্ধদেবের সেই অমর বাণী "মনই জগতকে সৃষ্টি করে"—শরতের মনে মহারুদ্রের চক্রছিন্ন দক্ষকন্যা সতীর দেহাংশ সতীনারীর তেজ ও পাতিব্রত্যের প্রতীক স্বরূপ এখানকার মাটিতে আশ্রয় নিয়েচে। এই মাটি তার মনে তেজ ও বল দিক।"

বিভূতিভূষণ দার্শনিক বা অধ্যাত্মসাধক ছিলেন না—প্রচলিত অর্থে ধর্মপ্রাণও ছিলেন না। তাঁর অধ্যাত্মচেতনা তাঁর জীবনানুভূতির সঙ্গে জড়ানো। তিনি বিশ্বের বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্য থেকে আনন্দ অনুভব করতে চেয়েছিলেন। সৃষ্টির বিচিত্র রূপ দেখার যে আকুল আগ্রহ তাঁর কবিচিত্তে ছিল তারই প্রেরণায় তিনি ভগবানকে সৃষ্টির মধ্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। 'আরণ্যক' থেকে একটি অংশ,—

"কতবার এই ক্ষান্তবর্ষণ মেঘ থমকানো সন্ধ্যায় এই মুক্ত প্রান্তরে সীমাহীনতার মধ্যে কোন দেবতার স্বপ্ন যেন দেখিয়াছি—এই মেঘ, এই সন্ধ্যা, এই বন, কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্প, মঞ্চী, রাজু পাঁড়ে, ভানুমতী, মহালিখাপুরের পাহাড়, সেই দরিদ্র গোঁড় পরিবার, আকাশ, ব্যোম সবই তাঁর সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত—তাঁরই আশীর্বাদ আজিকার এই নবনীল নীরদমালার মতই সমুদয় বিশ্বকে অস্তিত্বের অমৃতধারায় সিক্ত করিতেছে—এই বর্ষা-সন্ধ্যা তাঁরই প্রকাশ, এই মুক্ত জীবনানন্দ

তাঁরই বাণী, অন্তরের অন্তরে যে বাণী মানুষকে সচেতন করিয়া তোলে।' সে দেবতাকে ভয় করিবার কিছুই নাই—এই সুবিশাল কুলকিয়া বইহারের চেয়েও, ঐ বিশাল মেঘভরা আকাশের চেয়েও সীমাহীন, অনন্ত তাঁর প্রেম ও আশীর্বাদ। যে যত হীন, যে যত ছোট, সেই বিরাট দেবতার অদৃশ্য প্রসাদ ও অনুকম্পা তার উপর তত বেশী।

আমার মনে যে দেবতার স্বপ্ন জাগিত তিনি যে শুধু প্রধান বিচারক, ন্যায় ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কিংবা অব্যয়, অক্ষয় প্রভৃতি দুরূহ দার্শনিকতার আবরণে আবৃত তাহা নয়—নাড়া বইহারের কি আজমাবাদের মুক্ত প্রান্তরে কত গোধূলিবেলায় রক্ত মেঘস্তূপের, কত দিগন্তহারা জনহীন জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া মনে হইত তিনিই প্রেম ও রোমান্স, কবিতা ও সৌন্দর্য, শিল্প ও ভাবুকতা—তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, সুকুমার কলাবৃত্ত দিয়া সৃষ্টি করেন, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া থাকেন নিঃশেষে প্রিয়জনের প্রীতির জন্য—আবার বিরাট বৈজ্ঞানিকের শক্তি ও দৃষ্টি দিয়া গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকার সৃষ্টি করেন।"

বিভূতিভূষণের অধ্যাত্মচেতনা হিন্দুসমাজে অধুনা প্রচলিত লোকায়ত ধারণা থেকে উদ্ভূত নয়। লোকসমাজে ধর্মের যে রূপ প্রচলিত তার বিরুদ্ধে তিনি অবশ্য প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নি, কিন্তু তাঁর অন্তরে যে অধ্যাত্মচেতনা ছিল তা লোকায়ত স্থূল ধারণা থেকে একেবারে পৃথক। তাঁর ঐ চেতনার মূলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রেরণা কতখানি ছিল বলা কঠিন, কারণ রবীন্দ্রনাথ রূপময় সৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হলেও অরূপের উপাসক ছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের অনুবর্তী হওয়ার জন্যই হোক বা নিজের কল্পনার বিশেষ প্রবণতার জন্যই হোক, তাঁর ভগবান উপনিষদের ব্রহ্ম; অবশ্য ঐ ব্রহ্ম কেবল নির্গুণ নন, রবীন্দ্রনাথ সগুণ ব্রহ্মের কল্পনার দিকেই পক্ষপাত দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনা থেকে বিভূতিভূষণের চেতনার মূল পার্থক্য এই যে, বিভূতিভূষণ অরূপের

কল্পনা করতে চান নি—বিমূর্ততা তাঁর কল্পনার অনুগত ছিল না। ‘ঊর্মিমুখর’ দিনলিপিতে তিনি স্পষ্টই বলেছেন,—

“দেখলুম ভেবে নিরাকার ভগবানকে আমি বুঝিনে, তার ধারণাও করতে পারিনে—God as pure Spirit তাঁকে বুঝতে পারবো না যতক্ষণ তাঁর রূপ না পাচ্ছি। যখন তিনি নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে আসবেন তখন তাঁকে আমরা ভক্তি করতে পারি। কেন না, মানুষ নিরাকার নয়। সে কখনও এমন জীবের কল্পনা করতে পারবে না যার প্রাণ আছে, মন আছে অথচ আকার নেই। নিরাকার ভগবানের উপাসনা কি সোজা ব্যাপার?”

বিভূতিভূষণের কবিপ্রকৃতি সৃষ্টির বিচিত্রতাকে হৃদয়ে বরণ করতে উৎসুক হয়েছিল। তিনি সৃষ্টির অজস্র রূপকে একটি অখণ্ড আনন্দের সঙ্গে অন্বিত করে অনুভব করতে চেয়েছেন। প্রকৃতি, মানুষ, স্রষ্টা—তাঁর চেতনায় সবই যেন একটি পরিপূর্ণ অনুভূতিরূপে প্রকাশিত হয়েছে। যৌবনের দিনলিপি ‘স্মৃতির রেখা’ থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা হল।—

“বৎসরে বৎসরে এ রকম কত বসন্ত আসে—কত নতুন মুখের আশা, কত নতুন স্নেহ প্রেম—মাথার উপরে নিঃসীম নীল শূন্য অনন্তের প্রতীক—এই নীল আকাশের তলে বৎসরে বৎসরে এরকম কচিপাতা ওঠা গাছপালা, বনফুলের ঝোপের নীচে বৈঁচি ঝাঁড়া বাঁশবনের আড়ালে যে শান্ত জীবনগতি বহুদিন ধরে ছাতিম বনের আম বনের ছায়ায় ছায়ায় বেয়ে চলেছে, তারই কথা লিখতে হবে। ওদের হাসিখুশি ছোটোখাটো সুখদুঃখ, আশাভরসার যে কাহিনী, ওই দিয়ে দিতে হবে—তাদের জীবনের যে দিক আশাহত ব্যর্থতায় দীনতায় চোখের জলে অপমানে উদাসকরুণ, চাঁদের আলো যাদের চোখের জলে চিক্ চিক্ করে, ফাল্গুন দুপুরের অলস গরম দমকা হাওয়ায় যাদের দীর্ঘশ্বাস ভেসে বেড়ায়, নিস্তব্ধ শান্ত সন্ধ্যা যাদের মনের মত ঝুলি ঝুলি অন্ধকারভরা নির্জন—তাকেই আঁকতে হবে—মানুষের সেই suffering এত বড়।

বেড়াতে বেড়াতে চারধারের কাশজঙ্গলের গন্ধ ভেসে আসছে। চড়ুই পাখী কিচ্ কিচ্ করছে। সন্ধ্যার শান্তি ও অন্ধকার—অনেক দূরে এই ফাল্গুন মাসে দখিন হাওয়া বইছে। রাঙা কাঞ্চনফুলের ছায়া পুকুরের জলের ওপরে পড়েছে। ভিজে কাপড়ে বধূরা ঘাট থেকে বাড়ী যাচ্ছে। আর এখানে? এখানে চারদিক কাশের গন্ধে ভরপুর। মহিষের ধুরুইরা চিৎকার করছে। হুহু পশ্চিম বাতাসে বালি উড়ে চারদিক অন্ধকার করে দিয়েছে। ঝাউয়া থুবড়ী রামজোত, লোধাই এই বসন্ত; এই নেবুফুল, সৃষ্টির আনন্দ—এই সব তুচ্ছ জিনিসে মাদকতাময় আনন্দ madging of life যুগে যুগে বিবর্তনে এ রকম আসবে—এই আনন্দ, এই উৎসব, যুগযুগের মাঝখান দিয়ে অনন্তকাল ধরে চলেছে—তারই মধ্যে জন্মেছি আমি—এ রকম কত যাবো, কত আসবো—কত চড়কে কলেজ স্কোয়ারে বেড়াবো, কত সরস্বতী পূজায় গান শোনা, কত 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে,' কত Abyssinian horseman, কত চাপা পুকুর, কত অন্ধকারময়ী রাত্রি। কত বর্ষা-সন্ধ্যায় কত অজানা বঁধুর গল্পমিলন, কত জনের বাহুতে বাহুতে বাঁধা কত উৎসবের দিন—কত সুকুমার, কত হুগলী ব্রিজ, কত কেওটায় সিঞ্চেতার গন্ধ, কত গুডফ্রাইডের ছুটিতে ছায়া-ভরা বৈকালে বোর্ডিং থেকে বাড়ী যাওয়া, কত ফাগুন দিনে প্রতিভা-সুন্দরীর পড়া, কত জানালায় ধূপগন্ধ—কত জন্মের মধ্য দিয়ে বারে বারে জন্ম থেকে জন্মান্তরে নূতন নূতন আজানা মায়েদের কোলে শিশু হয়ে আসা-যাওয়া, নব নব জীবনের অনন্ত উচ্ছ্বস-আনন্দ।

হে আনন্দময়, যুগে যুগে তোমার মহারহস্যময় জীবনধারা বিজয়বৎ, বিমৃত্যু, বিশোক, পথহীন, মহাপথ ছেয়ে কত কল্প, মন্বন্তর মহাযুগের মধ্য দিয়ে, শত সহস্র জন্মমৃত্যুর মাঝখান দিয়ে কোথায় যে ভেসে চলেছে।

নিয়ে চল, নিয়ে চল, নিয়ে চল,

মহাকালের মহাকলরবের মধ্য দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চল—

অনন্ত নীল ব্যোম-সমুদ্রে এখানে ওখানে পাটকিল রংয়ের মেঘদ্বীপের দিকে।"—ভাগলপুর, ৬. ২. ১৯২৬।

কালে কালে পরিবর্তমান বিরাট সৃষ্টির সঙ্গে আনন্দের যোগ-কল্পনাই বিভূতিভূষণের অধ্যাত্মধ্যান। পরম ঐশ্বর্যময় ভগবান যিনি, তিনি এই বিশ্বের উপাদান-কারণ কিনা সে প্রশ্ন তাঁর অন্তরে জাগে নি; তিনি কেবল্ তাঁকে সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণরূপে, স্রষ্টারূপে উপলব্ধি করে তাঁর সঙ্গে আপনার হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপন করতে উৎসুক হয়েছেন। বৈষ্ণবের সাধ্য-সাধনতত্ত্বের (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ) স্তরভেদ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন কিনা বলা কঠিন, কিন্তু আপনার কল্পনায় তিনি ভগবানের সঙ্গে প্রেমের যোগের সত্যটি অনুভব করেছেন। তাঁর শেষ বয়সের 'ইছামতী' উপন্যাসের নায়ক ভবানীর চিন্তা অনুসরণ করলে তাঁর অধ্যাত্মচেতনার পরিণত রূপের পরিচয় পাওয়া যাবে। দু'টি উদ্ধৃতি,—

[ক] "আজকের এই সঙ্গীত, জীবজগতের এই পবিত্র অনাহত ধ্বনি আজ যেসব কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে পাঁচশত কি হাজার বছর পরে সেসব কণ্ঠ কোথায় মিলিয়ে যাবে? ইছামতীর জলের স্রোতে নূতন ইতিহাস লেখা হবে জলের বুকে।

আজ এই ক্ষুদ্র বালক ও তার পিতা অপরাহ্ণে নদীর ধারে বসে আছে, কত স্নেহ, মমতা, ভালবাসা ওদের মধ্যে—সে কথা কেউ জানবে না।

কেবল থাকবেন তিনি, সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তনীয়, সমস্ত গতিশীলের মধ্যে স্থিতিশীল তিনি। ঈশ্বর, ব্রহ্ম, জ্যোতিঃ-স্বরূপ, এ মানুষের মনগড়া কথা। সেই জিনিস যা এমন সুন্দর অপরাহ্ণে ফুলে-ফলে, বসন্তে লক্ষ লক্ষ জন্মমৃত্যুতে, আশায় স্নেহে, দয়ায়, প্রেমে, আবছায়া ধরা পড়ে, জগতের কোনো ধর্মশাস্ত্র সেই জিনিসের স্বরূপ কি তা বলতে পারেনি, কোনো ঋষি, কোনো মুনি,

সাধু যদি বা অনুভব করতে পেরেও থাকেন, মুখে প্রকাশ করতে পারেন নি,—কি সে জিনিস তা কে বলবে?

তবু মনে হয় তিনি যত বড় হোন, আমাদের সগোত্র। আমার মনের সঙ্গে, সেই শিশুর মনের সঙ্গে সেই বিরাট মনের কোথায় যেন যোগ আছে। ভগবান যে আমাকে সৃষ্টি করেচেন শুধু তা নয়—আমি তাঁর আত্মীয়। কোটি কোটি তারার দ্যুতিতে দ্যুতিমান সে মুখের দিকে আমি নিঃসঙ্কোচে প্রেমের দৃষ্টিতে চেয়ে দেখবার অধিকার রাখি, কারণ তিনি যে আমার বাবা। হাতে গড়া পুতুলই নয় শুধু তাঁর—তাঁর সন্তান। এই খোকা তাঁরই এক রূপ। এর অর্থহীন হাসি, উল্লাস তাঁর নিজেরই লীলা—উজ্জ্বল আনন্দের বাণীমূর্তি।"

[খ] "জন্মজন্মান্তরে অনন্ত পথহীন পথে অতি নীচ পাপীরও হাত ধরে অসীম ধৈর্যে, অসীম মমতায় তিনি স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেন। তাঁর এই ছেলের প্রতি যে মমতা, তেমনি এই মহাশক্তির মমতা সমুদয় জীবকুলের প্রতি। চমৎকার নির্ভরতার ভাব ভবানী বাড়ুজ্যে মনের মধ্যে খুঁজে পেলেন সেই মহাশক্তির ওপর। কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। স্তনন্ধয়ানাং স্তনদুগ্ধপানে, মধুব্রতানাং মকরন্দপানে—নেই কি তিনি সর্বত্র? নেই কোথায়?"

বিভূতিভূষণের এই চেতনাটি ভারতীয় কল্পনার সঙ্গে অবিরুদ্ধ, আবার এর মধ্যে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। উপনিষদের 'সর্বংখল্বিদংব্রহ্ম' এই সূত্রটিকে তিনি যেন বৈষ্ণবীয় ভাগবত বোধের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য এই মেলানোর ভার নিয়েছে তাঁর আনন্দপিপাসু অপরূপতামুগ্ধ কবিহৃদয়। এইজন্য তিনি পারমার্থিক মুক্তির জন্য উদগ্রীব হন নি—সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার যে লীলারূপ প্রকাশিত তার সঙ্গে হৃদয়গত যোগের ফলে আনন্দের অনুভূতিই তাঁর দৃষ্টিতে অধ্যাত্মসাধনায় সিদ্ধির সমমূল্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। যেখানে এই অনুভূতি বাধাগ্রস্ত সেখানে মানুষ মহৎ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে জীবযাত্রা নির্বাহ করে মাত্র। 'কুশল পাহাড়ী'

গল্পে বিভূতিভূষণ সুন্দরগড়ের অরণ্যভূমির সাধুর মুখে যে উক্তি বসিয়েছেন, তার মধ্যে তাঁর নিজেরই চেতনা প্রকাশিত হয়েছে।—

"মুক্তির ধারণা বন্ধন আছে বলেই আসে। যথার্থ বিচারের দৃষ্টিতে মানুষের মুক্তি নেই, বন্ধনও নেই। ব্রহ্ম এক অচিন রাজ্য, যে সেখানে যায়, সেই বোঝে ব্রহ্ম দ্বৈতও নয় অদ্বৈতও নয়। তিনি শাস্ত্রেরও পারে, বাদানুবাদেরও পারে, দ্বৈতবাদের প্রতিপাদ্য নয়, অদ্বৈতবাদেরও প্রাপ্য নয়। অনুভূতিই একমাত্র জিনিস। মানুষ মুক্ত আছেই, কেবল সে সম্বন্ধে সচেতন নয় সে। মানুষ সদামুক্ত, সে মানুষ। কিছু পড়তে হবে না। কিছু সাধনা করতে হবে না। অনুভূতিই উত্তরায়ণের সেই অভিযাত্রী, যা তাকে পলকে মুক্তির জ্যোতির্লোকে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারে। বিশ্বাস কর বাবা। মানুষ মুক্ত। সেই নিজেকে নিজে বেঁধেছে। সে অনুভব করুক সে মুক্ত। সে মানুষ, সে মুক্ত।"

৫

পথের বাঁশি

'পথের পাঁচালী'র শেষ পাতায় বিভূতিভূষণ পথের ডাক শুনিয়েছেন। প্রাণের মধ্যে নিশ্চিন্দিপুরের ডাক শুনতে পেয়ে অপু মনে করেছিল যে কাশী থেকে বাংলার পল্লীতে ফিরে এলেই সে জীবনের সব সম্পদ পাবে। কিন্তু গ্রামের নিভৃত কোণই জীবনের সর্বস্ব নয়।—

"পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায়, কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়? তোমাদের সোনা-ডাঙার মাঠ ছাড়িয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে,

বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, পার হয়ে চলে যায়…তোমাদের মর্মর জীবনস্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভরে আসে, পথ আমার তখনও ফুরায় না…চলে…চলে …এগিয়েই চলে…।

অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্তকাল আর অনন্ত আকাশ…

সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া করে এনেছি…

চল এগিয়ে যাই।"

এরই পাশাপাশি তাঁর পরিণত বয়সের দিনলিপি বা ভ্রমণ-কথা 'বনে পাহাড়ে' থেকে একটি ছত্র উদ্ধার করা যেতে পারে।—

"আমার একটা খারাপ অভ্যেস, যেখানে যত ভাল জায়গা দেখবো, সেখানেই আমার ইচ্ছে হবে যে বাড়ী তৈরী করি।"

এই দু'টি উদ্ধৃতির সুর প্রথমটা আলাদা বলে মনে হলেও আসলে দু'টির মূলে একই চেতনার ক্রিয়া আছে। প্রথমটির মধ্যে চলার আনন্দের সুর সুস্পষ্ট—পথ যে তাঁকে ডাক দিয়েছে তা অনুভব করা কঠিন নয়। 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখেছেন,—

"চরন্ বৈ মধু বিন্দতি,' চলার দ্বারাই অমৃতলাভ হয়, অতএব চলো।"

এখানেও সেই চলার আনন্দের, পথের অমৃতের আভাসই ফুটে উঠেছে। 'পথের বিচিত্র আনন্দযাত্রা'র আহ্বান বিভূতিভূষণের মর্মকে স্পর্শ করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ যাত্রা অনন্ত শূন্যের মধ্যে নয়। নিছক চলতার আদর্শে বিভূতিভূষণের আস্থা ছিল না। যে চলা থেকে মধু নিঃসৃত হয় সেই চলা অন্ধগতির নেশা নয়, তার সঙ্গে বিশ্বের বিচিত্র রূপের পরিচয়ের আনন্দ মিশে আছে বলেই ঐ চলা অমৃতময়। বিভূতিভূষণ ঘর তৈরি করে কোন বিশেষ একটি জায়গায় বাসা বাঁধতে চান নি। তিনি ঘর বাঁধতে চান দেশে দেশে

—যেখানে বিশ্বপ্রকৃতি তার অন্তহীন সৌন্দর্য উদঘাটিত করে দিয়েছে। ঐ সৌন্দর্য তাঁকে আকৃষ্ট করে বলেই তাঁর ইচ্ছে হয় যে বাড়ি তৈরি করে সেখানে বাস করবেন। বাস্তবিকপক্ষে তাঁর ঐ বাসা পান্থ-নিবাস ছাড়া আর কিছুই নয়। দু'দিনের পান্থশালায় বসে তিনি প্রাণভরে বিশ্বের সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান। তা না হলে বাসা বেঁধে অনড় হয়ে বসে থাকার তাগিদ তাঁর অন্তরে নেই। পথ চলে সৌন্দর্যের বিচিত্র স্বাদ পাওয়াই তাঁর কবিমর্মের বাসনা।

পথ চলা তাঁর কাছে নিছক ভ্রমণের নেশা ছিল না। একালে ভ্রমণ অনেকের কাছে একটা নিরর্থক বিলাস। শুদ্ধমাত্র পথের দৈর্ঘ্য মেপে বড়াই করবার জন্যে ভ্রমণ নয়। দু'টি দিনলিপির দু'টি উদ্ধৃতি থেকে ভ্রমণ সম্পর্কে তাঁর ধারণার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে।—

[ক] "কেন মানুষ ঘরে থাকে তাই ভাবি। আর কেনই বা পয়সা খরচ করে মোটরে কি রেলের গাড়ীতে বেড়ায়? পায়ে হেঁটে পথ চলার মত আনন্দ কিসে আছে? সে একমাত্র ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ঘোড়ায় চড়ার আনন্দ আমি জানি। তার সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না।"—উর্মিমুখর।

[খ] "এদের দেশভ্রমণেও যেতে দেখেচি ফার্স্ট ক্লাস কামরায় চেপে, দশ দিনের ভ্রমণে দুই হাজার টাকা ব্যয় করে, মোটরে করে যাবতীয় স্থান এক নিঃশ্বাসে বেড়িয়ে। বিলাতী হোটেলে খানা খেয়ে, হুইস্কি টেনে—সেও ঐ ভেড়ার দলের ভেড়ার মত বেড়ানো।

আজ বসে বসে শুধু মনে হচ্ছিল অনেক দিন আগে বাল্যের নবীন মধুর বর্ষার বৈকালগুলি—কি ছায়া পড়তো, কি পত্রপুষ্পের সুগন্ধ বেরুতো—কি পাখীর গান হোত—জীবনের সম্পদ হোল সে সব—এক মুহূর্তে জীবনকে বাড়িয়ে তোলে, বৃদ্ধিশীল করে—আত্মার পুষ্টি ওখানে। ধ্যান অর্থাৎ Contemplation চাই, আনন্দের অবকাশ চাই—তাই হোলো আত্মার পুষ্টি—টাকা রোজগারের ব্যস্ততায় দিনরাত্ত কাটিয়ে দেওয়ায় নয়।"—তৃণাঙ্কুর।

এ ধ্যান বা আনন্দের অনুভূতির অবকাশ না থাকলে ভ্রমণ নিষ্ফল। বিভূতিভূষণ এই জন্য দল বেঁধে ভ্রমণের চেয়ে একলা ভ্রমণ পছন্দ করেছেন; মোটর বা ট্রেনের চেয়ে পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণ পছন্দ করেছেন; কারণ ঐভাবে ভ্রমণেই দেখা আর অনুভব হু'টিরই অবকাশ থাকতে পারে। আমেরিকার লেখক থোরোর কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসে—তিনিও বিভূতিভূষণের মতো প্রকৃতির বুকে ঘুরে বেড়াতে একান্ত উৎসুক ছিলেন। বিভূতিভূষণ থোরোর রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা জানা নেই, তবে প্রকৃতির রাজ্যে যাঁরা বিচরণ করেছেন তা সে দর্শকরূপেই হোক বা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিয়েই হোক, বিভূতিভূষণ তাঁদের লেখা সাগ্রহেই পড়তেন। ঐ সব লেখা পড়েও তাঁর ভ্রমণ-পিপাসা পরিতৃপ্ত হত সন্দেহ নেই।

ভ্রমণের কাহিনী অবলম্বন করে লেখা হু'টি গল্পের কথা স্মরণ করা যেতে পারে—হু'টি গল্পই 'ক্ষণভঙ্গুর'-এর অন্তর্গত। 'সিঁদুরচরণ' গল্পে নায়ক।সিঁদুরচরণ গ্রাম্য কৃষাণ—শেষ বয়সে একবার পাট বিক্রি করে হুশো কুড়ি টাকা (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের আমলে) পেয়ে দেশ-ভ্রমণে বেরিয়েছে। তার 'বিখ্যাত ভ্রমণের ইতিহাস' এই কাহিনীর বিষয়বস্তু—অবশ্য ঐ ভ্রমণের কাল হয়তো মাস খানেকের কিছু বেশি, পাড়ির সীমা মাইল পঁচিশ-তিরিশ হতে পারে। গ্রাম্য কৃষাণের জীবনের সংকীর্ণ পরিধির তুলনায় ঐ ভ্রমণই অসাধারণ। 'লোকে আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে বলে—ঐ লোকটা বাহাত্নরপুর গিয়েল। জোয়ান বয়সে ও বড্ড বেড়িয়েচে দেশ-বিদেশে।'—'বুধোর মার মৃত্যু' গল্পের নায়িকা বুধোর মার ভ্রমণের সীমা আর একটু বিস্তৃত—সে ভুবনেশ্বর পুরী গেছে। পুরীর সমুদ্র বা জগন্নাথের মন্দির দেখে তার বিস্ময়োক্তি আন্তরিক।—'ই কি কাণ্ড বামুন দিদি! এমন কখনো ঠাওর করিনি গাঁয়ে থাকতি।' 'কি কাণ্ড! অ্যাদ্দিন মরছিলাম ডোবায় বাঁশ বনে পচে, কত কি ত্থাখলাম।' 'ও বামুন দিদি, বড্ড ভালো লাগচে আমার। যে কড়া টাকা হাতে আছে,

তিথিধর্মেই খরচা করবো। কি ভাগ্যি ছেল আমার যে এখানে এনেচেন জগন্নাথ।'

সিঁদুরচরণ বা বুধোর মা, দু'জনের ক্ষেত্রেই ভ্রমণের পরিসর যতই পরিমিত হোক না কেন, বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় তাদের মনে অকৃত্রিম বিস্ময় সঞ্চার করেছে। এ বিস্ময়ের মূলে আছে অপূর্ব অনুভূতির আনন্দ। বিভূতিভূষণ সৃষ্টির অভিনব বিচিত্রতা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ একটি গানে বলেছেন—

আকাশভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥
অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার ভাঁটায় ভুবন দোলে,
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥

সৃষ্টির বিচিত্র লীলার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আনন্দময় বিস্ময়ের অনুভূতিই বিভূতিভূষণের কাম্য ছিল। বিস্ময়ানুভবই তাঁর কবি-প্রাণের স্বধর্ম। তাঁর কবিমর্ম বিচিত্র সৃষ্টির লীলায় অবগাহন করে বিস্ময়রসে অভিষিক্ত হতে চেয়েছে। বিপরীতক্রমে বলা যেতে পারে যে বিস্ময়রস অনুভব করার শক্তিই তাঁর কবিহৃদয়কে—সমগ্র জীবনচেতনাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। তাঁর প্রকৃতিপ্রেম, মানব-দর্শন, সৃষ্টিরহস্য-কল্পনা, অধ্যাত্মচেতনা—সবকিছুর মূলেই তাঁর ঐ

রহস্যানুভবের অসামান্য ক্ষমতা ছিল। ঐ বিস্ময়ানুভবের তাৎপর্য স্থষ্টির বিচিত্র রূপ দেখে সুগভীর অথচ হিল্লোলময় আনন্দধারায় সমগ্র সত্তার জাগরণ।

বিস্ময়ানুভবের ক্ষমতা যে মানুষের একটি অসামান্য শক্তি বিভূতি-ভূষণ নিজেও সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। 'অপরাজিত' উপন্যাসে তিনি বলেছেন,—

"বিস্ময় মনের অতি উচ্চ ভাব এবং উচ্চ বলিয়াই সহজলভ্য নয়। সত্যকার বিস্ময়ের স্থান অনেক উপরে—বুদ্ধি যার খুব প্রশস্ত ও উদার, মন সব সময় সতর্ক, নূতন ছবি, নূতন ভাব গ্রহণ করিবার ক্ষমতা রাখে—সে-ই প্রকৃত বিস্ময়রসকে ভোগ করিতে পারে। যাদের মনের যন্ত্র অলস, মিনমিনে—পরিপূর্ণ উদার বিস্ময়ের মত উচ্চ মনোভাব তাদের একেবারে অপরিচিত থাকিয়া যায়।

বিস্ময়কে যাঁহারা বলিয়াছেন Mother of Philosophy তাঁহারা একটু কম বলেন। বিস্ময়ই আসল Philosophy, বাকীটা তাহার অর্থসঙ্গতি মাত্র।"

অন্তরের সদাজাগ্রত কৌতূহল আর প্রাণের সজীবতা এই বিস্ময়কে নব নব উন্মেষময় করে তোলে। যার অন্তরে বিস্ময় নেই সে নিষ্প্রাণ। যার অন্তরে বিস্ময়ানুভবের শক্তি যত প্রবল তার জীবন তত পরিপূর্ণ। যে স্থষ্টির অফুরন্ত রহস্যের দিকে হৃদয় মেলে অপূর্বতার অনুভব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তার জীবনই সার্থক। 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপি থেকে বিভূতিভূষণের একটি উক্তি উদ্ধার করা হল,—

"আইনস্টাইন বলেচেন—বিস্মিত হবার ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা; যে কোনো কিছু দেখে বিস্মিত হয় না, মুগ্ধ হয় না, সে মৃত, সে বেঁচে নেই। আমাদের দেশের কেউ এ কথা বুঝবেন কি?

এই জন্যেই অল্প বয়সে আমাদের দেশে জীবনের ব্যবসায়ে দেউলে হয়ে পড়ে—নতুন বিস্ময়, নতুন অনুভূতি হয় না, নবতর জীবনের পথ চিরলুপ্ত হয়ে যায় তাঁদের কাছে—মানুষ দমে যায় জানি—কিছু কাল

পরে তার মনে সব শক্তি হয়তো ক্ষীণ হতে পারে মানি—কিন্তু জীবন্ত যে মানুষ, সে আবার জেগে উঠবে, সে আবার নবতর বংশীধ্বনি শুনবে—নবজীবনের সন্ধান পাবে। অপরাজিত প্রাণধারার কোন অদৃশ্য উৎস-মুখ আবার খুলে যাবে, বিজয় ও বিমৃত্যু আনন্দ তার চিরশ্যামল মনে আবার আসন পাতবে।"

সৃষ্টির বিচিত্র লীলা যে বিভূতিভূষণকে কতখানি আকৃষ্ট করেছিল তার আর একটি নিদর্শন তাঁর 'বিচিত্র জগৎ' গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ভূমিকায় প্রকাশকের নিবেদনের একাংশ,—

"বইখানির বিষয় নির্বচন ব্যাপারে কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। যে সব লেখক, পর্যটক, অভিযানকারী বা ভূতত্ত্ববিদ্দের প্রবন্ধ বা কাহিনী 'বিচিত্র জগৎ' রচয়িতার ভাল লেগেছে, নানাকারণে যে সব কাহিনী তাঁর বিচিত্র ও অপূর্ব মনে হয়েছে সে সবই তিনি তাঁর নিজস্ব অনুকরণীয় স্টাইলে মনোরম ভাষায় গল্পের মত বর্ণনা করেছেন।"

'বিচিত্র জগৎ' অবশ্য একেবারে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। এই সচিত্র বিরাট গ্রন্থটির কিছু অংশ 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় আর কিছু অংশ 'বিশ্বপ্রকৃতি' নামে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই রচনাগুলির নির্বাচনেও যেমন, পরিবেশনেও তেমনই বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

একদিকে তিনি যেমন ইউরোপ বা আমেরিকার আধুনিক জীবনে অগ্রসর দেশগুলির বৃত্তান্ত দিয়েছেন, অপর দিকে তিনি পৃথিবীর অপরিচিত বহু অংশের পরিচয়ও দিয়েছেন। 'বঙ্গবাসী'র পাঠক বালক অপু বিদেশের যে সব বিষয় একান্ত কৌতূহল আর ঔৎসুক্য নিয়ে পাঠ করেছে বিভূতিভূষণ যেন সেইগুলির বর্ণনা করেছেন। এ পত্রিকার পৃষ্ঠা ভরানো নয়। এই সব রচনার মধ্যে একদিকে যেমন তিনি নিজের বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তের বিচিত্র দেশের বিচিত্র আকর্ষণের প্রতি অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন, অপর দিকে তেমনই তিনি যেন তাঁর

সমকালের বা পরবর্তীকালের তরুণ মনে সজীব কৌতূহল জাগ্রত করার জন্য উপযুক্ত খোরাকের আয়োজন করেছেন।

এই বিস্ময়বোধ, এই মুগ্ধতা, বিশ্বজগতের সঙ্গে এই একাত্মতাবোধ বিভূতিভূষণের একাধারে প্রকৃতি আর চরিত্র দুই-ই। এই জন্যই ক্বচিৎ তাঁর লেখনী বিপথগামী হয়েছে, স্বমর্ম ও স্বধর্মবিরুদ্ধ রচনায় শক্তির অপব্যয় করে 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' হওয়ার দুর্ভাগ্য তাঁর হয় নি। তাঁর জীবনসাধনাও সৃষ্টির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করার পক্ষে একান্ত অনুকূল ছিল। 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপিতে তিনি বলেছেন,—

"এই পাখী, গাছপালা, নীল আকাশ, এই অপূর্ব সৌন্দর্য এসব যেন আমার জন্য সৃষ্ট হয়েছে। এ দেশেই তো এসব ছিল এতদিন, কেউ তো দেখেনি, কেউ তো ভোগ করেনি—এতকাল পরে আমি এদের বুঝলাম, এদের থেকে গভীর আনন্দ পেলাম, এদের রসধারা পান করে তৃপ্ত হলাম—এই জ্যোৎস্না, এই আকাশ, এই অপূর্ব ইছামতী নদী আমারই জন্য তৈরী হয়েছে।"

কেবল ইছামতীর কূলবর্তী পরিবেশ নয়, তিনি যেখানে সৌন্দর্যের ছবি, বিশ্বরূপের প্রকাশ দেখেছেন, সেখানেই তিনি আত্মময় আনন্দযোগ অনুভব করেছেন। বিশ্বপথিকের মতোই সৃষ্টিলীলায় তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল, কিন্তু আসক্তি ছিল না। সেইজন্যই তিনি গৃধ্নুর মতো কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চান নি, যে বিচিত্র তাঁর কাছে এসেছে, তাকেই ভালোবাসতে বাসতে 'পথের বিচিত্র আনন্দযাত্রা'য় অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর অন্তরে কোনো সংশয় বা দ্বন্দ্ব ছিল না; তাঁর প্রত্যয় ছিল গভীর।

সৃষ্টি

শিল্পভাবনা : শিল্পরূপ

..............................১..............................

শিল্প-ভাবনা

'স্মৃতির রেখা' দিনলিপির পরিশিষ্ট অংশে 'সাহিত্যের কথা' নামে একটি নিবন্ধ সংযুক্ত আছে। সেটি সাহিত্য সম্পর্কে বিভূতি-ভূষণের সচেতন চিন্তার নিদর্শন; অবশ্য সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর গভীর চেতনার সবটুকু পরিচয় সেখানে পাওয়া যায় না, তার কারণ এই যে, তিনি দার্শনিকের মতো তত্ত্বের সামগ্রিক মূর্তি রচনার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চান নি—সে প্রবণতা তাঁর ছিল না। তবে তাঁর নিজের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর চিন্তার কথা স্মরণ করে ঐ নিবন্ধটির কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করা হয়তো অসঙ্গত হবে না।—

"সাহিত্য যদিও সর্বসাধারণের মধ্যে আন্তরিক মিলনের যোগসূত্র-স্বরূপ, এবং যদিও তার চারপাশের মানুষকে বাদ দিয়ে এখানে কোনো সৃষ্টি সার্থক হওয়া দূরে থাকুক প্রায় সম্ভবই নয়, তবুও সাহিত্য-সৃষ্টি লোকালয়ের হাটের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে করবার নয়। কবি সাহিত্যিক আর্টিস্টদের মধ্যে এক ধরনের সহজাত নিঃসঙ্গতা থাকে। [তুলনীয়: 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপিতি এমার্সনের একটি উদ্ধৃতি, 'Every literary man should embrace solitude as a bride.'] স্বার্থক রসসৃষ্টি, সাধারণ দৈনন্দিন-জীবনোত্তীর্ণ বৃহৎ আনন্দলোকের আবাহন,—যার জন্য প্রতি শক্তিশালী কবিমানসেই অত্মপ্রকাশের প্রেরণাময় এক ধরনের অনির্দেশ্য ভাবাবেগ তাঁর শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিতে সঞ্চারিত হয়, ইহার জন্য আর্টিস্টের প্রয়োজন আপন 'আইডিয়ার' আবহাওয়ায় যত বেশীক্ষণ সম্ভব এবং যত গভীরতম-রূপে সম্ভব বাস করা। দুঃখ-বেদনা, হাসি-অশ্রু, সমস্যাবিজড়িত

অপরূপ মানুষের জীবন এবং জগৎ তার লেখার মালমসলা,—কিন্তু নিরাসক্ত আনন্দে তিনি সৃষ্টি করে চলেন। কবি-সাহিত্যিক আপনার জন্য লেখেন, সে হচ্ছে তাঁর আত্মপ্রকাশ, অস্তিত্বের সেই একমাত্র রূপের মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে উপলব্ধি করেন। কিন্তু সেই একই সঙ্গে তিনি সকলের জন্যই লেখেন। কারণ তিনি জানেন ভালবাসার আলোকক্ষেপ ব্যতীত দৃষ্টিতে সত্যকারের বর্ণ ফোটে না, প্রেম ও একধরনের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি ব্যতীত বাস্তব জগৎ এবং মানবহৃদয়ের গহনতম রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার নয়। আপনাকে প্রতি মুহূর্তে পূর্ণ করেন ও প্রতি মুহূর্তে তিনি আপনাকে অতিক্রম করে যান।…

বাঁধা রাস্তায় আমরা জন্মাই ও মরি—দু'পাশের এই চরম পরিচ্ছেদের মাঝখানের রাস্তাটায় আমরা যেভাবে চলি, তাতে যেন আমাদের স্রষ্টাকেই ব্যঙ্গ করা হয়। সাহিত্য তাই এই অতি-অভ্যাসে বদ্ধ ঝিমিয়ে আসা মনের পক্ষে আকাশ-স্বরূপ, দিগন্ত এখানে অত্যন্ত বিস্তৃত, আবহাওয়া সর্বদাই উজ্জ্বল, অজস্র খোলা জানালা দিয়ে অদৃশ্য কেন্দ্র থেকে প্রতিক্ষণে দিব্য যৌবনময় আলো আর চেতনা এসে ঝরে ঝরে পড়ে। এখানে জীবন অহরহ আপনাকে অত্যন্ত ঘন সুরে বিকশিত করে। জীবনের এই অতি বিরাট পটভূমিকার জগতে এসে পাঠক এক মুহূর্তে আপনাকে বড় করে পায়। দৈনন্দিন জীবনের পারিপার্শ্বিকতার সহস্র ক্ষুদ্রতা ক্লেদ গ্লানি পিছনে পড়ে থাকে—মানুষ খানিক ক্ষণের জন্য অন্ততঃ খণ্ড-কাল ও দেশের অতীত এক জ্যোতির্ময় চেতনান্তরের মধ্য দিয়ে অববাহিত হয়ে আসে। প্রত্যেকের আত্মসত্তার এই যে বিকাশের সম্ভাবনা, কাব্য ও সাহিত্য, তথা আর্টের অন্যান্য বিভাগ, এতে প্রত্যেককে অজান্তে প্রত্যক্ষরূপে সহায়তা করে।…

সাহিত্য আমাদের কল্পনা ও অনুভববৃত্তিকে উজ্জীবিত করে।…

কি জীবনে, কি সাহিত্যে—শক্তি ও প্রতিভার সঙ্গে প্রেম ও সত্যবুদ্ধি যুক্ত না হলে স্থায়ী বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না।

বৃহত্তর অর্থে নীতিবোধ জীবন ও সমাজের মূল সত্তার সঙ্গে জড়িত; সাহিত্য থেকে তাকে কি আমরা বিচ্ছিন্ন করতে পারি।”

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দু'টি বিপরীত প্রান্তীয় মত আছে—একটি বলে সাহিত্য শিক্ষা দেয়, কলাকৈবল্যবাদে আর একটির প্রতিষ্ঠা। বিভূতিভূষণ এই দু'টির কোনটিকে স্বীকার করেন নি। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষ আর একটি চেতনার জগতে উপনীত হয়ে আত্মমহিমা উপলব্ধি করে—লেখক পাঠক দু'জনেই—এই চেতনা বিভূতিভূষণের কল্পনার মূল। প্রাচীন ভারতের অলঙ্কার শাস্ত্রে কাব্য-পাঠের আনন্দকে ব্রহ্মাস্বাদের আনন্দের সহোদররূপে কল্পনা করা হয়েছে। ঐ নিগূঢ় আনন্দের অনুভূতিই সেখানে সাহিত্যপাঠের উদ্দেশ্য; বিভূতিভূষণ ঐ অনুভূতির ফলে জীবনের মহত্তর সত্যের চেতনাকেই সাহিত্যের সার্থকতা বলতে চেয়েছেন।

বিভূতিভূষণ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেন নি; কিন্তু সাহিত্যের মধ্য দিয়ে চিত্তের উদ্‌বোধন যে সত্যি-কারের কর্তব্য, তিনি সে কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনা প্রসঙ্গে 'স্মৃতির রেখা' থেকে উদ্ধৃত একটি অংশ এখানে পুনরুদ্ধার করলে তাঁর শিল্পভাবনার পরিচয় স্ফুটতর হবে।—

“জগতে অসংখ্য আনন্দের উন্মুক্ত ভাণ্ডার আছে। গাছপালা, ফুল পাখী, উদার মাঠঘাট, সময়, নক্ষত্র, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না রাত্রি, অস্তসূর্যের আলোয় রাঙা নদীতীর, অন্ধকার আলোকময়ী উদার শূন্য—এসব জিনিস থেকে এমন সব বিপুল অব্যক্ত আনন্দ, অনন্তের উদার মহিমা প্রাণে আসতে পারে—সহস্র বৎসর ধরে তুচ্ছ জাগতিক বস্তু নিয়ে মত্ত থাকলেও সে বিরাট, অসীম শান্ত উল্লাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কোনো জ্ঞান পৌঁছায় না। জগতের শতকরা নিরানব্বই জন লোক এ আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত্যুদিন পর্যন্ত অনভিজ্ঞই থেকে যায়—শতবর্ষজীবী হলেও পায় না…অনুরূপ শিক্ষা, সাহচর্য, আদর্শ যেরূপ আনন্দের পথ দেখিয়ে দেবার জন্য প্রয়োজন হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে তা সকলের জোটে না।

সাহিত্যিকদের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্তা সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তারা ভগবানের প্রেরণা দিয়ে এই মহতী আনন্দ-বার্তা, এই অনন্ত জীবনের বাণী শোনাতে জগতে এসেছে, এই কাজ তাদের করতে হবেই—তাদের অস্তিত্বের এই শুধু সার্থকতা।"

……………………………২……………………………

রূপায়ণ

বিভূতিভূষণের গল্প বা উপন্যাসের কোনটিই ঘটনাবহুল নয়, কথাসাহিত্যের মধ্যে নাটকের ক্রিয়ার যে অংশ থাকে তাকে সমারোহময় করার কোন প্রয়াস তিনি করেন নি। বিচিত্রমুখী ঘটনা, অভাবিত বাঁক, জটিল পরিস্থিতি বা উত্তাল সংঘর্ষের অবতারণা করে তিনি কাহিনীকে কুটিল করে তোলেন নি। ক্রিয়ার বর্ণাঢ্যতা তাঁর রচনায় আদৌ নেই। তাঁর আত্মকথামূলক দিনলিপিগুলিতেও ঘটনা বা মানুষের ভিড় নেই।

কিন্তু সে জন্য তাঁর রচনা যে, শেলীর কাব্যের মতো নির্বস্তুক, সুর-বিহারী হয়ে উঠেছে এমন নয়। বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসে ক্রিয়া অবশ্যই আছে, কিন্তু ঐ ক্রিয়াই প্রধান হয়ে ওঠে নি। ক্রিয়াকে সমুত্তরঙ্গ না করে তিনি রচনার মধ্যে ভিন্নতর উপাদান সমাবেশ করতে চেয়েছিলেন। ঐ উপাদান অবশ্যই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ নয়—'শিহরিত সিঁড়ি দিয়ে হৃদয়ের পাতালে নামার কোনো চিহ্ন, ইতিহাস' রচনার মধ্যে প্রধান করে তোলার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। তাঁর লেখায় মনের স্থান অবশ্যই আছে, কিন্তু ঐ মনের অবতলে কোন দুর্লক্ষ্য রন্ধ্রের সন্ধান করা বা মনের জ্বালার তীব্রতার চিত্রাঙ্কন করার আগ্রহ তাঁর কবিচিত্তে ছিল না।

বিভূতিভূষণের শিল্পরূপায়ণের একটা বড়ো অবলম্বন স্মৃতি—

জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা স্মৃতির পথ বেয়েই তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। 'পথের পাঁচালী' রচনার সমকালের দিনলিপি 'স্মৃতির রেখা'য় তিনি বলেছেন,—

"মনের কোথায় যেন অদৃশ্য খোপে গত জীবনের স্মৃতি সব ঠাসা আছে,—পিয়ানোর চাবিতে হাত পড়ার মত দৈবাৎ কোনো পুরোনো খোপে হাত পড়ে যায়—হঠাৎ সেটা পরিচিত সুরে বেজে ওঠে—অনেক কালের আগের একটা দিন অল্পক্ষণের জন্য বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আবার ফিরে আসে।"—ইসমাইলপুর, ৭. ১২. ১৯২৭।

পরবর্তীকালের দিনলিপিতে স্মৃতির মূল্যবোধ আরও গভীর।—

"সুখ-দুঃখ দুদিনের—তাদের স্মৃতি চিরদিনের, তারাই থাকে। তারাই গভীরতার ও সার্থকতার পাথেয় এনে দেয়।"—উর্মিমুখর।

স্মৃতিচারণের কয়েকটি লক্ষণ বিভূতিভূষণের রচনায় লক্ষ্য করা যায়। ঘটনস্রোতের বেগবত্তার পরিচয় তাঁর কাহিনীতে নেই; স্মৃতি অবলম্বন করে লেখার জন্য তিনি যেন নিরাসক্ত দ্রষ্টার মতো ঘটনাবলীর দিকে চোখ মেলেছেন—কালের ব্যবধান সমগ্র কাহিনীকে একটি অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখার অবকাশ দিয়েছে, তবে ব্যক্তিগত অনুভূতির স্পর্শ থাকার জন্য কোথাও ঔদাসীন্য নেই। লেখক অতীতের স্মৃতিলোকে বিচরণ করতে যেন উৎসুক হয়েছেন—স্মৃতি রোমন্থনের আনন্দই তাঁর কাছে বড়ো আকর্ষণ। তবে স্মৃতিই বিভূতিভূষণের রচনার একমাত্র অবলম্বন নয়। স্মৃতি আর কল্পনা তাঁর রচনায় একসঙ্গে মিশেছে। ঐ মিলন রাসায়নিক মিলনের মতো অভিনব পরিণাম সৃষ্টি করেছে। ফলে স্মৃতি রোমন্থনের নিরতিশয় আবিষ্টতা আর কল্পনার অতিচার—দু'টির কোনটিই তাঁর লেখায় নেই। নিছক স্মৃতিচারণ করেন নি বলেই অতীতকে হুবহু ফুটিয়ে তোলার কোন প্রয়াসই তিনি করেন নি; কল্পনার বিচরণের পক্ষে যথেষ্ট অবকাশ তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলিতে আছে। যেখানে স্ফূর্তিই মূল সেখানে অনুভূতির তীব্রতা বর্ণনাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে, আর যেখানে

কল্পনা প্রধান সেখানে তাঁর জীবনপিপাসা বিচিত্র রসের স্বাদের জন্য আকুল হয়েছে। ঐ পিপাসা মেটানোর জন্য কোথাও বা তিনি কাহিনীকে নতুন নতুন পথে নিয়ে গেছেন আবার কোথাও বা জীবন-জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

বিভূতিভূষণের রচনায় যে স্মৃতি আছে তাকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি ভাগে স্বকীয় অনুভূতি, অপর ভাগে মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের অভিজ্ঞতা। কোন কোন সময় তিনি যখন অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন তখন তাঁর স্মৃতিবিধৃত বিভিন্ন মানুষ বা ঘটনার স্মরণ তাঁর হৃদয়ে ভাবনার তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে। অতীতের অনুভূতি যে তাঁর কাছে অপরিবর্তিত আকারে এসেছে তা নয়; কালের ব্যবধানে অনুভূতির নবায়ন অবশ্যই ঘটেছে। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' বা 'আরণ্যক'-এর মতো উপন্যাসে স্মৃতিলব্ধ অনুভূতির নবীভবন প্রাণবন্ত হওয়ায় কাহিনীকে আত্মকথা বলে মনে হয়। মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের স্মৃতি যেখানে কাহিনীর উপাদান হয়েছে বিভূতিভূষণ সেখানে প্রধানত দ্রষ্টার ভূমিকা নিয়েছেন। সেখানে রচনার প্রাণ স্বানুভূতি নয়, সহানুভূতি। 'অভিযাত্রিক' দিনলিপিতে তিনি লিখেছেন,—

"মানুষের বিভিন্ন রূপ দেখবার আমার চিরকাল আগ্রহ, নতুন মানুষ দেখলেই মনে হয় ওর সঙ্গে বসে একটু আলাপ করে ওকে চিনি। দেখতে চেয়েছিলুম বলেই বোধ হয় কত রকমের মানুষকেই যে দেখালেন জীবনে।"

বিচিত্র মানুষের সঙ্গে পরিচয় তাঁর মনে আনন্দ বা বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। ঐ আনন্দ বা বিস্ময়বোধই কাহিনীর মধ্যে ঐ সব মানুষের যথাযথ রূপ ফুটিয়ে তুলে পাঠকের মনে অনুরূপ অনুভূতি সঞ্চার করতে তাঁকে উৎসুক করেছিল। স্মৃতি থেকে আহৃত ঐ সব চরিত্র প্রধানত চিত্রধর্মী। বিভূতিভূষণের উপন্যাসগুলির মধ্যে এমন অনেক চরিত্রের দেখা মেলে, কাহিনীর মূল ধারার সঙ্গে যাদের যোগ কোন

নেই, তাদের স্বগত রূপই উপভোগ্য। এই রকম অনেক মানুষকে নিয়েই তাঁর বেশির ভাগ ছোটগল্প গড়ে উঠেছে। এই জন্মই অনেক গল্প যেমন শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে তেমনই কোন কোন গল্প নিছক স্মৃতিচিত্র মাত্র থেকে গেছে।

'মহতী আনন্দ বার্তা' বা 'অনন্ত জীবনের বাণী' শোনাবার যে দায়িত্বের কথা সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ বলেছেন বা এর মূলে 'ভগবানের প্রেরণা'র কথা শিল্পদৃষ্টিতে ভাবালুতা বলে মনে হতে পারে; বিশেষত বিভূতিভূষণের নিজের রচনায় তাঁর এই ভাবনাটির কতখানি সার্থক প্রতিফলন বা রূপায়ণ হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। বিভূতিভূষণ যখন সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর চেতনাকে একটি তত্ত্বের আকার দিতে উৎসুক হয়েছেন তখন তার মধ্যে তাঁর চিন্তার নিঃসক্ত পরিচয় ব্যক্ত হয় নি, তাঁর নিজের অনুভূতি আর বিশ্বাস তার মধ্যে মিশেছে; সুতরাং তার মধ্যে ভাবের আবেগ স্বভাবতই আছে। তাঁর নিজের লেখায় তাঁর আদর্শ ফুটে উঠেছে কি না সেটাই বিচার্য বিষয়।

বিভূতিভূষণের দিনলিপি বা ভ্রমণলিপি বা ভ্রমণকাহিনী সম্পর্কে কোন সংশয় ওঠে না। সেখানে বিশ্বলীন বিশেষত প্রকৃতিমধ্যগত আনন্দের অনুভূতি পাঠকের চিত্তে সঞ্চার করার স্বচ্ছন্দ প্রয়াস আছে। তবে বর্তমান প্রসঙ্গে সেগুলিকে আলোচনার বাইরে রাখাই সঙ্গত, তাঁর কথাসাহিত্যে তাঁর ভাবনা রূপায়িত হয়েছে কিনা সেটাই লক্ষ্য করা যেতে পারে।

'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'দেবযান' আর 'ইছামতী'র মধ্যে তাঁর আদর্শের মোটামুটি রূপায়ণ দেখতে পাই। 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত'-এর মধ্যে অপুর কল্পনা অনুসরণ করে একটি স্বপ্নময় জগতের জন্য আকুলতা ফুটে উঠেছে; 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসে একদিকে যেমন রূঢ় বাস্তবতা আছে, অন্যদিকে তেমনই একটি অতীন্দ্রিয়লোকের আভাস আছে; 'আরণ্যক' স্পষ্টত

প্রকৃতির মধ্যে ঐ অনন্দ আর আনন্ত জীবনের উপলব্ধি, 'দেবযান' একটি কল্পনাময় লোকে ঐ উপলব্ধিকে সৃষ্টিচেতনার সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রয়াস; 'ইছামতী' উপন্যাসে ঐ চেতনা একটি প্রত্যয়রূপে কল্পিত।—'কুশল পাহাড়ী'র মতো গল্পের মধ্যে তাঁর আদর্শের প্রতিফলন সুস্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু তাঁর অপর সাতটি উপন্যাস আর অজস্র ছোটগল্প—যেখানে অতি সাধারণ বহু মানুষের মেলা, সেখানে বিভূতিভূষণের ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি?

মনে হয়, বিভূতিভূষণ এই সব রচনার মধ্যে যেখানে বিচিত্র মানুষের সমাবেশ ঘটিয়েছেন সেখানেও তাঁর আদর্শ আর এক দিকে সার্থক হয়ে উঠেছে। তিনি যে আনন্দ বা অনন্ত জীবনের কথা বলেছেন সাধারণ মানুষের মধ্যেও তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। বিভূতিভূষণ ঘটনার সংঘর্ষে মানুষের জীবন বা চরিত্রের বিচিত্র পরিণামের ছবি আঁকতে চেষ্টা করেন নি। মানুষের অন্তর্ময় যে জীবন তার বিচিত্র স্বাদকে তিনি কথাবস্তুর মূল লক্ষ্যরূপে স্থাপন করেছেন। ঐ স্বাদই তাঁর কাছে আনন্দ আর অনন্ত জীবনের দ্যোতক; যে জীবনটা প্রত্যক্ষ তার অন্তরালে আর একটা যে অপূর্ব অনুভূতিময় জীবন আছে তাকে তিনি মহামূল্য দিয়েছেন।

৩

শিল্পায়ন

যে কোন বড় শিল্পকাজের একটা লক্ষণ এই যে, তার মধ্যে শিল্প-চেষ্টার চিহ্নমাত্র থাকে না। সে দিক দিয়ে বিভূতিভূষণকে মহাশিল্পী বলা যেত। তিনি মহৎ শিল্পী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে এমন অনেক ত্রুটির পরিচয় পাওয়া যায় যে তাঁকে দুর্বল শিল্পী বলে মনে হতে পারে। অনেকে বিভূতিভূষণকে

অচেতন শিল্পী বলে ভুল করেন। তাঁর শিল্পপ্রকৃতির স্বরূপ সন্ধান করলে হয়তো ঐ আপাতবৈষম্যের কারণ অনুভব করা যেতে পারে।

বিভূতিভূষণের শিল্পের মূল ত্রুটি শিল্পকর্মে তাঁর শিথিলতা। তিনি কাহিনীকে নাটকের কথাবস্তুর মতো সুসংহত করতে চেষ্টা করেন নি। তিনি কোথাও বড় একটা গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে কাহিনীর মধ্যে জটিল আবর্ত সৃষ্টি করেন নি; যেখানে সমস্যা আছে সেখানে সমস্যার সমাধানও দুরূহ হয় নি। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'কেদার রাজা'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শিল্পনিপুণতার নিদর্শন যে সমস্যার উত্তুঙ্গতা বা কাহিনীর বহু সূত্র-সংবলিত জটিলতার সৃষ্টি অথবা তুমুল সংঘর্ষ তাঁর কথাসাহিত্যে আদৌ নেই—ঘটনার মোটামুটি রকমের উচ্চাবচতা আছে মাত্র।

বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে কোন চরিত্রের মধ্যে প্রখর ব্যক্তিত্ব, রহস্যগভীরতা বা বেগবত্তা নেই। অপু, জিতু, ভবানী প্রভৃতির কল্পনায় চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নেই, প্রকৃতিগত সৌন্দর্যই সেখানে প্রধান আকর্ষণ। বরং মূল চরিত্রের চারদিকে তিনি যেসব ছোটখাটো চরিত্র এঁকেছেন তাদের মধ্যে অনেককে মনে রাখার মতো। ইন্দির ঠাকরুন, রামকানাই কবিরাজ, গয়া মেম, বেচু চকোত্তি, পদ্ম ঝি প্রভৃতি চরিত্র আমাদের অনেক দিন মনে থাকে। কিন্তু শিল্পদক্ষতা তার কারণ নয়। বিভূতিভূষণ কারুশিল্পী বা ভাস্করের মতো এইসব চরিত্রকে কুঁদে কুঁদে সৃষ্টি করেন নি, এদের ওপর এমন কোন অভাবনীয় গরিমাও আরোপ করেন নি। তিনি যেন সমস্তরকম শিল্পপ্রয়াস বর্জন করে কয়েকটি মানুষকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

বিভূতিভূষণের ভাষারীতিও শিল্পময় নয়। সংহতির অভাব এখানেও তাঁর রচনাকে শিথিল করেছে। অনেক বাক্য বা অনুচ্ছেদ অর্ধস্ফুট। মুন্সিয়ানা বলে যে একটি শব্দ অনেক লেখকের গুণবিচার প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয় তাঁর ভাষারীতি সম্বন্ধে সে কথা আদৌ খাটে না। কোন কোন সময় মনে হয় যে, তাঁর মনে যেসব কথা

এসেছে তিনি যেন কোনমতে সেগুলিকে পাশাপাশি বসিয়ে গেছেন; সেগুলিকে সুবিন্যস্ত করার দায়িত্ব তিনি যেন এড়িয়ে গেছেন। ভালো করে লক্ষ্য করলে অনেক জায়গায় ভাষার গঠনগত ত্রুটিও চোখে পড়তে পারে। ভাষার এই শিথিলতার জন্য কেউ কেউ তাঁর কোন বড় উপন্যাস একসঙ্গে অনেকটা পড়া ক্লান্তিকর বলে মনে করেছেন। বস্তুত শিল্পকর্ম দিয়ে পাঠকের মনোহরণ করার সম্ভাব্য উপায়গুলির কোনটির সদ্ব্যবহার বিভূতিভূষণ করেন নি।

শিল্পের দিক দিয়ে এইসব দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও বিভূতিভূষণের রচনার মধ্যে যে সাহিত্যের প্রাণবস্তুর কোন মূল্যবান্ সম্পদ আছে সে কথা তাঁর পাঠকমাত্রেই অনুভব করেন। সুতরাং শিল্পগত দুর্বলতার কারণ যে তাঁর অক্ষমতা বা প্রতিভার অপকর্ষ এই অভিমত পোষণ করা সমীচীন হবে না। আসলে বিভূতিভূষণের দৃষ্টি ছিল অন্য দিকে, সে জন্য তিনি শিল্পের দিকে মন দেন নি। সেই অন্য দিকটিকে এক কথায় জীবনরূপ বলা যেতে পারে—জীবনস্বাদ বলাও অসঙ্গত হবে না। এই অপর বিষয়টি তিনি যেন তাঁর সারা চেতনা দিয়ে নিবিড় ভাবে পেতে চেয়েছেন, সেই সঙ্গে সহৃদয় পাঠকের অন্তরেও সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন। তাঁর শিল্পদক্ষতার অভাব ছিল, এই মন্তব্য করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। বিভূতিভূষণ শিল্পকর্ম সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। শিল্পসৃষ্টির দুর্লভ সহজাত শক্তি থাকার জন্য তাঁকে এ সম্পর্কে চিন্তা করতে হয়নি। 'পথের পাঁচালী' থেকে শুরু করে 'অশনি সংকেত' পর্যন্ত প্রত্যেকটি লেখার মধ্যে সহজ গতির পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাস, ছোটগল্প, কিংবা দিনলিপি তিনি যেন বিনা আয়াসে লিখে গেছেন। সাহিত্যের কঠোর বিচারক যদি একে শিল্পপ্রতিভার লক্ষণ বলতে দ্বিধাও করেন, তা হলেও একথা বলতে হয় যে, বিভূতি-ভূষণের রচনার মধ্যে সহজ শ্রী আর সুষমা ছিল। তাঁর কবিমানসে যে পরিচ্ছন্নতা আর সহজাত শ্রীবোধ ছিল, তাঁর রচনার মধ্যে তাই ফুটে উঠে সচেতন শিল্প-সৌকর্যের অভাব পুরোপুরি মিটিয়ে দিয়েছে।

উপন্যাস

..................................১..................................

প্রস্তাবনা

উপন্যাসের উপকরণ কী হবে সে সম্পর্কে অনেক চিন্তার মধ্যে দু'টি উদ্ধার করে আলোচনার সূত্রপাত করা হল।

[ক] "Plot, characters, dialogue, time and place of action, style, and a stated or implied philosophy of life, then, are the chief elements entering into the composition of any work of prose fiction, small or great, good or bad". —An Introduction to the Study of Literature—W. H. Hudson.

(খ) "I have chosen the title 'Aspects' because it is unscientific and vague, because it leaves us the maximum of feedom because it means both the different ways we can look at a novel and the different ways a novelist can lookat his work. And the aspects selected for discussion are seven in number : The Story ; People ; The Plot ; Fantasy and Prophecy ; Pattern and Rhythm ."—Aspects of Novel—E. M. Forster.

উপন্যাসে কী কী বিষয় আলোচ্য সে সম্পর্কে এই দু'টি বিদগ্ধোক্তি দিগ্‌দর্শক সন্দেহ নেই। সাহিত্যের ছাত্রের পক্ষে এই ধরনের সুনির্দিষ্ট বিভার্গ অনুসরণ করে উপন্যাস বিশ্লেষণ অবশ্যকর্তব্য। এ প্রসঙ্গে ভর্তৃহরির একটি প্রৌঢ়োক্তি স্মর্তব্য।—

"উপায়াঃ শিক্ষমাণানাং বালানামুপলালনাঃ।
অসত্যে বর্ত্মনি স্থিত্বা ততঃ সত্যং সমীহতে॥"
—ভারতীয় দৃষ্টিতে কবিপ্রতিভার স্বরূপ—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য;
কবি ও কবিতা, শ্রীপঞ্চমী, ১৩৭২।

সাহিত্যবিচার-শিক্ষার্থীকে স্থূল কয়েকটি বিভাগের মধ্য দিয়ে সাহিত্যকে আয়ত্ত করতে হয়—নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়। কিন্তু সমগ্রভাবে সাহিত্যের আনন্দ উপভোগ করতে হলে এই ধরনের বিশ্লেষণ অবান্তর, এমন কি হানিকর বলে মনে হবে। উপন্যাসের বিষয় আর গড়ন সম্পর্কে জনৈক পশ্চিমী সমালোচক যে কথা বলেছেন তা উপন্যাসের যে কোন 'অঙ্গ' সম্পর্কে আলোচনার পক্ষে প্রযোজ্য।

"The novel is not submissive to generalisations about its subject and structure. We may perhaps, however, be permitted the fairly malleable generalisation that the novel deals with the individual in the setting of a clearly visualised, concretely realised community, in some way mirroring the tensions, forms and the mores of actual human society. The 'way' of course may range between a close fidelity to observed fact and outright myth and fantasy."—American Fiction—D. E. S. Maxwell.

সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে নানা মুনির নানা মত। যাঁরা শিক্ষার্থী বা নিয়মনিষ্ঠ সমালোচক তাঁরা অবশ্যই কল্পিত কয়েকটি বিভাগ অবলম্বন করে উপন্যাসের বিশ্লেষণ করতে উৎসাহী হবেন, কিন্তু ঐ বিশ্লেষণে উপন্যাসের মূল আবেদন—ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে যাকে রসধ্বনি বলে, সেই আনন্দময় অনুভূতিটুকু ধরা না-ও পড়তে পারে। আবার একালে, বাস্তবিকতা, রাষ্ট্রনৈতিক, সমাজনৈতিক বা অর্থ-

নৈতিক চেতনা, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, বিশিষ্ট আদর্শবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসের বিচার করার আগ্রহ দেখা যায়। কালের প্রবণতার জন্যই হোক বা সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রেও নতুন স্বাদের আকর্ষণের জন্যই হোক, উপন্যাসের ঐ ধরনের বিচার অনেকে বিশেষ মূল্যবান, অন্ততঃপক্ষে, উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেন। 'যত মত তত পথ' এই সত্যদেশনা সাহিত্যের বিচার বা আস্বাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উপন্যাস-বিচারের কোন রাজমার্গ অবলম্বনের উদ্দেশ্য বর্তমান লেখকের নেই—সুতরাং প্রচলিত রীতিগুলির উল্লেখমাত্র করেই নিবৃত্ত হওয়া শ্রেয়। তন্ন তন্ন করে সাহিত্যের আত্যন্তিক বিশ্লেষণ না করে বিভূতিভূষণের উপন্যাসগুলির মনে রাখবার মতো বৈশিষ্ট্যের পরিচয় নেওয়ার প্রয়াসই সঙ্গত হবে বলে মনে হয়। নিয়ম মাফিক সমালোচনা না করে তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ-বিহার করে তাঁর সৃষ্টির রসাস্বাদ করলে সম্ভবত ক্ষতি না হয়ে লাভই হবে।

বিভূতিভূষণ মোট তেরোখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। প্রকাশ-কাল অনুসারে ঐ উপন্যাসগুলিকে এইভাবে সাজানো যেতে পারে—

(১) পথের পাঁচালী। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৩৬ (১৯২৯)। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৩৯ (১৯৩২)।

(২) অপরাজিত। প্রথম খণ্ড—মাঘ, ১৩৩৮ (১৯৩২)। দ্বিতীয় খণ্ড—ফাল্গুন, ১৩৩৮ (১৯৩২)।

(৩) দৃষ্টি প্রদীপ। ভাদ্র, ১৩৪২ (১৯৩৫)।

(৪) আরণ্যক। চৈত্র, ১৩৪৫ (১৯৩৯)।

(৫) আদর্শ হিন্দু হোটেল। আশ্বিন, ১৩৪৭ (১৯৪০)।

(৬) বিপিনের সংসার। ভাদ্র, ১৩৪৮ (১৯৪১)।

(৭) দুই বাড়ি। মহালয়া, ১৩৪৮ (১৯৪১)।

(৮) অনুবর্তন। ভাদ্র, ১৩৪৯ (১৯৪২)। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ (১৯৪৩)।

(৯) দেবযান। আশ্বিন, ১৩৫১ (১৯৪৪)। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৫৩ (জুন, ১৯৪৬)।

(১০) কেদার রাজা। ভাদ্র, ১৩৫২ (১৯৪৫)।

(১১) অথৈ জল। কার্তিক, ১৩৫৪ (১৯৪৭)।

(১২) ইছামতী। পৌষ, ১৩৫৬ (১৯৫০)।

(১৩) অশনি-সংকেত। ভাদ্র, ১৩৬৬ (১৯৫৯)। —মৃত্যুর পর প্রকাশিত।

এই তেরোখানি উপন্যাসের মধ্যে ছ'খানিতে বিভূতিভূষণের প্রতিভার বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে; সেই ছ'খানি উপন্যাস—'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'দেবযান' আর 'ইছামতী'। এই উপন্যাসগুলির মধ্যেই বিভূতিভূষণের কবি-দৃষ্টির পরিচয় গভীর। 'পথের পাঁচালী' আর 'অপরাজিত' দু'টি উপন্যাসের মধ্যে বিভূতিভূষণের জীবন-বিমুগ্ধতা প্রকৃতির স্নেহরসে লালিত হয়েছে। 'আরণ্যক' উপন্যাসে তাঁর প্রকৃতিপ্রেম জীবনের রহস্যময়তার উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসে আধ্যাত্মিক আকুতির উন্মেষ। 'দেবযান' উপন্যাসে সৃষ্টির বিচিত্রতা আর রহস্যগভীরতার বোধজনিত আনন্দ অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে মিলিত হয়ে কল্পনালোকে বিচরণ করেছে। 'ইছামতী' উপন্যাসে তাঁর জীবনদৃষ্টি একটি ধ্রুব প্রত্যয়ে বিরতি লাভ করেছে। প্রত্যেকটি উপন্যাসেই মানুষের ভূমিকা আছে। কিন্তু সে ভূমিকা গৌণ। প্রত্যেকটি উপন্যাসেই প্রকৃতির বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, কিন্তু সে ভূমিকাও মুখ্য নয়। বিভূতিভূষণ যুগপৎ মানুষ আর প্রকৃতিকে অবলম্বন করে জীবনের মর্মগত সত্যে উপনীত হতে উৎসুক হয়েছিলেন। তাঁর কবিদৃষ্টি আর জীবন-জিজ্ঞাসা সমন্বিত হয়ে এই উপন্যাসগুলির মধ্যে এক অপূর্ব চেতনা সঞ্চার করেছে। বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের স্মরণীয় সৃষ্টি এই ছ'খানি উপন্যাস—এই ছ'খানি উপন্যাসেই তাঁর প্রতিভার অসামান্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিভূতিভূষণের অপর সাতখানি উপন্যাস 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'বিপিনের সংসার', 'দুই বাড়ি', 'অনুবর্তন', 'কেদার রাজা', 'অথৈ জল' আর 'অশনি-সংকেত' পরিপূর্ণভাবে মানব-কাহিনী। বিভূতি-ভূষণ বাংলাসাহিত্যে যে জন্য অনন্যসাধারণ এখানে তার পরিচয় পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই উপন্যাসগুলিতে তিনি অত্যন্ত সহজে মানুষের জীবনে প্রবেশ করেছেন। ছোটগল্পগুলির মধ্যে মানুষের প্রতি বিভূতিভূষণের যে একান্ত অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় এখানে সেই অনুরাগই ভিন্ন আকারে রূপায়িত হয়েছে। অবশ্য এগুলি ছোটগল্পের দীর্ঘীকৃত সংস্করণ নয়—অপেক্ষাকৃত অপ্রধান 'দুই বাড়ি' ছাড়া অন্যগুলিতে যথার্থ উপন্যাসের রস আছে। এই উপন্যাসগুলি যেসব মানুষের জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে তারা নিতান্ত সাধারণ মানুষ—বনস্পতির গৌরব তাদের মধ্যে নেই। কিন্তু ঐ সব সাধারণ মানুষের জীবনের মধ্যে অসাধারণত্ব না থাকলেও বিচিত্রতা আছে—প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ স্বতন্ত্রতার জন্য চরিত্রগুলি উপাদেয়। তাদের আপাততুচ্ছ জীবনের মধ্যে সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার বয়নে যে মানবরূপ প্রকাশিত তা উপন্যাসগুলিকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসগুলির মূল প্রেরণা বিভূতিভূষণের কবিকল্পনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসগুলির মূলে আছে তাঁর মানব-প্রেম। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব কবিকল্পনার উৎকর্ষ; সে জন্য প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসগুলি মহৎ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসগুলিতে কল্পনাগত সে মহত্ত্ব না থাকলেও জীবনের রূপায়ণ স্থান পাওয়ায় সেগুলিতে এ যুগের কথাসাহিত্যের লক্ষণ যে ফুটে উঠেছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কেবল প্রথম শ্রেণীর রচনাগুলি থাকলে আমরা বিভূতিভূষণকে একজন কবিদৃষ্টিসম্পন্ন ভাববাদী লেখক রূপে পেতাম। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাগুলি জীবন-প্রেমিক তথা প্রাণবান্ সাহিত্যিকরূপে তাঁর পরিচয়কে সম্পূর্ণ করেছে।

অবশ্য বিভূতিভূষণ প্রথম ধারার উপন্যাসগুলির জন্যই প্রসিদ্ধ। 'ভারতকোষ' গ্রন্থে 'উপন্যাস, বাংলা' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধারার রচনারই প্রশংসা করেছেন।—

"বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিদৃষ্টি, প্রকৃতির সহিত একাত্মতা ও সরল, সুস্থ, দ্বন্দ্বহীন জীবনসাধনা সম্বল করিয়া উপন্যাসক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রকৃতির শান্তি, সৌন্দর্য ও নিরাসক্তি তাঁহার চরিত্রাবলীর মানসগঠনের উপাদান। তাঁহার 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯ খ্রী) ও 'অপরাজিত'-এর (১৯৩২ খ্রী) নায়ক যেন প্রকৃতির অপরিমেয় রহস্যবোধ ও অক্ষুব্ধ প্রশান্তির মানবিক প্রতিরূপ। তাঁহার 'আরণ্যক'-এ (১৯৩৯ খ্রী) অরণ্যের অধৃষ্য মহিমা যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া কয়েকটি সরল, আত্মভোলা, আনন্দময় নর-নারীর জীবনের মর্মকোষে মধুক্ষরণ করিয়াছে। প্রাচীন ভারতের তপোবন-জীবন যেন আধুনিক জটিল দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ জীবনবেগকে নিজের প্রগাঢ় অনুভূতি ছন্দের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে।"

বিভূতিভূষণের দ্বিতীয় ধারার উপন্যাস সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের এমন কি সমালোচকদের মধ্যেও কিছুটা দ্বিধা আছে বলে মনে হয়। দ্বিতীয় ধারার উপন্যাস বিভূতিভূষণের পরিচয়কে সম্পূর্ণ করেছে এ ইঙ্গিত করেছি। এই সম্পূর্ণতা কেবল ফাঁক ভরানোতে নয়। এই জাতীয় উপন্যাসের মধ্যেও বিভূতিভূষণের প্রতিভার পরিচয় ফুটে উঠেছে। তাঁর অনেক ছোটগল্পে যেমন এখানেও তেমনই তিনি মানুষের জীবন থেকে রস আহরণ করেছেন। এই সব উপন্যাসের মধ্যে—হয়তো বিভূতিভূষণের সব উপন্যাসেই, হাডসন যেমন বলেছেন সেই রকম নাট্যসুলভ পরিণাম-লক্ষ্মী ঐকসূত্রিক গতিময় কাহিনীর সন্ধান করতে যাই, তা'হলে আমাদের অন্বেষণ ব্যর্থ হতে পারে। কেন না বিভূতিভূষণ বঙ্কিমচন্দ্রের মতো নাট্যরীতিতে কাহিনীবিন্যাস করেন নি—জীবনের একটা রূপ ফুটিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে ছিল। সেইজন্য তাঁর উপন্যাসে আঁটসাঁট বাঁধুনি নেই, পরিণামকে ভাস্বর করে তোলার কোন রকম চেষ্টা নেই,—এমন কি তাঁর উপন্যাসে কোথাও

এতটুকু চমক নেই। তিনি প্রকৃতিকে যেভাবে দেখেছেন, মানুষকে যেভাবে দেখেছেন, জীবনকে যেভাবে বুঝেছেন তারই ছবি তাঁর উপন্যাস। যেখানে তিনি প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন বা জীবনের কোন গভীর সত্যের আভাস দিতে চেষ্টা করেছেন সেখানে তাঁর ভাবকল্পনার শিল্পশোভন রূপ দেখা যায়। কিন্তু যেখানে তিনি মানুষের জীবনের ছবি এঁকেছেন সেখানে তাঁর অকপট ভালোবাসাই স্থান পেয়েছে। মানুষের জীবনের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তার মধ্যে শিল্প অবশ্যই আছে, কিন্তু শিল্প সেখানে অপ্রধান, প্রচ্ছন্ন তো বটেই। ইংরেজী সাহিত্যে চার্লস ডিকেন্স যেমন প্রাণের স্পর্শ দিয়ে মানুষকে জীবন্ত করে তুলেছেন, বিভূতিভূষণও তেমনই ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে তাঁর উপন্যাসের মধ্যে প্রাণময় করে তুলেছেন। বাংলা উপন্যাসে এই ভাবে মানুষকে জীবন্ত করে তোলার নিদর্শন খুব কমই পাওয়া যাবে। এই দিক দিয়েও বিভূতিভূষণের এই ধারার উপন্যাসগুলির মূল্য আছে।

বিভূতিভূষণের ক'খানা উপন্যাস কালজয়ী হবে সে আলোচনা নিরর্থক, অশোভনও। তবে বাংলার উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁর স্থান সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী যে কথা বলেছেন তার কিছুটা পরিচয় দিয়ে উপন্যাস-আলোচনার ভূমিকাপর্ব শেষ করলাম।—

"বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠি, মতান্তরের ধাক্কায় সে প্রতিষ্ঠা বিচলিত হওয়ার আর আশঙ্কা আছে বলে মনে হয় না। বরঞ্চ যত সময় যাচ্ছে ততই তাঁর রচনার জৌলুস যেন বাড়ছে। 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হয়েছে ত্রিশ বছরের উপর, অথচ কাল তার উপরে একটিও রেখাপাত করতে পারে নি। একথা তাঁর সমস্ত রচনা সম্বন্ধে এমন কি অত্যন্ত গৌণ রচনা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সাময়িক উত্তেজনার আগুনে গলিয়ে যে সব উপাদানে উপন্যাস রচিত হয়েছিল এই ত্রিশ বছরের মধ্যে, তাদের অনেকগুলিই আজ বিস্মৃত, আরও অনেকগুলি দীপ্তিহীন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের প্রধান তিনজন ঔপন্যাসিক, চতুর্থ নাম

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জনপ্রিয়তায় তিনি শরৎচন্দ্রের নীচে, কিন্তু স্থায়িত্বে তিনি যে শেষ পর্যন্ত নীচেই থেকে যাবেন এমন মনে না করার কারণ আছে বলে মনে হয়।......

বাস্তব ছাড়া সাহিত্য সৃষ্টি হয় না সত্য। কিন্তু বাস্তব কি ওই ধুলো-মাটি কাদা নিয়ে পালোয়ানী? বিভূতিভূষণ ধুলোকে সোনায় পরিণত করে বাস্তবকে পৌঁছে দিয়েছেন অতিবাস্তবে। এ হয় দু'টি গুণের সমাবেশে, প্রতিভা আর প্রসাদগুণের শুভ যোগাযোগে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ছাড়া এমন যোগাযোগ আর কোথাও ঘটেনি বিভূতি-সাহিত্যের বাইরে। তাই তাঁকে বলেছি বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে চতুর্থ নাম।"—বিভূতি বৈচিত্র্য, বিভূতি বিচিত্রা।

.... ২ ....

পথের পাঁচালী

('পথের পাঁচালী' প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যের অনুরাগী মহলে আলোড়ন এনেছিল। অল্প দু'একজন প্রতিকূল সমালোচনা করলেও প্রায় সকলেই মুগ্ধ হয়ে এর প্রশংসা করেছিলেন। ঐ মুগ্ধতার কারণ অবশ্যই এই উপন্যাসটির অভিনবত্ব) সাহিত্যের একটি যে নতুন পথ খোলা হচ্ছে, সাহিত্যের রসজ্ঞ মাত্রেই তা অনুভব করেছিলেন; অবশ্য বিভূতিভূষণের পর আর কেউ ঐ পথে চলেন নি। বিভূতিভূষণ প্রধানত তিন দিক দিয়ে অভিনবত্ব এনেছিলেন। প্রথমত, (এই উপন্যাসে গ্রামের প্রকৃতির অপূর্ব ছবি ফুটে উঠেছে; বাংলার পল্লীর অতিপরিচিত দৃশ্যের মধ্যে যে অফুরন্ত সৌন্দর্য আছে বিভূতিভূষণই যেন তা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি গ্রামের জীবন আর গ্রামের মানুষের মধ্যে যে বিচিত্র রূপ আছে তার মনোজ্ঞ চিত্র তুলে ধরেছেন; তিনি যে সাধারণ মানুষের জীবনরূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন এর মূলে আদর্শভিত্তিক কোনো উদ্দেশ্যের বালাই ছিল

না—তিনি অনুরাগবশতই ঐ রূপাঙ্কন করেছিলেন। তৃতীয়ত, তিনি শিশুর কল্পনাচারিতার যে পরিচয় দিয়েছিলেন তার স্বাদ অপূর্ব বলে মনে হয়েছিল; শিশুর মনের সঙ্গী হয়ে তিনি পাঠকের কাছে এক নতুন রাজ্যের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। এর উপর ছিল তাঁর মনোহর রচনাভঙ্গি। এই একটি লেখা দিয়েই তিনি বাংলার সাহিত্যরসিক সমাজের চিত্ত জয় করেছিলেন।) অনেকের কাছে এইটাই তাঁর সাহিত্যকীর্তি—অবশ্য এই উপন্যাস লিখেই তাঁর প্রতিভা নিঃশেষিত হয় নি।

উপন্যাসটি সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে এই উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশ উদ্ধার করা অসঙ্গত হবে বলে মনে হয় না।—

"পথের পাঁচালীর আখ্যানটা অত্যন্ত দেশী। কিন্তু কাছের জিনিসের অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। 'পথের পাঁচালী' যে বাংলার পাড়াগাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়। লেখার গুণ এই যে, নতুন জিনিস ঝাপসা হয়নি, মনে হয় খুব খাঁটি, উঁচুদরের কথায় মন ভোলাবার জন্যে সস্তাদরের রাঙতার সাজ পরাবার চেষ্টা নেই। বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে। এই বইখানিতে পেয়েছি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এর থেকে শিক্ষা হয়নি কিছুই, দেখা হয়েচে অনেক যা পূর্বে এমন করে দেখি নি। এই গল্পে গাছপালা পথঘাট মেয়ে-পুরুষ, সুখ-দুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েছে; সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিসের মতো সে সুস্পষ্ট।"

একটি বিশেষ উপভোগ্য বা উৎকৃষ্ট সাহিতকর্ম বলে বিবেচিত হলেও শিল্পবিচারের দিক দিয়ে এই উপন্যাসটির মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি ধরা পড়বে। প্রথমেই এর কাহিনীর মধ্যে শ্লথতার উল্লেখ করতে

হয়। উপন্যাসের মধ্যে নাট্যসুলভ গতিশীলতা প্রত্যাশা করা হয়। 'পথের পাঁচালী'র মধ্যে গতি অবশ্যই আছে, কিন্তু ঐ গতি শীতের গ্রাম্য নদীর মতো অত্যন্ত ধীর—কাহিনীর মধ্যে দ্রুতির কোন নিদর্শন নেই। উপন্যাসের মধ্যে ঘটনার বাহুল্যও নেই। অপুর জন্ম থেকে শুরু করে কাশী ফেরার সময় পর্যন্ত অনেক ঘটনা ঘটেছে বটে কিন্তু উপন্যাসের দৈর্ঘ্যের তুলনায় তা যথেষ্ট বলে মনে হয় না। উপন্যাসের মধ্যে নাটকসুলভ যেসব ঘটনার সমাবেশ করা হয় এখানে যেন সেগুলি অপ্রধান স্থান নিয়েছে। অপর পক্ষে অপুর পাঠশালা যাত্রা, যাত্রাশোনা, রেলপথ দেখা—এই ধরনের বিষয়ই যেন বেশি উল্লেখ-যোগ্য বলে মনে হয়েছে। উপন্যাসোচিত ঘটনা বর্ণনার জন্য বিভূতি-ভূষণের যেন বিন্দুমাত্র তাড়া নেই—ছবির পর ছবি আঁকতেই তিনি বেশি মন দিয়েছেন। অবশ্য উপন্যাসটি পড়ার পর সমগ্র কাহিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে অনুভব করা যায় যে, অপুর জীবন ধীরে ধীরে একটা পরিণামের দিকে এগিয়ে চলেছে। মানুষের জীবন ইমারতের মতো হৈ হৈ করে গড়ে ওঠে না—বনস্পতির মতো তার বৃদ্ধি ধীরমন্থর অথচ সুনিশ্চিত। তার মধ্যে তাড়াহুড়ো নেই, আছে স্বচ্ছন্দ বিকাশের সহজ অবকাশ। বিভূতিভূষণ ঐ অবকাশটুকুকেই অপরূপ করে তুলেছেন। ছবির পর ছবি আঁকা হলেও 'পথের পাঁচালী' চিত্রধর্মী নয়। নিঃশব্দ গতির ধর্ম উপন্যাসটির মজ্জায় মজ্জায় মিশে আছে। চিত্ররস মুখ্য নয়; প্রবাহময় জীবনের বিচিত্র স্বাদ আর অমোঘ পরিণামই উপন্যাসটির প্রাণবস্তু। বিভূতিভূষণ ঐ উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই যে কথাবিন্যাস করেছিলেন তা এই উপন্যাস, বিশেষত 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' ঐ উপন্যাস যুগ্মকের দিকে সামগ্রিক দৃষ্টিপাত করলে অনুধাবন করা কঠিন হয় না।

উপন্যাসের নায়ক অপুর মধ্যে কল্পনাচারিতা অতি প্রকট। 'পথের পাঁচালী' বা 'অপরাজিত' উপন্যাসের কাহিনীর মূলে বিভূতিভূষণের নিজের জীবনের প্রভাব ছিল বলে অনুমান করা যায়—এই উপন্যাসের

কোন কোন ঘটনাও যেমন কোন কোন চরিত্রও তেমনই তাঁর জীবন থেকে নেওয়া হয়েছে এই সিদ্ধান্ত অনেকে করেছেন। বিভূতিভূষণ নিজে একথা পুরোপুরি স্বীকার করেন নি। তবে প্রকৃত কোন ঘটনা বা চরিত্র যে তাঁর কল্পনায় নতুন হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অপুর মধ্যে যে শিশু বা বালক ছিল তার রূপায়ণ উপভোগ্য, কিন্তু অপুর কল্পনাপ্রিয়তা কতখানি স্বাভাবিক সে বিষয়ে সন্দেহ করা যেতে পারে; তবে বিভূতিভূষণের রচনাগুণে অপুর মনোভাব বা কল্পনা কোথাও আরোপিত বা সঙ্গতিহীন বলে মনে হয় না।)

(অপুর চরিত্রে যে স্বপ্নচার দেখা যায় তার মূলে বিভূতিভূষণের নিজের কল্পনাপ্রবণতা কিছুটা ছিল সন্দেহ নেই। তিনি অপুর চরিত্রে আর একটি জিনিস ফুটিয়ে তুলেছেন যা বিশ্বের সব শিশুরই বিশিষ্টতা।) অপুর মধ্যে জগতের উপর এক অসামান্য নির্ভরের পরিচয় পাওয়া যায়—হৃদয়ের অধিকারের উপর তার অগাধ বিশ্বাস। পরিবারের নিবিড় পরিবেশে ঐ বিশ্বাস পরিপুষ্ট হয়েছে। বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগের ফলে ঐ বিশ্বাস কখনও অনুকূল কখনও বা প্রতিকূল বাতাসে আন্দোলিত হয়েছে। তার জীবনে বাইরের থেকে প্রতিঘাত এসেছে—সে গ্রামের প্রতিবেশী বা কাশীর ধনীর গৃহের মমতাহীনতা থেকেই হোক; কিন্তু তীব্র আঘাতেও সে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে নি—নিরাশা যে কী তা যেন সে জানে—একটা আত্মময় স্বপ্নালোকের মধ্যে অবগাহন করে সে যেন নতুন আশায় জেগে উঠেছে।

(দুর্গার জীবনেও বার বার আশাভঙ্গ হয়েছে—কিন্তু আশাভঙ্গের তীব্র বেদনায় সে মুষড়ে পড়ে নি। তার কোনো স্বপ্নলোক ছিল না—আশা-আকাঙ্ক্ষায় সে সাধারণ গ্রামবালিকা—প্রবল জীবনী-শক্তিই তাকে সমস্ত নির্যাতন সমস্ত মনোভঙ্গ সহ্য করবার ক্ষমতা দিয়েছে। বিভূতিভূষণ তার প্রকৃতিপ্রেমের চিত্রাঙ্কন করেন নি, কেবল তার তীব্র জীবনপ্রেমের আভাস দু,একটি আঁচড়ে ফুটিয়ে

এই জীবন্তরূপই বিভূতিভূষণের গ্রামচেতনার একটি সার্থক নিদর্শন। দুর্গার সাহচর্য না পেলে অপুর প্রকৃতিপ্রেমের স্ফুরণ হত না। অবশ্য দুর্গার প্রকৃতিপ্রেম সচেতন নয়, প্রকৃতি যেন তার সত্তার সঙ্গেই মিশে ছিল।

দুর্গা অপুকে পরিচিত পরিবেশের মধ্যে অফুরন্ত আনন্দরস সন্ধানের শক্তি দিয়েছে; লীলা তার কাছে অনন্তের ইশারা এনেছে—তার জীবনরসতৃষ্ণাকে সে রহস্যময় বিচিত্র জগতের অভিমুখী করেছে। 'অপরাজিত' উপন্যাসের মধ্যে বিচিত্রের সন্ধানে উৎসুক যে অপুর সন্ধান পাই, লীলার সংস্পর্শে এসেই তার নবজাগরণ হয়েছে। লীলার প্রতি অপুর মনোভাবকে হয়তো কৈশোরক প্রেম বলা চলে না, কিন্তু তার তীব্রতা প্রেমের মতোই। ঐ প্রেমবৎ আকর্ষণই অপুর কাছে বিশ্বজগতের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে।

সর্বজয়ার চরিত্র চিরন্তন মাতৃমূর্তির একটি সমবেদনাময় রূপায়ণ। এই চরিত্রের মূলে বাস্তব অভিজ্ঞতা কিছুটা থাকতে পারে, কিন্তু কল্পনাই চরিত্রটিকে মনোহারী করে তুলেছে বলে মনে হয়। বিভূতি-ভূষণের নিজের একটি মন্তব্য।—

"সর্বজয়ার একটি অস্পষ্ট ভিত্তি আছে—আমার মা। কিন্তু যারা আমার মাকে জানে, তারাই জানে সর্বজয়ার সবখানি আমার মা নন।"—তৃণাঙ্কুর।

এই চরিত্রে তিনি বাস্তবকে কল্পনাযোগে নতুন করে তুলেছেন। সর্বজয়াকে প্রতিনিধিমূলক চরিত্র বলে মনে হয় না—বিভূতিভূষণের কোন চরিত্রেই প্রতিনিধিমূলক নয়—কিন্তু তার মধ্যে বাংলার গরীব-ঘরের মায়ের ছবি আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। এই জীবন্ত করে তোলাই বিভূতিভূষণের কবিপ্রতিভার উৎকর্ষের পরিচয়।

'পথের পাঁচালী' আর 'অপরাজিত' এই উপন্যাস দু'টির কাহিনীর ভিত্তি বিভূতিভূষণের নিজের জীবন—এ অনুমান অনেকেই করেছেন। বিভূতিভূষণের বর্ণনাভঙ্গী এমনই অন্তরঙ্গ যে অপুর বৃত্তান্ত তাঁর

নিজেরই জীবনকথা বলে মনে হয়। তার উপর তাঁর নিজের জীবনের কোন কোন ঘটনার ছায়া এই উপন্যাসে আছে। অপুর স্বপ্নালুতা আর প্রকৃতিপ্রেম যে বিভূতিভূষণের নিজস্ব সম্পদ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হরিহরের মূল তাঁর নিজেরই পৌরোহিত্য বৃত্তিসম্পন্ন পিতা বলে অনুমান করা স্বাভাবিক। সর্বজয়ার মূলে মার অস্তিত্ব সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দির ঠাকুরুন থেকে আরম্ভ করে গ্রাম্য বহু চরিত্রের মূলের সন্ধান অনুসন্ধানী গবেষক করতে পারেন। বিভূতি-ভূষণের অনেক লেখাতেই প্রত্যক্ষদর্শনের সঙ্গে কল্পনা মিশে আছে। কিন্তু সে সত্ত্বেও এই উপন্যাসকে আত্মজীবনীমূলক বলা চলে না। সাহিত্যবিচারের দিক দিয়ে তার একটা বড়ো কারণ এই যে, উপন্যাস-যুগ্মকের নায়ক অপুর বিকাশের যে রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায় তা আত্ম কথনকালে সম্ভবপর নয়। শিল্পীর নিসক্ত দৃষ্টিই এ ক্ষেত্রে কারয়িত্রী প্রতিভার উৎস। তা ছাড়া বিভূতিভূষণের দিনলিপি থেকেও জানা যায় যে, এই উপন্যাসের মূল প্রধানত তাঁর কল্পনা।) 'তৃণাঙ্কুর' থেকে যে অংশ উদ্ধার করা হয়েছে তার আগের কয়েকটি ছত্র,—

"ইসমাইলপুরের জঙ্গলে এমন কত শীতের গভীর অন্ধকার রাত্রি, ভাগলপুরের বড়বাসায় এমন কত আমের বউলের গন্ধভরা ফাগুন দুপুর, কত চৈত্র বৈশাখের নিম ফুলের গন্ধ মেশানো অলস অপরাহ্ন, বড়বাসার ছাদে কত পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাত্রি, অপু, দুর্গা, পটু, সর্বজয়া, হরিহর, রাণুদি, এদের চিন্তায় কাটিয়েছি। এরা সকলেই কল্পনাসৃষ্ট প্রাণী। অনেকে ভাবেন আমার জীবনের সঙ্গে বুঝি এই দুখানির যোগ আছে—চরিত্রগুলি বোধ হয় জীবন থেকে নেওয়া। অবশ্য কতকটা যে আমার জীবনের সঙ্গে সংযোগ আছে ঘটনাগুলির সঙ্গে এ বিষয়ে ভুল নেই—কিন্তু সে যোগ খুব ঘনিষ্ঠ নয়—ভাসাভাসা ধরনের। চরিত্রগুলি কাল্পনিক।"

(চরিত্রগুলি কাল্পনিক হলেও বিভূতিভূষণ সেগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। বিশেষ করে ছোটখাটো চরিত্রগুলির মধ্যে সজীবতা লক্ষ্য

করা যায়। অনেক সময়েই কাহিনীর চেয়ে চরিত্রবিশেষের আকর্ষণই বেশি বলে মনে হয়। অপুর বাল্যসঙ্গীরা, পাঠশালার গুরুমশাই বা সেখানে সমবেত বিচিত্র মানুষেরা, কাশীর কথক ঠাকুর এদের একেবারে যেন চোখের সামনে দেখতে পাই—বিভূতিভূষণ এদের সঙ্গে পাঠকের আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। কাশীর ধনীগৃহে অপুর অভিজ্ঞতা তিক্ত—সেখানকার চরিত্রগুলির মধ্যে একটা নিষ্করুণ ভাব ফুটে উঠেছে। বিভূতিভূষণ এই সব চরিত্রে কালির পোঁচ দেন নি, কিন্তু এদের সম্পর্কে বিরূপতার চেতনা মোটেই অস্পষ্ট নয়। সেজন্য এই চরিত্রগুলি যেন কতকপরিমাণে প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। বিশেষত কল্পনাগতপ্রাণ অপুর সুকুমার চিত্ত যেখানে বাস্তব জগতের অভিঘাতে বিমূঢ় হয়েছে সেখানে চরিত্রবিশেষকে নির্মমতার প্রতিমূর্তি বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই সব চরিত্রে হৃদয় যেন বিলুপ্ত।

৩

অপরাজিত

'পথের পাঁচালী'কে স্বতন্ত্রভাবে ধরলে রসোপলব্ধির ব্যাঘাত হয় না। এই উপন্যাসে জীবনের একটি সম্পূর্ণ পর্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। শিশু আর বালক অপুর ইতিবৃত্ত এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। ঐ ইতিবৃত্তে একদিকে যেমন বাহ্য ঘটনা আছে, অন্যদিকে তেমনই আছে তার অন্তরের ধীর নিশ্চিত বিকাশের পরিচয়। উপন্যাসটির শেষে সে যখন মনসাপোতায় বাংলার পল্লীর মধ্যে ফিরে আসছে তখন তার জীবনের একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে। বাংলার গ্রামপ্রকৃতির মধ্যে প্রত্যায়নই এই উপন্যাসটির সাধ্য বিষয় বলে মনে হয়; উপন্যাসটির একেবারে শেষে সুদূরের যে হাতছানি আছে তা নবতর অধ্যায়ে জীবনের উন্মোচনের আভাসমাত্র দেয়। যে 'পথের পাঁচালী' এই উপন্যাসে রূপায়িত তা ঘরে ফেরার পথ বলে মনে হয়।

'পথের পাঁচালী' স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু 'অপরাজিত' উপন্যাসসহযোগে পরিপূর্ণ। 'পথের পাঁচালী'তে যে পথের ইঙ্গিত আছে, 'অপরাজিত' উপন্যাসে সেই পথের উদ্দেশ পাওয়া যায়। এই দু'টি উপন্যাস মিলে একটি গোটা জীবনের কল্পনা—একটি অখণ্ড জীবনদৃষ্টি ফুটে উঠেছে। 'পথের পাঁচালী' আর দু'খণ্ডে প্রকাশিত 'অপরাজিত' সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য,—

"এই তিন খণ্ডে বিভক্ত বৃহৎ উপন্যাস একটি কল্পনাপ্রবণ, অধ্যাত্ম-দৃষ্টিসম্পন্ন জীবনের ক্রমাভিব্যক্তির মহাকাব্য এই নামে অভিহিত হইতে পারে।···ব্যাপকতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির দিক দিয়া এই শৈশব-রহস্যের ইতিহাস ওয়ার্ডসওয়ার্থের Prelude-এর সঙ্গে তুলনীয়।" —বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' উপন্যাসযুগ্মকের আয়তন যেরকম বিরাট তাতে ঐ পরিসরে হয়তো কোন দক্ষ উপন্যাসশিল্পী একটি জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস রচনা করতে পারতেন। 'মহাকাব্য' শব্দটির সঙ্গে জাতির ইতিবৃত্তের ভাবনা স্বতঃই জড়িত। প্রাচীন বা মধ্যযুগের মহাকাব্য সাধারণত কোন বৃহৎ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি জাতির আত্মপ্রকাশের কাহিনী। মহাকাব্যে মহৎ বা বৃহৎ বিষয় স্থান পাবে এটাই অভিপ্রেত। এ যুগে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে; ব্যক্তিজীবনের কথার মধ্যেও যে মহত্ত্ব আছে এটি এযুগের বিশেষ উপলব্ধি। কেবল বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত অর্থাৎ ঘটনার আবর্তে জায়মান কাহিনী নয়, অন্তর্জীবনের বিকাশের পরিচয়ও স্বগত মহত্ত্বের জন্য মহাকাব্য নামে আখ্যাত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। সে দিক দিয়ে বিচার করলে এই যুগ্মক যে একটি সার্থক মহাকাব্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গঠনশিল্পের দিক দিয়ে এই উপন্যাসের প্রকৃতি 'পথের পাঁচালী'র অনুরূপ। অবশ্য এখানে পটভূমি, ঘটনা আর চরিত্র বিচিত্রতর হওয়ায় কাহিনীর বয়ন শিথিল বলে মনে হয় না। কাহিনীর গতি ধীর

মন্থর। এই মন্থরতা কথাশিল্পের পক্ষে ত্রুটি সন্দেহ নেই, কিন্তু এই উপন্যাসের পক্ষে আবশ্যিক। বিভূতিভূষণ যদি ঘটনার সংক্ষোভে কাহিনীকে উন্মুখর করতে চাইতেন, অনিবার্য কালস্রোতের উদ্দাম উৎক্ষেপে বিপর্যস্ত জীবনের রূপাঙ্কন করার অভিপ্রায় যদি তাঁর থাকত, তা হলে রচনার এই ভঙ্গি নিতান্তই ব্যর্থ হত। কিন্তু অপুর অন্তর্জীবনের বিকাশের অবসরটুকু রচনার জন্য কাহিনীর নির্মিতির মধ্যে এই ধীরত্বটুকু না থাকলে চলত না। উপন্যাস-বিচারের প্রচলিত আদর্শে 'পথের পাঁচালী'র মতোই 'অপরাজিত' উপন্যাসের গঠনশিল্পে ত্রুটি আছে, কিন্তু সাহিত্যের সামগ্রিক রসানুভবের দিক থেকে দৃষ্টিপাত করলে এই বিশেষ রচনাভঙ্গিই উপন্যাসটির স্বভাব সঙ্গত বাহন বলে মনে হবে।

মিতভাষী সমালোচক শ্রীকুমার এই উপন্যাসটির যে অভিধা দিয়েছেন, তা একাধিকবার স্মরণ করে ঐ অভিধার তাৎপর্য অনুধাবন করা যেতে পারে। 'কল্পনাপ্রবণ, অধ্যাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন জীবনের ক্রমাভিব্যক্তির মহাকাব্য' উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। শ্রীকুমার 'অধ্যাত্মদৃষ্টি' শব্দটি ধর্মসাহিত্যে প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেন নি, নিগূঢ় অন্তর্দৃষ্টি অর্থে প্রয়োগ করেছেন—'ইছামতী'র বিভূতিভূষণকে এখানে আভাসে পাওয়া যায় মাত্র। ঐ অন্তর্ময় দৃষ্টি, দৃষ্ট জগৎ ও জীবন আর উপন্যাসের মধ্যে তার রূপায়ণ সম্পর্কে 'পথের পাঁচালী'র আলোচনা প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার যে কথা বলেছেন, তার একাংশ।—

"সকল কাব্যের যাহা শ্রেষ্ঠ প্রেরণা এই উপন্যাসে তাহা আছে। চরিত্র-সৃষ্টি বা ঘটনাবিবৃতিই এ রচনার রসবৈশিষ্ট্য নয়; জটিল মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ বা আধুনিক কালের অতি সজ্ঞান নরনারীর বিষম মানসবিষের ব্যাখ্যান ইহাতে নাই। মানুষ যে দৃষ্টি হারাইয়াছে—সেই চিরতরুণ গাঢ় নীল চক্ষুতারকার অনাবিল দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া তিনি তাঁহার জীবনকে গভীরতরভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন;

কোনও তর্ক নাই, কোন সমস্যা নাই—সুখের উন্মাদনা নাই, দুঃখের হাহাকার নাই, আছে কেবল দুইটি বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া এই জীবনদেবতার দীপারতি। তথাপি এই দৃষ্টির অন্তরালে একটা বিশেষ কল্পনা, একটা বিশেষ ভাবনা ভঙ্গি আছে—থাকিবারই কথা, না থাকিলে এ কাব্য এমন সুসম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিত না। কিন্তু সেটাও তত্ত্ব নয়, সমস্যার ইঙ্গিত নয়; সে একটা মনোভাব—জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কবিচিত্তের একটি বিশেষ রসোপলব্ধি। সেই মনোভাবটি এই কাব্যের পরিকল্পনায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। পাঠক সেটিকে বুদ্ধির দ্বারা ধারণা করে না, কোন একটি তত্ত্বরূপে গ্রহণ করে না—একটি অনুরূপ ভাবাবস্থার দ্বারা অনুভব করে মাত্র। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান নয়, একটি নূতন ধরনের চেতনা যেন পাঠককে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত করে। একবার ইহার একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থকার নিজে আমাকে জানাইয়াছিলেন—এই ভাবকে একটি নির্দিষ্ট চিন্তার আকারে সুস্পষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এই উপন্যাস রচনার প্রেরণায় কোনও বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রের প্রতি পক্ষপাত নাই; সমস্ত বিবৃতি ও বর্ণনার মধ্য দিয়া তিনি যে ধারণাটিকে অনুভূতির গোচর করিতে চাহিয়াছেন তাহা—'vastness of space and passing time'-এই বিপুল রহস্যের অনুধ্যানে জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি। হইতে পারে, এই উপলব্ধিই তাঁহার কল্পনার মূলে কাজ করিয়াছে; কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রের প্রত্যেক খুঁটিনাটির মধ্য দিয়া সেই ভাবচিন্তা বস্তু-মমতার রূপেই এমন বাক্য-সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে—রূপে, রঙে, রেখায়, ভাবানুভূতির অজস্র ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনায় যে রসমূর্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাকে কোনও বাঁধনে বাঁধা যায় না। কবি যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহার পৃথক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয় ত' হইতে পারে, কিন্তু কাব্যে তাহাকে জ্ঞানগোচর করিবার চেষ্টা না করিয়া একটি অনুভূতি-রূপে তিনি যে তাহা পাঠকের হৃদয়গোচর করিয়াছেন, তাহার কারণ, তিনি বিশেষের মধ্যেই সেই নির্বিশেষকে দেখিয়াছেন; বেশ বুঝা যায়,

সে ধারণা কবির কল্পনা-বীজ মাত্র—এ বীজ জীবনের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইতেই কবিচিত্তে উপ্ত ও অঙ্কুরিত হইয়াছে।”—দুইখানি উপন্যাস, সাহিত্যবিতান।

বিভূতিভূষণের জীবনদৃষ্টি বা জীবনচেতনা সম্পর্কে মোটামুটি ধরনের আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে করা হয়েছে। সুতরাং এখানে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা না করলেও চলতে পারে। এই উপন্যাস যুগ্মকের অন্তর্গত ভাবনা সম্পর্কে কেবল একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অপুর জীবন ঘটনাসংকুল নয়, কিন্তু তা একান্তভাবে ঘটনানিরপেক্ষ বা ভাবকল্পনা-নির্ভর নয়। বিভূতিভূষণ অপুর চিত্তলোকের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন বটে কিন্তু বাহ্য জগৎকে উপেক্ষা করেন নি। বরং শৈশবে প্রকৃতির লালন, বিদেশে প্রতিকূল পরিবেশে আত্মমগ্নতা, কৈশোর আর তারুণ্যের স্বপ্নালুতা, আকস্মিক সংঘটনে বিবাহ ও প্রেমস্বপ্ন, অপর্ণার মৃত্যুতে জীবনের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা ও পলায়ন, ভারতপ্রকৃতির মধ্যে কল্পনার পুনর্জাগরণ, প্রত্যাবর্তন ও দূরাভিসার—এই সব ঘটনার মধ্যে একদিকে যেমন একটি গভীর জীবনচেতনা বা জীবনরহস্যবোধ আছে, অন্য দিকে তেমনই মহাকাব্য সুলভ পরিকল্পনা আছে। সর্বজয়া, লীলা বা কাজল কাহিনীর মূল বিন্যাসের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে সঞ্চারীভাব সৃষ্টি করেছে, সেই সঙ্গে অপুর জীবনবোধকে পরিপুষ্ট করে তুলেছে। প্রকৃতি বা বিশ্ব অপুর কল্পনার লক্ষ্যবস্তু হলেও সে জীবনকে এড়াতে চায় নি, বরং জীবনকে পূর্ণতরভাবে পাওয়ার জন্য সে ঘড়ছাড়া হয়েছে। অপু সম্পর্কে শ্রীকুমারের একটি মন্তব্য যথার্থ—

“সে যে অত্যন্ত জীবন্ত, মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত জীবন বৈদ্যুতীতে পূর্ণ, তাহা নিঃসন্দেহ। তাহার আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলি তাহার বাস্তব জীবনের ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত; তাহা কেবল মাত্র কাব্যমূলক আকাশ-বিহরণ নহে।”—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

এই নিরতিশয় সজীবতার জন্য সে একদিকে যেমন জীবনের প্রতি অনুরক্ত হয়েছে, অন্য দিকে তেমনই একান্ত আসক্তির বশে কোন কিছুকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে নি। জীবনের প্রেরণা তাকে বার বার খণ্ডসীমা অতিক্রম করার প্রেরণা দিয়েছে। উপন্যাসের মধ্যে দু'বার তার জীবনে সাময়িক অবসাদ এসেছে—প্রথমবার সর্বজয়ার মৃত্যুর পর, দ্বিতীয়বার অপর্ণার মৃত্যুর পর। সর্বজয়ার মৃত্যুতে তার শূন্যতাবোধের সঙ্গে মুক্তির প্রচ্ছন্ন আনন্দ মিশে থাকায় সে সহজে আত্মস্থ হতে পেরেছিল। অপর্ণার মৃত্যুর পর অপু যেন কিছুকালের জন্য তার জীবনধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে—চাঁপদানিতে নিষ্প্রভ জীবন যাপন তার প্রমাণ। এক্ষেত্রে প্রকৃতির উন্মুক্ত উদার পরিবেশ, সর্বোপরি প্রকৃতির সৌন্দর্য, অপার রহস্যগভীরতা তাকে জীবনধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

'পথের পাঁচালী'র তুলনায় 'অপরাজিত' উপন্যাসে চরিত্র সমাবেশে নিপুণতা ফুটে উঠেছে। বড়ো চরিত্রের তুলনায় ছোটখাটো চরিত্র দু' একটি আঁচড়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অপুর কলেজ-জীবন বা কর্মজীবনে যেসব চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলির মূলে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল বলে মনে হয়। সর্বজয়ার চরিত্র স্বাভাবিক পরিণতি। অপর্ণার চরিত্র সম্পর্কে শ্রীকুমারের মন্তব্য স্মরণীয়,—

"অপর্ণা যেন অপুর স্বর্গগতা মাতারই একটা তরুণ সংস্করণ—সেবা-নিপুণতা, গৃহস্বামীর কল্যাণসাধন, দুঃখে সহানুভূতি, একটি মৃদু কৌতুকমণ্ডিত হাস্য-পরিহাস—এ সমস্ত বিষয়েই তাহার মাতা ও স্ত্রী এক। তাহার রূপে ও ব্যবহারে চোখ ঝলসানো উজ্জ্বলতার পরিবর্তে শ্যাম বনানীর স্নিগ্ধতা; সে সংসার-ক্লান্ত হৃদয়ের শান্তি-প্রলেপ, উত্তেজক সুরা নহে। বিভূতিভূষণের সমস্ত স্ত্রী-চরিত্র প্রায় এই ছাঁচে ঢালা।"—তদেব।

অপর্ণার তুলনায় লীলা আমাদের মনে আরও বেশি ছাপ রাখে। তার কারণ এ নয় যে, এই চরিত্রসৃষ্টিতে বিভূতিভূষণ নিপুণতার

পরিচয় দিয়েছেন। লীলা যেন রূপকথার বন্দিনী রাজকন্যা—দৈত্য-গৃহে বন্দিনী—রাজপুত্রের অনুরাগ দুর্গের প্রাচীরে লেগে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। রোমান্টিক খেয়ালী কল্পনাই লীলাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

কাজলের মধ্যে 'পথের পাঁচালী'র অপুকে আবার নতুন আকারে ফিরে পাই। তাদের ধাতুপ্রকৃতির মধ্যে ঐক্য অনুভব করা কঠিন নয়।

'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' উপন্যাস যুগ্মকের চরিত্র সম্পর্কে একটি আপত্তি অনেকে উত্থাপন করেছেন। অপুর চরিত্রে বয়সোচিত পরিণতি নাই। শিশু অপু ক্রমে কিশোর অপুতে পরিণত হয়েছে, কিন্তু তারপর তার আর বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় না। যৌবন সুলভ উদ্দামতা বা প্রৌঢ় সুলভ পরিণাম তার মধ্যে নেই। তার প্রেম কৈশোরকস্বপ্নেরই সগোত্র। কেউ কেউ এটিকে বিভূতিভূষণের শক্তিহীনতার লক্ষণ বলে ইঙ্গিত করেছেন। প্রসঙ্গান্তরে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, ঐ কিশোর সুলভ স্বপ্নময় জীবনানুরাগই অপুর বৈশিষ্ট্য। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের সংবেগ প্রবলতর হয়নি বটে কিন্তু অন্য দিক দিয়ে তার পরিপূরণ হয়েছে—অপুর চিত্ত ক্রমে অন্তর্মুখী হয়েছে, উদ্বেলতার পরিবর্তে গভীরতা গাঢ়তর হয়েছে।

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের নামকরণের তাৎপর্য উপন্যাসটির শেষ অংশে পাওয়া যায়, যেখানে বিভূতিভূষণ পথের দেবতার ডাকের কথা বলেছেন। 'অপরাজিত' উপন্যাসের নাম 'পথের পাঁচালী'-দ্বিতীয় পর্ব রাখলে ক্ষতি হত না—এই উপন্যাসে পথের আহ্বান আরও গভীর সুরে বেজে উঠেছে। 'পথের পাঁচালী'র শেষ ভাগে যা সূত্রাকারে উক্ত, 'অপরাজিত' উপন্যাসে তা কাহিনীতে ব্যক্ত। তবে 'অপরাজিত' নামটিরও সার্থকতা আছে। অপুর কল্পনাপ্রবণ চিত্ত, তার জীবনপিপাসা জগতের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে গেছে। দারিদ্র্যের কঠিন নিষ্পেষণ, শোকের আঘাত, হতাশা

—সবকিছুকে অতিক্রম করে অপুর জীবনপ্রেম বিরাট বিশ্বের মধ্যে সঞ্চারিত হতে চেয়েছে। যে প্রকৃতি তার চেতনাকে জাগ্রত করেছিল সেই প্রকৃতির স্নেহের লালনের কথা সে বিস্মৃত হয়নি—অপরাজেয় জীবনপ্রেমের জন্য সে আত্মজ কাজলকে প্রকৃতির লীলাভূমি বাংলার পল্লীর মধ্যে রেখে গেছে।

....৪..

দৃষ্টিপ্রদীপ

'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসের নায়ক জিতুর বিশিষ্টতা তার অলৌকিক দৃষ্টি। এক অপ্রাকৃত শক্তির প্রেরণায় তার চোখের সামনে এমন অনেক দৃশ্য ভেসে ওঠে যা অন্য কারও চোখে ধরা পড়ে না। সে যে ইচ্ছা করলেই ঐ সব দৃশ্য দেখতে পায় এমন নয়—তার দৃষ্টিপ্রদীপ অকস্মাৎ জ্বলে উঠে তার কাছে আশ্চর্য দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। সে কখনও কল্পনাময়লোকের ছবি দেখে, কখনও বা মৃতের সাক্ষাৎ পায় আবার কখনও বা অতীত, বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের দৃশ্য তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এই প্রদীপের আলো স্থিরা দ্যুতি নয়—তা'হলে জিতুর জীবনসাধনা জীবনের মর্মগত রহস্যের সন্ধানী হত। বিশেষত তার অন্তরে একটা সহজাত ধর্মপ্রাণতা ছিল—এ প্রত্যাশাও করা যেত যে, ঐ অলৌকিক দৃষ্টির সঙ্গে জীবনসাধনা মিশে তাকে সত্যদ্রষ্টা করে তুলবে।

অনুকূল পরিমণ্ডলে লালিত হলে জিতুর ঐ দৃষ্টি জীবনের কোন ধ্রুব সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারত। কিন্তু তার জীবনে সব দিক দিয়েই প্রতিকূলতা এসেছে। শৈশবে সে কোথা থেকে ঐ স্বপ্ন-দৃষ্টি পেয়েছিল তার সন্ধান পাওয়া যায় না। দার্জিলিং-এর প্রাকৃতিক পরিবেশের যে চিত্র বিভূতিভূষণ এঁকেছেন তা পাঠকের মনে গভীর

ছাপ রাখে না ; তবু ঐ প্রাকৃতিক পরিবেশ জিতুর দৃষ্টির বিকাশের পক্ষে অনুকূল ছিল। অতিরিক্ত মদ খাওয়ার জন্য চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে তার বাবা যখন জ্ঞাতি দাদার আশ্রয় নিয়েছেন তখন থেকে তার জীবন একটা নিষ্করুণ ট্র্যাজিক ইতিকথায় পরিণত হয়েছে। বাল্যকালে জ্যাঠামশাইয়ের আশ্রয়ে নির্যাতন থেকে শুরু করে চাকরি জীবনে মেজবাবুর মতো মনিবের নির্মম ব্যবহার তাকে পীড়িত করেছে। বিশেষত অপুর মতো অফুরন্ত সজীবতা না থাকায় বা নিরতিশয় স্পর্শসচেতন হওয়ায় তার জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। কেবল মানুষের স্পর্শ মাঝে মাঝে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এসে তাকে যেন নতুন আশ্বাসে সঞ্জীবিত করে তুলেছে।

জিতুর ধর্মচেতনা হিন্দুর ঐতিহ্যানুসারী নয়। বরং ধর্মের নামে যে সংকীর্ণতা আর স্বার্থপরায়ণতা হিন্দুসমাজে শিকড় গেড়েছে তা জিতুকে হিন্দুধর্মের প্রতি বিরূপ করে তুলেছে। অসৎ উপায়ে টাকা রোজগার করেও তার জ্যাঠামশাই ধুমধাম করে পূজার আয়োজন করেন। বটতলার মেজবাবুরা ধর্মের নাম করে নিমচাঁদ, তার স্ত্রী আর গরীব বুড়ীর অন্ধভক্তির সুযোগ নিয়ে তাদের অর্থ শোষণ করেছে। ধর্ম কায়েমি স্বার্থে পরিণত হয়েছে দেখে জিতু বিক্ষুব্ধ হয়েছে। প্রতিকারের ক্ষমতা তার অনায়ত্ত হওয়ায় তার ঐ বিক্ষোভ প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি বিমুখতায় পরিণত হয়েছে।

জিতুর মনে খ্রীষ্টীয় ধর্মসংস্কৃতি কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল সন্দেহ নেই। শৈশবে বাইবেলের কাহিনী বা খ্রীষ্টীয় নীতিকথার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। প্রথম যৌবনে কলেজে সে আন্তরিকতার সঙ্গেই বাইবেল পড়েছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের প্রতি অনুরক্তি থাকলেও খ্রীষ্টীয় ধর্মাদর্শ সে গ্রহণ করে নি। বরং বার বার সংস্কারমুক্ত মন দিয়ে ভগবানের কল্পনা করতে উৎসুক হয়েছে। প্রচলিত কোন ধর্মমতের প্রতি আনুগত্য না থাকার জন্যই সে মানুষের প্রতি প্রেম আর ভগবদ্‌ভক্তির প্রকাশরূপ কল্পনা করতে পেরেছে। সে বলেছে,—

"সেদিন দেখলুম ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকার ভক্তির প্রকৃতি মালতীর প্রতি আমার ভালবাসার চেয়ে পৃথক নয়। ও একই ধরনের, একই জাতীয়। যেখানে হৃদয়ের অনুভূতি নেই, ভালবাসা নেই, সেখানে ঈশ্বরও নেই। ভগবানের প্রতি যে ভক্তি আমার এল—তা এল একটা অপূর্ব আনন্দের রূপে—সত্যিকারের ভক্তি একটা joy of life আত্মা, দেহ, মন যেখানে আনন্দে, মাধুর্যে আপ্লুত হয়ে যায়।"

এই উপন্যাসে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার যে রূপটি ব্যক্ত হয়েছে তা কোন অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রথিত হয় নি। জিতু অধ্যাত্মভাবনার ধারা অবলম্বন করে কোন আধ্যাত্মিক সত্যোপলব্ধিতে গিয়ে পৌঁছয় নি—এর প্রধান কারণ হয়তো তার নিজের জীবনেরই বহুধা বিচ্ছিন্নতা। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তার জীবন এতবার বিপর্যস্ত হয়েছে যে, সে একাগ্র-চিত্তে কোন গভীর সত্যের ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ার অবকাশ পায় নি। তার বহির্জীবনের মতোই তার অধ্যাত্মজীবনও ট্র্যাজিক হয়ে উঠেছে। যে দৃষ্টিপ্রদীপ এক অমূল্য সম্পদ্‌রূপে সে পেয়েছে তা তার জীবনে কোন সার্থকতা আনে নি। সেজন্য তার মধ্যে এই অলৌকিক শক্তির কল্পনার কোন তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না। শ্রীকুমার এ প্রসঙ্গে বলেছেন,—

"এই অনৈসর্গিক বিভূতিকে আমরা ঠিক সহানুভূতির চোখে দেখি না—জিতু যেন আমাদের হইতে স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী বলিয়াই আমরা মনে করি।"—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

অবশ্য এই অপ্রাকৃত শক্তির কথা ভুলে গেলেও উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে জিতুর মূল্য খুব বেশি কমে বলে মনে হয় না। তার আত্ম-কেন্দ্রিক লাজুক স্বভাব অথচ অপরের সঙ্গে অন্তরের সম্বন্ধ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা সহজেই ধরা পড়ে। তার চরিত্রবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীকুমারের মূল্যবান্ মন্তব্য—

"অপুর বন্ধনহীন, উদার অনাসক্তির সহিত জিতুর আসক্তিপ্রবণতা তুলনীয়। জিতু উদাসীন সন্ন্যাসীর মতো দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে অন্তরে গৃহী। নীড় রচনার একান্ত কামনা, প্রেমের উত্তপ্ত নিবিড় স্পর্শ—তাহার জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা।" —তদেব।

এই আকাঙ্ক্ষার পূরণ থেকেই সে বার বার বঞ্চিত হয়েছে। উপন্যাসটির গোড়ায় দার্জিলিং-এর জীবনে একটি স্নেহগুণ্ঠিত সুখী পরিবারের চিত্র আছে। নিতু, জিতু আর সীতা—এই তিনজনের মধ্যেই ভালোবাসাভরা গৃহকোণের জন্য আশা প্রবল ছিল। নিতু আর সীতার আশাভঙ্গ হলেও তাদের মন জিতুর মতো স্পর্শসচেতন না হওয়ায় তারা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে নি। কেবল জিতুকেই মর্মান্তিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। তার নীড়ের স্বপ্ন বার বার ভেঙ্গে গেছে। হয়তো ঐ দৃষ্টিপ্রদীপ থাকার জন্যই সে একেবারে চূর্ণ হয়ে যায় নি।

অবশ্য জিতুর জীবনে মাঝে মাঝে প্রেমের স্পর্শ মিলেছে। জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে নির্মম ব্যবহারের পর শৈলের স্নেহ জিতুর কাছে এক অমূল্য সম্পদ বলে মনে হয়েছে। ছোটো বউঠাকরুণই সম্ভবত সব প্রথম তার অন্তরে প্রেমের অস্ফুটপ্রায় চেতনা জাগিয়ে তুলেছে। মালতীর সংস্পর্শে আসার পর প্রেমের অনুভূতি সম্পর্কে সে সচেতন হয়ে উঠেছে। মালতী তার ঘর বাঁধার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে নি। উপন্যাসের একেবারে শেষ দিকে গ্রামের কিশোরী হিরণ্ময়ী তার জীবনের সব চেয়ে বড়ো সাধ পূর্ণ করেছে। তার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তি, তার ভগবৎপ্রেম শেষ পর্যন্ত প্রেমকবোষ্ণ গৃহকোণের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। পরবাসীর মতো দ্বারে দ্বারে ঘুরে সে অবশেষে নিভৃত নিলয়ে শান্তিলাভ করেছে। জীবনতৃষ্ণার এই পরিণতিই, উপন্যাসের জীবনদর্শন। পথের পাঁচালীকার বিভূতিভূষণের পক্ষে জীবনায়নের এই পরিণাম কল্পনা বিস্ময়কর সন্দেহ নেই, কিন্তু তাৎপর্যময় নয় কি? মরমুষের প্রেমের মধ্যে বেঁচে থাকার এই আকুল বাসনাই বিভূতিভূষণের কবিদৃষ্টিকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

জিতুর পরেই মালতীর চরিত্র উল্লেখযোগ্য। শ্রীকুমার মন্তব্য করেছেন,—

"সমস্ত মালতী উপাখ্যানটি একটু আজগুবি, অবিশ্বাস্য ধরনের বলিয়া ঠেকে। বিশেষত ইহা 'শ্রীকান্ত'-এ কমললতার অসংকোচ অনুকরণ।"—তদেব।

এই উক্তিটি মাত্রাতিরিক্তভাবে কঠোর। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসের পরিমণ্ডলই সাধারণ উপন্যাসের পরিমণ্ডল থেকে কিছু স্বতন্ত্র। জিতুর মানসিক প্রবণতাই এজন্য যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী। জিতুর কল্পনাময় জীবনে মালতীর আবির্ভাব আর তিরোভাব কিছুটা অপ্রত্যাশিত হলেও বিশ্বাসযোগ্যতার সীমা অতিক্রম করেছে বলে মনে হয় না। তবে মালতীর চরিত্রে প্রেম আর কর্তব্য বা আদর্শের যে বিরোধ অঙ্কিত হয়েছে বা তার যে পরিণাম দেখানো হয়েছে তার মধ্যে রোমান্টিক কল্পনার কিছুটা অতিরঞ্জন যে আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের কমললতা মালতী-চরিত্র কল্পনার মূল কিনা বলা কঠিন; তবে এই দুই চরিত্রের ধাতু আর প্রকৃতি দুই-ই যে পৃথক, মনোযোগী পাঠকের কাছে তা সহজেই ধরা পড়ে।

হিরণ্ময়ী চরিত্রে স্বগত কোন বিশিষ্টতা ফুটে ওঠে নি—জিতু যে তার মধ্যে শান্তিময় নীড়ের আশ্বাস খুঁজে পেয়েছে এজন্য তার নিজের চিত্তপ্রবণতাই দায়ী। শৈল, ছোটো বউঠাকরুণ, বৌদি প্রভৃতি চরিত্রেও তেমন কোন বিশিষ্টতা ফুটে ওঠে নি। অবশ্য সীতার চরিত্রে কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নিতু, জিতু আর সীতা তিনজনের প্রকৃতির মধ্যে গভীর মিল আছে। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে স্বভাবগত সরল বিশ্বাস ছিল। এই সরলতার জন্যই অনেক দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। এই সরলতা তারা মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে বলে মনে হয়।

বিভূতিভূষণ কয়েকটি চরিত্র সম্ভবত তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছিলেন। নিমচাঁদ, তার স্ত্রী আর জনৈকা বৃদ্ধার কথা প্রথমে

উল্লেখ করা যেতে পারে। তাদের অন্ধবিশ্বাস আর ঐকান্তিক ভক্তি কাল্পনিক নয়—ঐ রকম ভক্তি আর বিশ্বাস যে গ্রামের অতি দরিদ্র নরনারীর মজ্জাগত বিভূতিভূষণ তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। গ্রাম্য পীঠস্থান বটতলার প্রতি তাদের আন্তরিক ভক্তির পাশাপাশি মেজবাবু আর কর্মচারীদের হৃদয়হীনতার ছবি বৈপরীত্যকে তীব্র করে তুলেছে। জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমা বা ঐ পরিবারের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যেও বাস্তবানুগতা লক্ষ্য করা যায়। কল্পনাজীবিত চরিত্রগুলির তুলনায় এই সব গাছিক চরিত্র জীবন্ত আর নিপুণ হাতের সৃষ্টি বলে মনে হয়।

'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। 'পথের পাঁচালী' বা 'অপরাজিত' উপন্যাসেও উক্তির মধ্যে চলিত ভাষার প্রয়োগ আছে, কিন্তু সেখানে সাধু ভাষাই মূল অবলম্বন। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উত্তম পুরুষে রচিত হওয়ার জন্যই সম্ভবত বিভূতিভূষণ চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন। অবশ্য পরবর্তী উপন্যাস 'আরণ্যক' উত্তম পুরুষে কথিত হলেও সাধু ভাষায় রচিত হয়েছে। এখানে চলিত ভাষার মধ্যে ভারহীনতার স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করা যায়। ভাষার কাব্যময় সৌন্দর্য এতে কিছুটা কমে গেলেও এই ভাষারীতি উপন্যাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়েছে। ভাষার লঘুগতি, বাক্যের আপেক্ষিক সরলতা, বাক্যাংশের ঋজুতা জিতুর সংকোচ সীমিত মনের প্রকাশের যোগ্য বাহন হয়েছে।

৫

আরণ্যক

এই উপন্যাসের শিল্পগত আলোচনার আগে বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরে দু'টি শোক-সংখ্যায় এই উপন্যাসটি সম্পর্কে কয়েকজন সাহিত্য-সেবীর আকর্ষণীয় মন্তব্য উদ্ধার করলাম।—

[ক] " 'আরণ্যক' সব চাইতে ভাল লাগে, যেমন নূতন তেমনি চমৎকার, পড়লে ঘরে বসেই হাওয়া বদলের ফল হয়।"—রাজশেখর বসু, কথাসাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।

[খ] "আমার কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে তাঁহার 'আরণ্যক'। আমাদের উপনিষদকে বলে আরণ্যক শাস্ত্র। উপনিষদ অর্থে রহস্যময়। 'আরণ্যক' বাংলার উপন্যাস-সাহিত্যে রহস্য-গ্রন্থ, এক অভিনব উপনিষদ। অরণ্য এই প্রকৃতির দুলালকে মুগ্ধ করিয়াছে, অরণ্যের ভীমকান্ত সৌন্দর্য, তাহার বৃক্ষলতা, তাহার ফুলফল জীবজন্তু, অরণ্যের নরনারী বিভূতিভূষণের অভিনব সৃষ্টি। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যকে' অরণ্যপ্রকৃতিকে মানসলোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি সে দৃশ্য আজও ম্লান হয় নাই। তাঁহার ভানুমতী, কুন্তা ও যুগলবিহারী আজও যেন আমাকে অনুসরণ করিতেছে। মঞ্চীকে যেন আজিও আমি খুঁজিয়া বেড়াই। রাখালবাবুর স্ত্রী ও ধ্রুবাকে আজও মাঝে মাঝে আমি স্বপ্নে দেখি।"—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।

[গ] " 'প্রবাসী'তে 'আরণ্যক' বেরুতে আরম্ভ করল। আশ্চর্য কথা এই যে, 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত'য় যে সুর 'আরণ্যকে'ও সেই সুর ; অথচ এক হয়েও এত আলাদা যে মনে হল, যেন একেবারে অভিনব বস্তু পেলাম। তার দুটো কারণ আছে বলে মনে হয় আমার। প্রথমত ওস্তাদের কণ্ঠে সুরের কাজ আরও সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে, বোধ হয় এতদিনের রেয়াজের জন্যই ; দ্বিতীয়ত, অরণ্যকে পটভূমি করে যে কোনরকমের উপন্যাস হতে পারে, বাঙালী পাঠক এর আগে ভাবতে পারে নি। বিভূতিভূষণ ছিলেন প্রকৃতির দুলাল, যাঁরা ওকে জানেন তারা জানেন এই মায়ের কোল পেলে তিনি শিশুর মতই কি ভাবে আত্মহারা হয়ে যেতেন ; 'আরণ্যক'-এর অরণ্যে তিনি এই মায়ের একেবারে সামনা-সামনি হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু মাত্র ঐ-টুকুতেই আরণ্যক রচনা হয় না, ওর সঙ্গে ছিল সেই দৃষ্টিপ্রদীপ, যা

এই আদি জননী অরণ্যের ওদিকে মানুষের মনকে প্রসারিত করতে পারে। 'আরণ্যক'-এর মত বই বাংলায় তো হয়ই নি, বিশ্বসাহিত্যেও কটা আছে জানি না; 'আরণ্যক' সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে সমালোচককে একটা কথা মনে রাখতে হবে, তা এই যে—তার সুর আগে গাওয়া হয়ে গেছে, বাঙালীপাঠক তার সঙ্গে পরিচিত, তাতে 'পথের পাঁচালী'র সেই নতুন মূর্ছনার চমক নেই; কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে বাঙালীর হৃদয়কে এমন করে একেবারেই জয় করে নিলে।" —বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, তদেব।

'আরণ্যক' উপন্যাসটিকে অরণ্যের কাব্য বলা যেতে পারে। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেম এই উপন্যাসে যেমন গভীর তেমনই তীব্র হয়ে উঠেছে। অরণ্যের মায়া সারা উপন্যাসটির মধ্যে ফুটে উঠেছে। 'পথের পাঁচালী' বা 'অপরাজিত' উপন্যাসে প্রকৃতি অনুকূল পরিবেশ নয়, সারা উপন্যাসটির মধ্যে যেন একটি স্বতন্ত্র ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য যথার্থ।—

"প্রকৃতির যে সূক্ষ্ম, কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসের গৌরব তাহা এই উপন্যাসে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতি এখানে মুখ্য, মানুষ গৌণ। সীমাহীন আরণ্য প্রকৃতি লেখকের মন ও কল্পনাকে পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে। ইহার প্রতি ঋতুতে, দিবারাত্রির প্রহরে প্রহরে, জ্যোৎস্না অন্ধকারের বিভিন্ন পটভূমিকায়, পরিবর্তনশীলতার মধ্যে এক সুগভীর অপরিমেয় রহস্যবোধ অবিচল কেন্দ্রবিন্দুর ন্যায় স্থির হইয়া আছে।"—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

'আরণ্যক' উপন্যাসের মধ্যে বিভূতিভূষণের কবিদৃষ্টির এক পরম আশ্চর্য বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির পরিদৃশ্যমানরূপ এই উপন্যাসে অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রকৃতির সৌন্দর্য একদিকে মাধুর্যময় হয়ে উঠেছে; অপরদিকে অরণ্যের গহনতা প্রকৃতির একটা রহস্যঘন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। অরণ্যপ্রকৃতি মোহিনী—কিন্তু সে কেবলমাত্র করুণাময়ী বা মধুরা নয়, সে মায়াবিনী রাক্ষসীর মতো মানুষকে

ভুলিয়ে তার জীবনকে গ্রাস করতে দ্বিধা বোধ করে না। প্রকৃতি যেন তন্ত্রোক্ত শক্তির মতো লালনী আর মারণী মূর্তি ধারণ করেছে। প্রকৃতির এই রহস্যগভীরতার উপলব্ধি বিভূতিভূষণের কবিচেতনার এক বহুমূল্য প্রাপ্তি। এই প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে কালচেতনা সংযুক্ত হয়েছে—বিভূতিভূষণ নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ভারত সভ্যতার ইতিহাসের ধারা বা বৃহত্তর অর্থে মানবসভ্যতার বিকাশের সত্যটি যেন প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করেছেন। তৃতীয়ত, এই দুই চেতনা তাঁকে যেন সৃষ্টির অপরিমেয় রহস্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। এই সচেতনতা অধ্যাত্মবোধের অভিমুখীন হয়েছে, 'দেবযান' বা 'ইছামতী' উপন্যাসের মধ্যে যে সৃষ্টি ও স্রষ্টৃ-চেতনা পরিণত আকারে ব্যক্ত হয়েছে এইখানে তার উন্মেষ।

কিন্তু অরণ্যপ্রকৃতির রহস্যগহনতা, কালচেতনা বা অধ্যাত্মবোধই 'আরণ্যক' উপন্যাসের সমগ্র আবেদন নয়। বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসে মানুষের যে ছবি এঁকেছেন তা তাঁর অসামান্য জীবনদৃষ্টির পরিচয় দেয়। শ্রীকুমার এই উপন্যাসে প্রকৃতিকে মুখ্য আর মানুষকে গৌণ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর আর একটি মন্তব্য—

"এই চেতনা শক্তিসম্পন্ন, নিগূঢ়ভাবে ক্রিয়াশীল প্রকৃতিপ্রতি-বেশের মধ্যে মানুষের সংকুচিত উপস্থিতি চমৎকার সামঞ্জস্যবোধের নিদর্শন।"—তদেব।

মানুষের উপস্থিতি প্রকৃতির বিস্তারের তুলনায় কিছুটা সংকুচিত হলেও বিভূতিভূষণ মানুষকে কোথাও খর্ব করেন নি। অরণ্যপ্রকৃতির রূপ প্রধান হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু মানুষের জীবনের যে পরিচয় উপন্যাসটিতে আছে তা একান্ত সত্য। শ্রীকুমার যে সামঞ্জস্যবোধের কথা বলেছেন তা শিল্পগত সামঞ্জস্যবোধ নয়—বিভূতিভূষণ অরণ্য-প্রকৃতির পরিমণ্ডলের মধ্যে মানুষের উপস্থিতি বা অবস্থিতির যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা নিছক শিল্পগত সৌষম্যবোধের নিদর্শন নয়; বিভূতিভূষণের জীবনচেতনাই প্রকৃতির আর মানুষের সম্পর্ককে

সুসমঞ্জস করে তুলেছে। এই জীবনচেতনা জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আর গভীর সহানুভূতির ফলেই সম্ভবপর। অভিজ্ঞতার সঙ্গে কবিদৃষ্টির সম্মেলনের ফলেই প্রকৃতি আর মানুষের সহজ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উপন্যাসের মধ্যে একটি অখণ্ড ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। 'আরণ্যক' অরণ্য সম্পর্কীয় প্রকৃতিবৃত্তান্ত নয়, এ অরণ্য-জীবনকথা।

এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে ভারত-জীবনের একটি সুবৃহৎ অংশ মূর্ত হয়ে উঠেছে। অথচ কোন চরিত্রই ছাঁচে ঢালাই করা প্রতীক চরিত্র নয়। প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে অসামান্য সজীবতা ফুটে উঠেছে। অতি তুচ্ছ চরিত্রের মধ্যেও স্বাতন্ত্র্যের অভিনব স্বাদ অনুভব করা যায়। পাঁচটা মহিষের মালিক গনু মাহাতো, পূজাপরায়ণ রাজু পাঁড়ে, টোল প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত মটুকনাথ, গ্রাম্য কবি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ, নিঃস্বার্থ পুষ্পপ্রেমিক যুগলপ্রসাদ, বালক নর্তক ধাতুরিয়া, বৃদ্ধ 'ননীচোর নাটুয়া'—কুন্তা, মঞ্চী, তুলসী, সুরতিয়া, ধ্রুবা—অনার্য রাজা দোবরু পান্না আর তার পৌত্রী রাজকন্যা ভানুমতী—প্রত্যেকটি চরিত্রে অরণ্যের বৃক্ষলতার সজীবতার পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি পরাক্রান্ত মহাজন রাসবিহারী সিং বা দুর্দান্ত প্রজা নন্দলাল ওঝার মধ্যেও 'অরুগ্ণ বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা'র পরিচয় ফুটে উঠেছে।

এই অরণ্যকাহিনীর মধ্যে অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ আছে। সরস্বতী কুণ্ডীর রহস্যময় পরিবেশকে ঘিরে নানা কাহিনী কল্পিত হয়েছে। রামচন্দ্র আমীন ও বৃদ্ধ ইজারাদারের পুত্রের অদ্ভুত দর্শন, উন্মত্ততা বা মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এর অলৌকিক রহস্য গল্পের মধ্যে স্থান পেয়েছে। বুনো মহিষের দেবতা টাঁড়বারোকে কেন্দ্র করে যে অপ্রাকৃত বিশ্বাস অরণ্যবাসীদের মধ্যে প্রচলিত তাও উল্লিখিত হয়েছে। ঐ সব অতিপ্রাকৃত কাহিনী বা বিশ্বাস অরণ্যের এই কাব্যের পরিমণ্ডলের সঙ্গে কেবল যে খাপ খেয়ে গেছে তাই নয়, ঐ বৃত্তান্তগুলি অরণ্যের রহস্যকে যেন এক অতীন্দ্রিয়লোকের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছে।

উপন্যাসটির শেষ দিকে একটি প্রচ্ছন্ন ট্র্যাজিক সুর শোনা যায়।

উপন্যাসটির কথক অরণ্যপ্রেমিক ; কিন্তু প্রজাদের মধ্যে জমি বিলির যে কাজ তিনি নিয়েছেন তার অর্থ অরণ্যের ধ্বংস। লোকবসতি বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যের সৌন্দর্যের বিলুপ্তির জন্য তিনি আক্ষেপ করেছেন। অরণ্যের এই পরিণতির সঙ্গে অরণ্যসভ্যতায় লালিত অনার্য রাজা দোবরু পান্নার সম্পদ আর রাজ-গৌরবের পরিণাম যেন একই কল্পনার সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। স্থূল বাস্তব লাভকে অবলম্বন করে একালের যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে তা যেমন একদিকে অরণ্যকে গ্রাস করছে অন্যদিকে তেমনই সুপ্রাচীন সংস্কৃতির ক্ষীণ ধারাটিকে অবলুপ্তির পথে এগিয়ে দিচ্ছে। অবশ্য এই বেদনাবোধ কোথাও তীব্র হয়ে উঠে উপন্যাসটির কেন্দ্রগত শান্ত রসকে ব্যাহত করে নি। ট্র্যাজিক সুরটিকে পরিস্ফুট করে তোলার উদ্দেশ্য বিভূতিভূষণের ছিল না, উপন্যাসের শেষ দিকে এই সুরটি অর্ধস্ফুট আকারে দেখা দিয়েছে এই মাত্র। সমগ্র উপন্যাসটির মধ্যে অরণ্য-জীবনের রহস্যগভীরতার যে চেতনা ফুটে উঠেছে তার মধ্যে ভিন্নতর ভাবনা একেবারে মিলিয়ে গেছে।

'আরণ্যক' কোন কোন সমালোচকের মতে বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এটি বিভূতিভূষণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' উপন্যাসযুগ্মকের সাহিত্যগত মূল্য আরও বেশি—অপুর সুতীব্র জীবনপিপাসা আর কল্পনাপ্রবণতা উপন্যাসযুগ্মককে যেমন মনোজ্ঞ তেমনই ভাবগভীর করে তুলেছে। 'আরণ্যক' উপন্যাসটির বস্তুগত মহিমা তো আছেই, বিভূতিভূষণের শিল্পদৃষ্টি এখানে আরও অনেক পরিণত। অরণ্যপ্রকৃতি আর অরণ্য-বাসী মানুষের জীবনের মিলন বা দ্বন্দ্বের চিত্রগুলি অঙ্কন করতে তিনি যে সামঞ্জস্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা অসামান্য শিল্পদক্ষতারই নিদর্শন। প্রকৃতির রূপ অবলম্বন করে বা প্রকৃতির ক্রোড়চারী মানুষের জীবন প্রত্যক্ষ করে সৃষ্টির রহস্যগভীরতা সম্পর্কে যে বোধ তাঁর অন্তরে জেগেছে তাও তিনি সহজে উপন্যাসের মধ্যে উপস্থাপন

করেছেন। 'পথের পাঁচালী' বা 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপুর কল্পনাকে অবলম্বন করে বিভূতিভূষণ যেখানে তাঁর জীবনভাবনার পরিচয় দিয়েছেন সেখানে কোথাও কোথাও তিনি যেন কাহিনীর স্রোত কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ রেখেছেন বলে মনে হয়। কিন্তু এখানে কাহিনী আর জীবনভাবনা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বিভূতিভূষণ এখানে এমনই একটি পরিমণ্ডল আর জীবন উপন্যাসের উপাদানরূপে গ্রহণ করেছেন যে তাঁর জীবনদৃষ্টি অতি সহজে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে। কবি-দৃষ্টি আর শিল্পচেতনার এমন অপূর্ব সমন্বয়ের পরিচয় বিভূতিভূষণের অপর কোন উপন্যাসে পাওয়া যায় না।

এই উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকুমার তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে যে প্রশস্তি জ্ঞাপন করেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।—

"প্রকৃতির এই ইন্দ্রজাল লেখক কত নিবিড় ও বিচিত্রভাবে অনুভব করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। জনহীন, বিশাল আরণ্যপ্রান্তরের জ্যোৎস্না রাত্রি তাঁহার কল্পনাকে বিভিন্ন-ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—ইহা কখনও পরীরাজ্যের মায়াময়, অপার্থিব স্বপ্নসৌন্দর্য কখনও বা প্রেতলোকের বিভীষিকা জাগাইয়াছে। তেমনি নিস্তব্ধ অন্ধকার নিশীথিনী এক গভীরতর রোমাঞ্চকর অনুভূতিকে—যাহাকে বলে cosmic imagination তাহাকেই—স্ফুরিত করিয়াছে: কল্পনাকে সৃষ্টিরহস্যের মর্মস্থলে লইয়া গিয়া সৃষ্টিক্রিয়ার নিগূঢ় আনন্দশিহরণ ও সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতি-পরিচয়কে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। আবার আদিম, আরণ্যজাতির সহিত সংস্পর্শ একদিকে বন্য মহিষের রক্ষাকর্তা ট্যাড়বারোদেবের কল্পনাকে রূপ দিয়াছে; অন্যদিকে কেবলমাত্র শিক্ষিত মনের পক্ষেই যাহার ধারণা সম্ভব, সেই যুগ-যুগান্ত-প্রসারিত ঐতিহাসিক কল্পনাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। দৃশ্যের পর দৃশ্য একদিকে বর্ণপ্লাবনের বিচিত্র সৌন্দর্যে চক্ষু ও মনকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, অপর দিকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির

সহিত মানবমনের এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কাহিনী বাঙ্গলা উপন্যাসে ত নাই-ই, ইউরোপীয় উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নহে।"

৬

আদর্শ হিন্দু হোটেল

'আদর্শ হিন্দু হোটেল' উপন্যাসেই বিভূতিভূষণ সবপ্রথম প্রকৃতি-প্রেম বা আত্মমগ্নতা পরিহার করে সাধারণ মানুষের কথা বলতে শুরু করেছেন। অবশ্য এই উপন্যাসে হাত দেওয়ার আগে তিনি এমন অনেক ছোটগল্প লিখেছেন যেগুলির মধ্যে সাধারণ মানুষের জীবনের রূপই ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসের নায়ক হাজারি চক্রবর্তী একজন সাধারণ হালুইকর। সে বেচু চক্রবর্তীর হোটেলের রাঁধুনী বামুন ছিল। রান্নার হাত খুব ভালো হলেও. পরের কাছে চাকরি করার সময় তাকে অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছে। সে কী করে নিজে একটি হোটেল খুলল বা রাণাঘাট রেল স্টেশনে হোটেল খুলতে পারল তার ইতিবৃত্তই এই উপন্যাসটির কথাবস্তু।

এই উপন্যাসটির কাহিনীর কোন বাস্তব ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। রাণাঘাট স্টেশন বা ঐ শহরের কোন হোটেল দেখে এমনই একটা হোটেলের কথা তাঁর মনে আসতে পারে। 'উর্মিমুখর' দিনলিপিতে হাজারি পরটা নামে একজন রন্ধনকুশলীর পরিচয় আছে—সে খুব বড়ো বড়ো খাস্তা পরটা করতে পারত বলে তার ঐ অপরূপ উপাধি। বিভূতিভূষণ ঐ নামটি মাত্র নিয়েছেন, বাকি তাঁর কল্পনা।

'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-এর ঘটনাপ্রবাহ উত্তরঙ্গ না হলেও নিথর নয়। বেচু চক্রবর্তীর হোটেলে কাজ করবার সময় অহৈতুক লাঞ্ছনাই হাজারির মনে স্বাধীনভাবে হোটেল খোলার সংকল্প জাগিয়ে তুলেছে।

নিজের রন্ধননৈপুণ্য সম্পর্কে সে সচেতন। বিশেষত সাধুতার উপর বিশ্বাস থাকায় আর সে নিজে সৎ হওয়ায় ভাবী প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সে নিঃসন্দেহ। তার অভাব ছিল মূলধনের, কিন্তু গ্রামের মেয়ে কুসুম তাকে এ বিষয়ে সহায়তা করেছে। তার উপর অনেক প্রতিকূল অবস্থা উত্তীর্ণ হওয়ার পর সে যখন সত্য সত্যই হোটেল খুলে বসেছে তখন সৌভাগ্যলক্ষ্মী তার উপর অকুণ্ঠভাবে কৃপাবর্ষণ করেছেন। কাহিনীর এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রীকুমারের মন্তব্য যথার্থ।—

"হাজারি ঠাকুরের চরিত্রটি চিত্তাকর্ষক। কিন্তু তাহার অদৃষ্টে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দৈবের যে প্রসাদ পরম্পরা পুঞ্জীভূত হইয়াছে, যেরূপ একটানা সৌভাগ্যের স্রোতে, চারিদিক হইতে প্রবাহিত অনুকূল বায়ুর প্রেরণায়, তাহার জীবনতরী সাফল্যের বন্দরে ভিড়িয়াছে তাহা বাস্তব প্রতিবেশ অপেক্ষা রূপকথার সহিতই অধিক সাদৃশ্যবিশিষ্ট।" —বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

বেচু চক্রবর্তীর হোটেলে অকথ্য পরিশ্রম আর লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি আর নিজে স্বাধীনভাবে হোটেল খোলার পর তার ধীরে ধীরে অভাবিত উন্নতির ইতিকথা অবিশ্বাস্য না হলেও অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। উপন্যাসের কাহিনী হিসাবে হাজারি ঠাকুরের ইতিবৃত্তের বিশেষ মূল্য নেই। কাহিনীটি মোটামুটিভাবে উপাদেয় হলেও উপন্যাসের কাহিনীর বিস্তৃতি, গভীরতা বা বিচিত্রতা কোনটিই এর মধ্যে পাওয়া যায় না। অতি সাধারণ কাহিনীর মধ্যে কয়েকটি চরিত্রের যে ছবি আঁকা হয়েছে তার জন্য উপন্যাসটি আকর্ষণীয়। চরিত্রগুলি হয়তো কল্পিত, কিন্তু বিভূতিভূষণ এমনভাবে চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন যে মনে হয় যেন তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই চরিত্রগুলি উপন্যাসের মধ্যে সন্নিবেশ করেছেন। হাজারি ঠাকুরের উচ্চাভিলাষ তাকে নভশ্চর করে নি—সাধারণ মানুষের মতোই তার আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে। সে যেমন হোটেল খোলার কল্পনা করে, তেমনই গ্রামের মেয়ে কুসুমের কল্যাণের কথা চিন্তা করে, মেয়ের

বিয়ে সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়; চরম লাঞ্ছনা বা গঞ্জনা ভোগ করলেও তার পুরোনো মনিব বেচু চক্রবর্তী বা পদ্ম ঝির সঙ্গে তার সহৃদয় ব্যবহার তার অন্তরের যথার্থ সরলতার পরিচয় দেয়। অতসীর বিধবা বেশ দেখে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হাউমাউ করে কান্না তার সরল হৃদয়টুকু একেবারে মেলে ধরেছে।

বেচু চক্রবর্তী একটি বাস্তব চরিত্র। সে একজন ঝানু ব্যবসায়ী। কর্মচারীদের শাসনে রাখা সম্পর্কে সে নিতান্ত দক্ষ। হাজারি ঠাকুরের হোটেল খোলার সময় সে যেভাবে বিরুদ্ধতা করেছে তাতে তার ব্যবসায়বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য সে নিপট খল বা পাষণ্ড চরিত্র নয়। হাজারি যখন তাকে সম্মান দেখিয়ে তার হোটেলের ম্যানেজার করেছে তখন সে সানন্দে রাজি হয়েছে। পদ্ম ঝি সম্পর্কেও ঐ কথা বলা চলে। বেচু চক্রবর্তীর চেয়ে পদ্ম ঝির চরিত্র আরও বলিষ্ঠ রেখায় অঙ্কিত হয়েছে। বেচু চক্রবর্তীর হোটেল উঠে যাওয়ার বর্ণনায় তার চরিত্রের একটি ট্র্যাজিক দিকের প্রতি ইঙ্গিত আছে।

৭

বিপিনের সংসার

'বিপিনের সংসার' উপন্যাসটি বিভূতিভূষণ বনগ্রাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। বনগ্রাম হাইস্কুল থেকেই বিভূতিভূষণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। নিছক গুরুদক্ষিণা পরিশোধের উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এই উপন্যাসটি বিদ্যালয় জীবনের প্রধান শিক্ষককে উৎসর্গ করেছিলেন কিনা বলা যায় না। সম্ভবত এই উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে তাঁর ছাত্রজীবনের কোন স্মৃতির ছায়াপাত থাকতে পারে।

'বিপিনের সংসার' উপন্যাসের পটভূমিকা বাংলার পল্লীগ্রাম—

বিভূতিভূষণের পরিচিত ভূখণ্ড—চব্বিশ পরগণার উত্তরাংশ আর নদীয়া জেলার কিছু অংশ। স্থানগত পটভূমিকা বিন্যস্ত করার সময় বাল্য-স্মৃতির সঙ্গে জড়িত কোন কোন স্থান উপন্যাসে নির্দেশ করলেও এই উপন্যাসে আঞ্চলিক কোন বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায় না। বাংলার যে কোন পল্লীঅঞ্চলকে কাহিনীর পটভূমিকারূপে স্থাপন করলে কোন অসুবিধা হত না। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-এর মতোই এই উপন্যাসে পল্লীপ্রকৃতিরও কোন স্থান নেই—মানুষের জীবনই উপন্যাসটির কথাবস্তু।

এই উপন্যাসের নায়ক বিপিন অল্পশিক্ষিত পল্লীযুবক। তার জীবনের পরিধি স্বভাবতই বিস্তৃত নয়, তার মধ্যে বৈচিত্র্যও নেই; কিন্তু তার জীবনের যে দু' একটি ছোটোখাটো তরঙ্গ উঠেছে তা তার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্—এই ছোটোখাটো তরঙ্গে তার জীবনের ডৌল পালটে গেছে। উপন্যাসের নায়ক হিসেবে সে নিষ্প্রভ—পরবর্তী কালের বিশিষ্ট উপন্যাস 'দেবযান'-এর নায়ক যতীনের সঙ্গে এই দিক দিয়ে তার স্বজাতীয়তা আছে; বিশেষত দু'টি ক্ষেত্রেই নারীর প্রেমে পুরুষ চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিপিনের জীবনে এসেছে মানী—বাহ্য দৃষ্টিতে সে তার মনিব জমিদার অনাদি চৌধুরীর মেয়ে। কিন্তু তাদের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর—বাল্যসঙ্গিতা তাদের মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত টান এনে দিয়েছে। এই টানের অন্য নাম হয়তো প্রেম—কিন্তু বিপিন আর মানী প্রেমিক-প্রেমিকা নয়। বিবাহিত পুরুষ আর বিবাহিতা নারীর প্রেমের বিচিত্র গতি অবলম্বন করে জটিল কাহিনী সৃষ্টি করার বাসনা বা প্রবণতা বিভূতিভূষণের ছিল না। মানী বিপিনের জীবনে কল্যাণের আলো নিয়ে এসেছে। তার আন্তরিক যত্ন বা সেবা ছাড়াও বিপিনের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য তার চিন্তা তাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। তার কথা শুনেই বিপিন অল্প শিক্ষিত হলেও নিজের চেষ্টায় বই পড়ে ডাক্তারি শিখে পসার শুরু করেছে। বিপিন মানীর প্রেম সম্পর্কে সচেতন—সে মানীর আকর্ষণ বা কল্যাণ চিন্তা

অনুভব করেছে বা সে সম্বন্ধে নিজের মনে আলোচনাও করেছে; সেই জন্যই এই প্রেম তাঁর জীবনে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মানীর প্রেমের সম্মান রক্ষা করার জন্যই সে ডাক্তারি করতে উদ্যত হয়েছে।

বিপিনের জীবনে আরও একটি নারীর প্রেম এসেছে, সে শান্তি। এখানেও প্রেম সেবাযত্নের আবরণে ঢাকা পড়েছে। বিবাহিতা নারী শান্তি বাহ্যত উচ্ছলা হলেও আত্মসংবৃতা। মানীর প্রেমের স্পর্শ পেয়ে নারীচরিত্রের এই দিকটা জানতে পেরেছিল বলেই বিপিনের কাছে তার হৃদয়ের ভাষা অজানা থাকে নি। বিভূতিভূষণ এখানেও মন দেওয়া-নেওয়া খেলার সম্ভাব্য জটিল জালে কাহিনীকে জড়াতে দেন নি। উপন্যাসের শেষে মানী বিপিনকে শান্তির সংস্পর্শ ত্যাগ করতে বলেছে।

স্ত্রী মনোরমাকে ধরলে তিনটি নারীর প্রেম বিপিনের জীবনে এসেছে। মনোরমাকে বাঙালীর গৃহবধূর প্রতিনিধি বলা যায়—দরিদ্রের সংসারের বধূর নীরব প্রেম তাকে জীবন্ত করে তুলেছে। সে, মানী আর শান্তি—তিনজনের প্রেমই প্রদীপের মতো স্নিগ্ধ, জ্বালাহীন। বৃহত্তর প্রেমকে ধারণ করার শক্তি অবশ্য বিপিনের ছিল না—বিভূতিভূষণ এ চরিত্রকে সেভাবে গড়েন নি। এই উপন্যাসে যদি কোন জীবনদর্শন বা তত্ত্ব থাকে তা নারীর ঐ শান্ত দ্যুতি সেবা-ময় সহজাত প্রেমের তত্ত্ব।

কেবল মনোরমা-মানী-শান্তিই যে এই প্রেম-তত্ত্বের দৃষ্টান্ত এমন নয়। বিপিনের বাবা বিনোদ চাটুজ্জের অনুগৃহীতা কামিনীও ঐ প্রেমের দৃষ্টান্ত। স্কুলের পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী আর মতি বাগদিনীর প্রেমের কাহিনীও উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দু'টি ক্ষেত্রেই প্রেম জাতিকুল বা শিক্ষাদীক্ষার বিচার করে নি। কামিনী সম্ভবত বিনোদ চাটুজ্জের রক্ষিতা স্থানীয়া ছিল; তার প্রতি বিনোদ চাটুজ্জের যথার্থ প্রেম ছিল কিনা জোর করে বলা যায় না। কিন্তু বিনোদ চাটুজ্জের প্রতি কামিনীর অনুরাগ অকৃত্রিম ছিল বলে অনুমান

করা যায়। ঐ অনুরাগই কালে নিম্নগামী স্নেহে পরিণত হয়ে বিপিনকে লালন করেছে। বিশ্বেশ্বর চাটুজ্জে সাধারণ গ্রাম্য পণ্ডিত হয়েও যেভাবে মতি বাগদিনীর প্রেমে নিজের মান, সম্ভ্রম, সমাজ সবই ত্যাগ করেছে তা হৃদয়াবেগের প্রবলতার একটি চূড়ান্ত নিদর্শন। বিভূতিভূষণ ঐ কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন নি; তবে যেটুকু ছবি এঁকেছেন তাতে প্রেমবৃত্তির তীব্রতা সম্পর্কে তাঁর চেতনার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বিভূতিভূষণের রচনায় প্রেমের এই রূপ বিশেষ দেখা যায় না—কেবল পরবর্তীকালের 'অথৈ জল' উপন্যাস এই আত্মহারা প্রেমকে অবলম্বন ক'রেই রচিত হয়েছে।

বিপিনের বিধবা বোন বীণার জীবনেও প্রেম এসেছে—প্রতিবেশী যুবক পটলের প্রতি তার আকর্ষণের প্রকৃতি সম্পর্কে অবশ্য সে সচেতন নয়। বীণার মধ্যে প্রেম বা অনুরাগের তীব্রতা আছে। অবশ্য সে যখন এ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে তখন থেকে সে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেছে। সেজন্য কাহিনীর মধ্যে প্রণয়-কাহিনীর উপশাখা পরিপুষ্ট হওয়ার অবকাশ পায় নি। ঐ ধরনের জটিলতা সৃষ্টি উপন্যাসের মূল কাহিনীর পক্ষে অবান্তরও হত। প্রেমকাহিনী অবলম্বন করে আবিল বাতাবরণ সৃষ্টি করা বিভূতিভূষণের প্রকৃতির প্রতিকূলও বটে।

এই উপন্যাসে প্রেমের অবতারণা সম্পর্কে শ্রীকুমারের মন্তব্য,—

"তাঁহার সমস্ত উপন্যাসেরই একটা সাধারণ লক্ষণ—প্রেমের আপেক্ষিক বর্জন, প্রেমের দুঃসাহসিকতা ও তীক্ষ্ণ বিক্ষোভের প্রতি তাঁহার একটা প্রকৃতিগত বিমুখতা আছে। তাঁহার রচনায় হৃদয়াবেগ শান্ত, স্নিগ্ধ সমবেদনা, নিরুত্তাপ, দ্রবীভূত কোমলতার আকারেই দেখা দেয়। তাঁহার দাম্পত্য সম্পর্ক বর্ণনা এই উষ্ণ আবেগের অভাবের জন্যই কতকটা অপূর্ণ বলিয়া ঠেকে। নিষিদ্ধ প্রেমের সীমানাতেও তিনি ঘেঁষেন নাই—এই তীব্র হৃদয়মন্থনে যে অমৃত-হলাহল উঠে তাহা পান করিতে তিনি রুচির দিক দিয়া অনিচ্ছুক ও সম্ভবত শক্তির

দিক দিয়া অসমর্থ। এই উপন্যাসে কিন্তু নারী-পুরুষের সমাজ-অনমুমোদিত আকর্ষণকে তিনি অত্যন্ত সাবধানতার সহিত, আগুনে হাত না পোড়াইয়া, ছুঁইয়াছেন। বিপিনের জীবনে মানী ও শান্তি এই দুই বিবাহিতা রমণীর প্রভাব এই উপন্যাসের বর্ণনীয় বিষয়। বিপিনের প্রতি ইহাদের মনোভাব সস্নেহ হিতৈষণা ছাড়াইয়া আর এক পর্যায় উপরে উঠিয়াছে—প্রেমের অস্বস্তি, যত মৃদুভাবেই, ইহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। অবশ্য লেখক এই আকর্ষণের দৈহিক লালসার দিকটা একেবারে চাপিয়া ইহার উচ্চতর প্রেরণা ও নিষ্কলুষ আবেগের দিকটাই বড় করিয়াছেন।...লেখকের অভ্যস্ত সঙ্কোচ একবার ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, তিনি যেন একটু অনাবশ্যক বাহুল্যের সহিত এই উপন্যাসে এই নিষিদ্ধ প্রেমের নানা উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন।"—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে এই সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমের অবতারণা একটু আকস্মিক বলে মনে হয়। এ সম্পর্কে একটি অনুমান প্রসঙ্গান্তরে ব্যক্ত করা হয়েছে, এখানে তার পুনরুল্লেখ সম্ভবত অসঙ্গত হবে না। বিভূতিভূষণ প্রথমা স্ত্রী গৌরীদেবীর মৃত্যুর পর প্রায় তেইশ বছর সংসার সম্পর্কে প্রায় নিরাসক্তভাবে জীবনযাপন করেন। ১৩৪৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। 'বিপিনের সংসার' এই সময়ে লেখা হয়—এর প্রকাশকাল ১৩৪৮ সালের ভাদ্র। নারী সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে নবজাগ্রত কৌতূহলই সম্ভবত তাঁকে উপন্যাসের মধ্যে নারীর প্রেমের রূপাঙ্কন করতে উৎসাহিত করেছিল। শ্রীকুমার অভ্যস্ত সংকোচ ভেঙে যাওয়া সম্পর্কে যে ইঙ্গিত করেছেন তাও উল্লেখযোগ্য, তবে তিনি সুস্পষ্টভাবে এর কোন কারণ নির্দেশ করেন নি।

নারীর প্রেমের ছবি আঁকলেও বিভূতিভূষণ যে রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন তা প্রেমিকার নয়। নারীর কল্যাণী মূর্তিই তিনি স্থাপন করেছেন। মনোরমাকে বাদ দিলেও এই উপন্যাসের প্রধান দু'টি নারী

চরিত্র মানী আর শান্তির মধ্যে স্নেহশীলতা আর সেবাপরায়ণতাই বেশি করে দেখা যায়, এক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ যেন শরৎচন্দ্রের আদর্শ কিংবা আর একটু এগিয়ে বলা যায় বাংলার নারীর চিরন্তন আদর্শকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। অপর্ণা থেকে তিলু বা অনঙ্গবৌ পর্যন্ত প্রায় সব চরিত্রই এক সুরে বাঁধা। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই উপন্যাসের সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প ছিল না; তবে শিল্পকর্মে বিভূতিভূষণের আপেক্ষিক অমনোযোগের ফলে এটি তাঁর অন্যতম অপ্রধান উপন্যাস থেকে গেছে।

৮

দুই বাড়ি

'বিপিনের সংসার' প্রকাশিত হয়েছে ১৩৪৮ সালের ভাদ্র মাসে, 'দুই বাড়ি' উপন্যাসের প্রকাশেরতারিখ—মহালয়া ১৩৪৮। বিভূতিভূষণ সম্ভবত প্রকাশকের পক্ষ থেকে পূজার আগে একখানি উপন্যাস প্রকাশ করার দাবি মেটানোর জন্য অত্যন্ত অল্প সময়ে এই উপন্যাস-খানি লিখেছিলেন। উপন্যাসটিতে অপরিণতির ছাপ সুস্পষ্ট; এটাই তাঁর দুর্বলতম উপন্যাস।

'বিপিনের সংসার'-এর অব্যবহিত পরে লেখার জন্যই সম্ভবত এই উপন্যাসে 'বিপিনের সংসার'-এর মূল কল্পনার ছাপ আছে। ঐ উপন্যাসে নায়ক দরিদ্র, অথচ জমিদারের কন্যা মানীর প্রেম তার জীবনে এসেছে। 'দুই বাড়ি' উপন্যাসের নায়ক নিধিরাম চৌধুরী কুড়ুলগাছি গ্রামের দরিদ্র পরিবারের যুবক, সবে মোক্তারি পাশ করে মফঃস্বলের (রামনগর) আদালতে পসার শুরু করেছে; নায়িকা গ্রাম থেকে অধুনা প্রবাসী মুনসেফ লালমোহন চাটুজ্জের মেয়ে মঞ্জু। পূজা উপলক্ষে মঞ্জুরা দেশে এসেছিল। নিধিরাম মঞ্জুকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে

বা তার আচরণ তাকে আকৃষ্ট করেছে। মেলামেশার ফলে দু'জনের মধ্যেই ঐ আকর্ষণ ক্রমে সঞ্চারিত হয়েছে। এই প্রেমই উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

বিভূতিভূষণ প্রধানত নিধিরামের চিন্তারই অনুসরণ করায় এই প্রেম সম্পর্কে তার চেতনা বা কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য তিনি এটিকে একটি পুরোদস্তুর প্রেম-কাহিনীতে পরিণত করেন নি। নিধিরাম বুঝেছে যে তার মতো দরিদ্রের সঙ্গে মঞ্জুর বিবাহ অসম্ভব। বিশেষত সে যে কোর্টে পসার শুরু করেছে তার সাব-ডেপুটি সুনীল-বাবুর সঙ্গে মঞ্জুর বিয়ে হওয়ার কথা জেনে আশাভঙ্গের বেদনায় কাতর হয়েও সে নিজেকে সামলে নিয়েছে। মঞ্জু ষোড়শী হলেও তার বুদ্ধি অপরিণত নয়। সে বুদ্ধিমতীর মতোই সহজে বিদায় নিয়ে বলেছে, 'কিছু ভাববেন না নিধুদা। আমি ছেলেমানুষ নই—কষ্ট সহ্য করতে পারব জীবনে। ও জিনিস কষ্টের জন্যই হয়। আপনি আশীর্বাদ করবেন যেন সহ্য করতে পারি।'

কথাবস্তুর মধ্যে গভীরতা নেই—গল্পাংশ নিতান্তই ফিঁকে। একটু রোমান্টিক প্রেমকল্পনা আর পরিণামে আশাভঙ্গের বেদনা দিয়ে যেসব অজস্র গল্প এই শতকের প্রথম চার-পাঁচ দশকে লেখা হয়েছে সেগুলির চেয়ে এর কাহিনীগত উৎকর্ষ আছে বলে মনে হয় না।

উপন্যাস হিসাবে দুর্বল হলেও 'দুই বাড়ি'তে কোন কোন বিষয়ে বিভূতিভূষণের স্বাভাবিক কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবানুগ চরিত্র আঁকতে তাঁর দক্ষতার নিদর্শন এই উপন্যাসে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আদালতের মোক্তারদের পরস্পর রেষারেষি, অর্থের জন্য হীনতা, মক্কেলদের নিয়ে মিথ্যাচারের যে ছবি তিনি তুলে ধরেছেন তা বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে হয় না। নিধিরাম কিছুটা কল্পনা হলেও বাস্তব চরিত্র; বিভূতিভূষণ তাকে রঙিন ফানুস করে আঁকেন নি। মঞ্জুর প্রতি আকর্ষণ তীব্র থেকে তীব্রতর হওয়া সত্ত্বেও সে কখনও নিজের অবস্থার কথা ভুলে যায় নি।

নিধিরামের বাবা-মা'র চরিত্র বিভূতিভূষণের বাস্তব বোধের আর একটি নিদর্শন। তাঁরা নিধিরাম-মঞ্জুর পরস্পর আকর্ষণ সম্পর্কে আদৌ সচেতন নন, মঞ্জুর প্রয়াসে হাকিম-পরিবারে নিধিরামের প্রতিপত্তিতে তাঁরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছেন। উপন্যাসের একে-বারে শেষ অংশে নিধিরাম টাইফয়েডে পড়ে অচৈতন্য হয়েছে—মঞ্জু এই সময় লালমোহনবাবুকে অনুরোধ করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। নিধিরাম সুস্থ হয়ে একথা শুনে এটিকে তার প্রতি মঞ্জুর প্রেমের একটি নিদর্শনরূপে গ্রহণ করেছে। কিন্তু তার মায়ের কাছে এটি ধনী হাকিমের লক্ষ্মী মেয়ের করুণা মাত্র।

মঞ্জু অর্ধেক মানবী, অর্ধেক কল্পনা। তার চরিত্রে যথেষ্ট সজীবতা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু নিধিরামের মুখেই উপন্যাসের ঘটনার বর্ণনা থাকায় তার রূপায়ণে কিছুটা রোমান্টিকতা অবশ্যই সঞ্চারিত হয়েছে। তবে বিভূতিভূষণ তার চরিত্র আঁকতে আদৌ বাড়াবাড়ি করেন নি—এই ধরনের লেখায় তাঁর বাস্তব চেতনা আর পরিমিতিবোধের আশ্চর্য পরিচয় পাওয়া যায়।

অনুবর্তন

'অনুবর্তন' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেকার দিনের শিক্ষকদের দৈন্য-পীড়িত জীবনের ইতিকথা। এই উপন্যাসে বিশিষ্ট কোন নায়ক নেই—'দরিদ্র শিক্ষক' এই সংজ্ঞাটিকেই নায়কের পদে বসানো যেতে পারে। কাহিনীর কেন্দ্র কলকাতার একটি বিদ্যালয়—'ক্লার্কওয়েলস মডার্ন ইনষ্টিটিউশন'—ক্লার্কওয়েল যার বেতনভোগী হেডমাস্টার হয়েও একছত্র অধিপতি। কাহিনীর মধ্যে এই মাত্রাতিরিক্ত নিয়মনিষ্ঠ আদর্শবাদী প্রধান শিক্ষকের এক নায়কের বিরুদ্ধে সাময়িক আন্দোলন

আছে বটে, কিন্তু সেটি আখ্যায়িকার একটি খণ্ডাংশ মাত্র। এই বিত্যায়তনকে কেন্দ্র করে কয়েকজন শিক্ষক যেন একটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছেন—ঐ পরিবারের প্রত্যেকের মধ্যে যেন একটি আত্মীয়তার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। এই উপন্যাস ঐ পরিবারভুক্ত কয়েকজন মানুষের জ্যোতিহীন জীবনযাত্রার পাঁচালী।

বিভূতিভূষণ নিজে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছিলেন—লেখার কথা বাদ দিলে শিক্ষকতাই তাঁর প্রধান বৃত্তি ছিল। এই উপন্যাসে তিনি যে নিজের চোখে দেখা মানুষের ছবি এঁকেছেন এমন নয়। এই উপন্যাসটি স্মৃতিভিত্তিক কথা নয়। তবে তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা বা বোধকে যথাসম্ভব ব্যবহার করতে তিনি কার্পণ্য করেন নি। এই উপন্যাসের প্রতেকটি চরিত্র জীবন্ত—অবশ্য যে জীবন এই সব চরিত্র যাপন করেছে তার মধ্যে প্রাণের প্রকাশ এত মলিন যে মানুষটিকে জীবন্ত বলা চলে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হতে পারে। দারিদ্র্য এঁদের জীবনকে একেবারে নিঃসার করে দিয়েছে। কেবল আর্থিক অভাব বা দুঃখকষ্ট নয়, এঁদের জীবন থেকে উদ্দীপনা বলে জিনিসটাই যেন চলে গেছে। শিক্ষকদের জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলে তাদের প্রতি করুণা আকর্ষণের কোন সচেতন প্রয়াস বা উদ্দেশ্য বিভূতিভূষণের ছিল না। তিনি হৃদয়ের অকুণ্ঠ প্রেম দিয়ে কয়েকজন দীপ্তিহীন মানুষের জীবনের কয়েকটি ছবি এঁকেছেন। দারিদ্র্য তাঁদের জীবনের সঙ্গী, শিক্ষাব্রতীর আদর্শের ক্ষীণতম অংশও তাঁদের বেশির ভাগের মধ্যে নেই। বিত্যালয়ে শিক্ষাদান তাঁদের কাছে দিনগত পাপক্ষয়—'সরল জীবন মহৎ চিন্তন' একটা কথার কথা। কেবল কোন. ছাত্র ভবিষ্যতে উন্নতি করেছে শুনলে তাঁদের মনে আনন্দ হয়—ঘোর তামসিকতার মধ্যে এই একটু সান্ত্বনা।—'এই ছাত্রের দল তাহাদের বাল্যজীবনের শত সুখস্মৃতির আধার তাহাদের স্কুল ও শিক্ষকদের ভুলে নাই ; কেহ আছে বর্মায়, কেহ আছে সিমলায়, কেহ বা কুমায়ুন, শিলং, মসলিপত্তনে। তবুও দেশের আশা-ভরসাস্থল পুত্রপ্রতিম এই

সব তরুণদল একদিন তাঁহাদেরই হাতে চড়টা চাপড়টা খাইয়া ইংরাজী ব্যাকরণের নিয়ম শিখিয়াছে, বীজগণিতের জটিল রহস্য বুঝিয়াছে—ভাবিয়াও আনন্দ হয়।'—মহৎ বা বৃহৎ জীবনের স্বাদ এই শিক্ষকদের জীবনে নেই—মহৎ ব্রত গ্রহণ করলেও তাঁদের জীবনে সে চেতনা নিরতিশয় মলিন।

অবশ্য দু'একটি চরিত্রের মধ্যে আদর্শবাদের পরিচয় যে মেলে না এমন নয়। হেডমাস্টার ক্লার্কওয়েল অতিমাত্রায় আদর্শবাদী। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষার উন্নতিসাধনের জন্য তাঁর পরিকল্পনার অন্ত নেই। শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কে তিনি অধ্যয়ন করেছেন। বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধানের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা আন্তরিক। ছাত্রদের পড়াশোনার দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ছাত্রদের উন্নতির জন্য তিনি শিক্ষকদের নিয়ে নিয়মিত আলোচনা-সভার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য বিদ্যালয়ের একটানা কাজের পর ঐ গুরুগম্ভীর সভা শ্রান্ত ক্ষুধার্ত শিক্ষকদের কাছে পীড়াদায়ক। ক্লার্কওয়েল তাঁর বিদ্যালয়ে স্বৈরাচারী শাসক—সহকর্মী শিক্ষকদের প্রতি তাঁর আচরণ সুহৃৎসম্মিত নয়, প্রভুসম্মিত। স্কুলকে তিনি ভালবাসেন, স্কুলের কাজ করতে যাঁর অসুবিধা হবে সেই শিক্ষক অনায়াসেই যেতে পারেন। এ বিষয়ে তাঁর উক্তির মধ্যে দ্বিধা নেই। তিনি খোলাখুলিভাবেই বলেন, 'মাই গেট ইজ ওপন।'

আদর্শনিষ্ঠ আর একজন শিক্ষক বৃদ্ধ নারাণবাবু। তিনি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অনুকূলবাবুর সহকর্মী। পুরোনো দিনের আদর্শ তাঁর মনে উজ্জ্বল। এই সর্বজনপ্রিয় প্রবীণ শিক্ষক ছাত্রদের ভালবাসেন—ছাত্রদের কোন দোষ বা ত্রুটি দেখলে তার সংশোধনের জন্য কড়া হেডমাস্টার ক্লার্কওয়েলের সঙ্গে আলোচনা করতেও দ্বিধা বোধ করেন না। তবে এই চরিত্রে নিছক আদর্শবাদের চেয়ে ছেলেদের প্রতি ভালোবাসাই বড়ো হয়ে উঠেছে।

ক্ষেত্রবাবু বা যদুবাবু দরিদ্র শিক্ষকদের 'টাইপ' কিন্তু তাঁরা নিষ্প্রাণ প্রতিনিধি বা প্রতীক চরিত্র নন। বিভূতিভূষণ তাঁদের জীবনের

সত্যিকার ছবি এঁকে তাঁদের জীবন্ত করে তুলেছেন। এই দুই দরিদ্র শিক্ষক পরিবারের বিস্তৃত কাহিনী রচনা করার অবকাশ বিভূতিভূষণ পান নি। দরিদ্রের সংসারের ছবি তিনি এঁকেছেন, কিন্তু দারিদ্র্যকে উৎকট করে বা মর্মস্পর্শী করে তুলতে চান নি। ভালোয়-মন্দে গড়া মানুষের সহজ পরিচয় এই দুই শিক্ষকের ইতিবৃত্তে ফুটে উঠেছে। জ্যোতির্বিনোদ, রামেন্দুবাবু, মিস গিবসন প্রভৃতি চরিত্র টাইপ হলেও সজীব। বরং অহংকারী সহকারী প্রধান শিক্ষক মিঃ আলম যেন কিছুটা প্রাণহীন্—হীন চরিত্র আঁকায় বিভূতিভূষণের বিমুখতা হয়তো এর একটা কারণ। মিঃ আলম ছাড়া অন্য সব চরিত্রকেই ভালোবাসা যায়।

উপন্যাসটির কথাংশ শিক্ষকদের জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—অন্য কয়েকটি চরিত্র প্রাসঙ্গিক ভাবে এসেছে মাত্র। কয়েকটি বালক চরিত্র আছে—কিন্তু বিভূতিভূষণ এই সব চরিত্র নিয়ে 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত' উপন্যাসের পুনরাবৃত্তি করতে চান নি।

উপন্যাসটির কাহিনীর গতি শ্লথ। উপন্যাসটির কথাবস্তুর আকর্ষণ অসামান্য। উপন্যাসের মধ্যে যে নাট্যসুলভ গতিময় কাহিনীর প্রত্যাশা করা হয়, এখানে তার কোন সুডৌল রূপ ফুটে ওঠে নি। এই উপন্যাসের মধ্যে একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জীবনধারার খণ্ড রূপ ফুটে উঠেছে। গতিময় কাহিনী সৃষ্টি না করে বিভূতিভূষণ চিত্রাঙ্কনেই উৎসুক হয়েছেন। অবশ্য চিত্ররসই বিভূতিভূষণের ঈপ্সিত ছিল না, এক একটি ছবি এঁকে তার মধ্য দিয়ে জীবনরসের স্বাদ পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন।

'অনুবর্তন' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ প্রায় তাঁর সমকালের কাহিনীকে টেনে এনেছেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই উপন্যাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে কলকাতায় যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে তার পরিচয় দিয়েছেন; জাপানী বোমার ভয়ে সন্ত্রস্ত কলকাতার ছবি সমকাল সম্পর্কে তাঁর বাস্তব চেতনার নিদর্শন সন্দেহ নেই। অবশ্য দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধ এই উপন্যাসে আংশিক বাতাবরণ রচনা করেছে এই মাত্র। বিভূতিভূষণ যখন এই উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন, তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কোন স্থায়ী প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া এ দেশে দেখা দেয় নি; সুতরাং মহাযুদ্ধ সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতার পরিচয় উপন্যাসটির মধ্যে না থাকাই স্বাভাবিক।

উপন্যাসটির মধ্যে দু'টি মৃত্যুর চিত্র আছে—একটি নারাণবাবুর, আর একটি যদুবাবুর। দু'টি ক্ষেত্রেই মৃত্যুপূর্ব ভাবনার বর্ণনায় বিভূতিভূষণের আশ্চর্য চেতনার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

১০

দেবযান

'দেবযান' প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বৎসর পরে (মৃত্যুর পূর্ব বৎসরে) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা একটি চিঠিতে বিভূতিভূষণ লেখেন,—

"প্রেতলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই। পৃথিবীর ঊর্ধ্বে বহু স্তর বিদ্যমান, বিশ্বে বহু লোক, বহু স্তর, বহু গ্রহ, মৃত্যুর পর সেখানে জীবের গতি হয়। এইসব Supermandane worlds আছে এবং ঋষিরা প্রাচীন যুগে তাদের অস্তিত্ব জেনেছিলেন। বৃহদারণ্যক ও ঈশোপনিষদে এদের কথা আছে।

এগুলির আকর্ষণ অতি তীব্র—পৃথিবীর জীবনের পরে যখন এই সব লোকে গতি হয় তখন পৃথিবীর আনন্দ এদের আনন্দের কাছে তুচ্ছ বলে মনে হয় বটে, কিন্তু আসক্তি বা কামনাই পুনর্জন্মের বীজ বপন করে।

প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে এই সব বিভিন্ন লোকালোকের আসক্তি ও মায়া কাটিয়ে সর্বলোকাতীত বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলিত

হওয়ার চেষ্টা। ভগবানকে পাওয়া এরই নাম। ধর্মজীবনের আরম্ভ তখনই হবে যখন আমাদের মন নিরাসক্ত হবে সব জাগতিক রসাকাঙ্ক্ষায়। তাঁকে জানলেই সব জানা হোল। নতুবা প্রেতলোকের আবিষ্কারের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। দুটোর মধ্যে কোনোটাই আধ্যাত্মিক ঘটনা নয়।”—কথাসাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।

এই চিঠিতে বিভূতিভূষণের যে বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় সেই বিশ্বাসই 'দেবযান' উপন্যাসের মূল ভিত্তি। অবশ্য নিছক বিশ্বাস অবলম্বন করে কোন উপন্যাস রচনা করা সম্ভবপর নয়। বিভূতিভূষণ উপন্যাসের মধ্যে তাঁর বিশ্বাসটিকে স্থাপন করার জন্য সচেষ্ট হন নি ; সে প্রয়াস অবশ্যই রসাভাস ঘটাত। উপন্যাসটির সমগ্র বিষয়বস্তু তিনি একটি সমুচ্চ কল্পনায় গ্রথিত করেছেন। মৃত্যুর পরে আর একটি লোক যে আছে এই কথা স্বতঃসিদ্ধের মতো মেনে নিয়েই পাঠককে অগ্রসর হতে হয়। তিনি যে কাল্পনিকতার আশ্রয় নিয়েছেন তা এমনই নিরন্ধ্র ত্রুটিহীন যে উপন্যাসটির আদ্যোপান্ত কোথাও তাঁর কল্পনার অনুসরণ করতে বাধে না। এটির কারণ অবশ্যই তাঁর সহজাত শিল্পদক্ষতা। এর আগে তিনি 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসের মধ্যে বাস্তব জীবনের সঙ্গে কাল্পনিক জগৎকে মেলাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি সফল হন নি। জিতুর অলৌকিক দর্শন তাকে উপন্যাসে প্রত্যাশিত চরিত্র থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল—তার অসাধারণত্ব প্রায়ই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এখানে বিভূতিভূষণ এমনভাবে কল্পনার স্বচ্ছ বাতাবরণে সমগ্র কাহিনীকে ঢেকে দিয়েছেন যে বাস্তব আর অলৌকিক দুই জগৎই অত্যন্ত সহজে মিশে গেছে। প্রেততত্ত্ব বা মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান পাঠকও বিনা দ্বিধায় উপন্যাসটির রসগ্রহণ করতে পারেন।

অথচ মৃত্যুর পরে আত্মার গতি সম্পর্কে চেতনাই উপন্যাসটির মূল প্রেরণা। বিভূতিভূষণ অবশ্যই কঠোপনিষদের নবতর সংস্করণ রচনায় প্রয়াসী হন নি। সাধারণ মানুষের অনুভূতি অবলম্বন করেই তিনি

ধীরে ধীরে তাঁর কল্পনাটিকে বিকশিত করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। এই গল্পের নায়িকা পুষ্প কতক পরিমাণে আদর্শায়িত হলেও নায়ক যতীন একজন গ্রামবাসী সাধারণ মানুষ—দুঃখদারিদ্র্যে যার কেটেছে। মৃত্যুর পরে আত্মিক লোকে তার অভিজ্ঞতাই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। বিভূতিভূষণ সাধারণ গল্পের মতো কাহিনীবিন্যাস করেছেন আবার বৃহত্তর জীবন-কল্পনা বা ভাবদৃষ্টি উপন্যাসটির মধ্যে অনায়াসে সঞ্চার করেছেন। অতি সাধারণ ভূমি থেকে কল্পনা ক্ষেত্রে আরোহণে সহজ-সিদ্ধি উপন্যাসটিকে ভাব আর শিল্প দু'দিক দিয়েই সমৃদ্ধ করে তুলেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। যতীন 'আত্মা' হিসাবে উচ্চশ্রেণীর নয়। কিন্তু কল্পপর্বতের সঙ্গীত শুনে তার মনেও মহৎ কল্পনার সঞ্চার হয়েছে।—

"শুনতে শুনতে যতীনের মনে হল সে আর পৃথিবীতে বদ্ধ আত্মা নয়—সে উচ্চ অমৃতের অধিকারী দেবতা হয়ে গিয়েচে, সে মুক্ত, সে বিরাট—তার আত্মা সারা বিশ্বকে ব্যেপে সচেতন হতে চায়, তার বিরাট হৃদয়ে সকল পাপীতাপী মূর্খ ও নিন্দুকের স্থান আছে, পতিতের উদ্ধার করতে যুগে যুগে পৃথিবীতে জন্মেচে, তাদের দুঃখে যুগে যুগে করেচে মৃত্যুবরণ। বিশ্বের মহাদেবতার প্রেমিক পার্শ্বচর সে—সে নৃত্যশীল গ্রহনক্ষত্রের বিচিত্র নৃত্যছন্দে লীলাময়, পবিত্র, প্রেমিক, মুক্ত দেবতা। এ কি আনন্দ! একি শিল্পমাধুর্য! একি অননুভূতপূর্ব অমরতা!"

বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসে মানুষের জীবনকে বিশাল সৃষ্টির সঙ্গে সংযুক্তরূপে কল্পনা করেছেন। এই পৃথিবীর মতো অগণিত জগতের কল্পনা, বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে আত্মার উর্ধ্বায়নের ধারণা, আত্মার উন্নতির সহায়ক বিভিন্ন দেবচরিত্রের অবতারণা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালবর্তী এক লীলাময় পুরুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে আভাস—সব কিছুর মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণের কবিদৃষ্টি একটি ধ্যানসমৃদ্ধ চেতনারূপে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসকার হিসাবে তাঁর সব চেয়ে বড়ো কৃতিত্ব

এই যে তিনি কোথাও তত্ত্বকে অতিশায়িত করে তুলে উপন্যাসের কাহিনীগত আকর্ষণকে ক্ষুণ্ণ করেন নি। উপন্যাসটিকে একটি নিছক স্বপ্ন বলে মনে হয় না—ঊর্ধ্বলোকের কল্পনা সত্ত্বেও মাটির পৃথিবীর কথা বিভূতিভূষণ ভুলে যান নি—মানুষের বাসনা-কামনার যে রূপ তিনি এঁকেছেন তা উপন্যাসটির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছে। আশার পতন আর পরিণতির মর্মান্তিক ইতিহাস, সন্তানহারা জননীর করুণ বিলাপ, মৃত্যুর পরেও নিজের হাতে গড়ে তোলা ব্যবসায়ের প্রতি ব্যবসায়ীর আকর্ষণ, স্ত্রীকে খুন করবার পর আত্মগোপনকারী বৃদ্ধের ভয়—প্রত্যেকটি অংশে মানুষের জীবন সম্পর্কে বিভূতিভূষণের সত্যকার চেতনা আর সহানুভূতি ফুটে উঠেছে।

বিশেষত মৃত্যুর পর বাসনা আর অনুতাপের বিষাগ্নিতে দগ্ধ আশার নরকভোগের বর্ণনা অতি গভীর জীবনবোধ আর সমুচ্চ কবি-দৃষ্টির সমন্বয়ের একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে নরকাগ্নিশিখায় শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের যে বর্ণনা আছে তার মধ্যে বাস্তব জীবনচেতনার চেয়ে আদর্শায়নের প্রাবল্য দেখা যায়—রামানন্দ স্বামীর যোগবল বা Psychic force ঐ আদর্শায়নের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ঐ নরকভোগের কাহিনীর শিল্পগত সার্থকতা সম্পর্কেও পাঠকের মনে একটা সন্দেহ জাগে। আশার 'নরক' ভোগের বর্ণনা বিভূতিভূষণের জীবনচেতনা, কবিদৃষ্টি আর শিল্পদক্ষতার অপূর্ব নিদর্শন।

উপন্যাসের মধ্যে যে সমস্ত চরিত্র কল্পিত হয়েছে সেগুলিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। কয়েকটি চরিত্র দেবতা ও বিদেহী; কয়েকটি চরিত্র মানব। গ্রহদেব, পথিক দেবতা, প্রণয় দেবী, করুণা দেবী, প্রভৃতি দেবচরিত্রকে নিছক ছায়াময় কল্পনা বলে মনে হয় না; আদর্শ সত্ত্বেও সেগুলির মধ্যে মানবিক উপাদান কিছু পরিমাণে সঞ্চারিত হয়েছে। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, ক্ষেমদাস, বাল্মীকি প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে মানবিক উপাদান কিছু আছে বটে কিন্তু ভাবকল্পনাই প্রধান

হয়ে উঠেছে। এইসব চরিত্রের মধ্যে আবেগপ্রবণতা থাকায় কোনটিকে নিষ্প্রাণ বলে মনে হয় না। একালের দেহী বিদেহী সব মানব চরিত্রের মধ্যেই মানবোচিত বাসনা-কামনার পরিচয় অল্পবিস্তর পরিমাণে প্রবল হয়ে ওঠায় সে যেন প্রণয় দেবী বা করুণা দেবীর সোদরা স্থানীয়া হয়ে উঠেছে। যতীন আর আশার চরিত্রে মানবসুলভ দুর্বলতা চরিত্র হিসাবে তাদের সজীবতার নিদর্শন। নেত্যনারাণ, বাড়িওয়ালী, আশার মা, রামলাল প্রভৃতি চরিত্রে বিভূতিভূষণ বাস্তব বোধের পরিচর দিয়েছেন। মানুষের চরিত্রগত বিশিষ্টতা, বিশেষত তার দুর্বলতা তিনি যে কতখানি সহানুভূতির সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন এই উপন্যাসে তার জীবন্ত উদাহরণ অজস্র পাওয়া যায়। কথাসাহিত্যের প্রাণ যে জীবনরসবোধ, এ তারই নিদর্শন; তিনি অনেক জায়গায় এমন নিপুণভাবে চরিত্রের কেন্দ্রগত রসটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন যে, বিগত যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক ইংরেজ লেখক চার্লস ডিকেন্সের কথা মনে পড়ে যায়।

'দেবযান' উপন্যাসে অলৌকিক জগতের বর্ণনা করা হয়েছে; মধ্যে মধ্যে আধ্যাত্মিক বিষয়েরও অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু এই উপন্যাসে কোন গালভরা দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করা হয় নি। এই উপন্যাসের যদি কোন বাণী থাকে তা'হলে তা এই মরজগতেরই একটি পরম সত্য। সে সত্যটি এই,—

"আত্মা ওঠে ভালবাসায়। ভালবেসে ভালবাসা পেয়ে।"

ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য এক জগতের বৃত্তান্তকে কাহিনীর মধ্যে স্থান দিলেও মানুষের জীবনগত পরম শক্তি প্রেমকে বিভূতিভূষণ সবচেয়ে বড়ো মর্যাদা দিয়েছেন। কোন সমুচ্চ দার্শনিক চিন্তা বা আদর্শের বদলে তিনি বিশ্বমানবের অন্তর্লীন একটি চিরন্তন মানবধর্মকে জীবনের সার সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। টলস্টয়ের একটি গল্পে দেবদূত মিকায়েল শাপভ্রষ্ট হয়ে মানুষের মধ্যে বাস করে উপলব্ধি করেছিল যে প্রেমই মানুষের জীবনকে ধারণ করে রেখেছে; বিভূতি-

ভূষণ ঐ সত্যকেই একটি নতুন আকার দিতে চেয়েছেন। জীবন কেবল যে প্রেমে বিধৃত তাই নয়, প্রেমই মানুষের ঊর্ধ্বায়ণের অবলম্বন। প্রেম ছাড়া মানুষের সব সাধনাই নিষ্ফল। বিভূতিভূষণের জীবনচেতনায় এটি একটি অসাধারণ উপলব্ধি।

……………………………১১……………………………

কেদার রাজা

'দেবযান' উপন্যাসে কল্পনায় গড়া একটা নতুন জগৎ সৃষ্টি করে তার মধ্যে ভাবমণ্ডিত একটি অপরূপ কাহিনী সৃষ্টি করার পর 'কেদার রাজা' উপন্যাসে কী করে যে একেবারে সাধারণ মানুষের জীবনের কাহিনীতে নেমে এলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। তবে উপন্যাস-টির মধ্যে অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ আছে। দেবী বারাহী অবতীর্ণ হয়ে উপন্যাসের শেষ গ্রন্থিটি ছেদন করেছেন। অবশ্য বিভূতিভূষণ অপ্রাকৃতকে উপন্যাসের প্রত্যক্ষ বর্ণনাগোচর করেন নি; গিরীণের ভয়াবহ মৃত্যুর প্রাকৃত কোন কারণের সম্ভাব্যতার অবকাশ রেখে উপন্যাসটির বাস্তবতা অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়াসী হয়েছেন। তা সত্ত্বেও অলৌকিক ঘটনার আভাস উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে সুস্পষ্ট। বিশেষত প্রায় নাস্তিক কেদার রাজা যেভাবে দেবীকে উদ্দেশ করে স্বগতোক্তি করেছেন তাতে ঘটনার অলৌকিকত্ব সম্পর্কে পাঠক প্রায় নিঃসন্দেহ হন।

কেদার রাজা যশোর জিলার গড়শিবপুরের জমিদার। তাঁর পূর্ব-পুরুষ এককালে 'রাজা' অভিধায় ভূষিত ছিলেন—বংশানুক্রমে কেদার ও ঐ উপাধি পেয়েছেন। কিন্তু প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাংশ আর ঐতিহ্য ছাড়া তাঁর আর অন্য সম্পত্তি নেই। তাঁর আত্মীয় বলতে বিধবা কন্যা শরৎ।

কেদার রাজা চরিত্র হিসাবে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। পুরুষোচিত সম্ভ্রম-বোধ, আত্মভোলা ভাব আর উদারতার সঙ্গে একটা নিভাঁজ সরলতা মিশে তাঁকে অসামান্য করে তুলেছে। সরলতা বা বিশ্বাসপ্রবণতা তাঁর স্বভাবগত হওয়ায় তিনি বারবার প্রতারিত হয়েছেন। শরৎও প্রায় অনুরূপ সরল, কিন্তু কেদারের তুলনায় তার বাস্তববোধ কিছুটা প্রবল। বিশেষত তার মধ্যে একটা সহজাত সাহস আর তেজস্বিতা ছিল। সেজন্য অল্প বয়সে বিধবা সুন্দরী গ্রামবালিকা হয়েও সে সহজে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। গড়শিবপুরের একটি বর্ণনা,—

"শরৎ মন্দিরের মেঝেতে মাটির পিলসুজ বসানো প্রদীপটা জ্বালাতে জ্বালাতে আপন মনে বকতে লাগলো—দোগেছের শ্মশান তোমাদের ভুলে রয়েচে? মুখপোড়া বাঁদরের দল—বাড়ীতে মা বোন নেই।...

শরৎ এ সবে ভয় খায় না, ভয় খেতে গেলে তার চলেও না। দরিদ্রের ঘরে সুন্দরী হয়ে যখন জন্মেছে তখন এ রকম উপদ্রব সহ্য করতে হবে সে জানে। বাবার তো এ সব জ্ঞান নেই, সেই যে বেরিয়েচেন কখন তিনি ফিরবেন তার ঠিকানা আছে? একাই এই নিবান্ধা পুরীর মধ্যে যখন তখন ভয় করে কি হবে? আসুক না কার সাহস, বঁটি নেই ঘরে? বঁটি দিয়ে যদি নাক কেটে দুখানা করে না দিই তবে আমি—পাজি, বদমাইস কোথাকার।"

এই সাহস আর তেজস্বিতার জন্যই শরৎ কলকাতায় প্রভাস আর গিরীণদের ষড়যন্ত্র এড়িয়ে নিজেকে রক্ষা করার জন্য অকূলে ঝাঁপ দিতে পেরেছিল। এই তেজস্বিতার উৎস অবশ্য তার সারা সত্তার সঙ্গে জড়িত ধর্মবোধ। গড়শিবপুরের ভগ্নপ্রাসাদে ঐ ধর্মবোধ তিল তিল করে তার চরিত্রকে গড়ে তুলেছিল; ঐ ধর্মবোধ যে তাকে কতখানি শক্তি দিয়েছিল, শরৎ যেভাবে হেনাবিবির বাড়ি থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে বা পরবর্তীকালে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করতে প্রয়াসী হয়েছে—সেই সব ঘটনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়।

তবলাকুশলী বৃদ্ধ গোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রটিও আকর্ষণীয়। গ্রাম্য মাতব্বর জগন্নাথ চাটুজ্জের চরিত্র বিভূতিভূষণের বাস্তব বোধের পরিচায়ক। শরতের গ্রাম্য সঙ্গিনী রাজলক্ষ্মী, কাশীর সঙ্গিনী অন্ধ বধূ রেণুকা, মিনু, মিনুর মা, মিনুর কাকীমা প্রভৃতি চরিত্র শরতের জীবনের বিভিন্ন আশাকে পরিস্ফুট করে তুলেছে। চরিত্রগুলি মোটামুটিভাবে সুচিত্রিত।

প্রভাস, অরুণ বা গিরীণের চরিত্র বাস্তবানুগ হলেও নিষ্প্রাণ। হেনাবিবি বা কমলার চরিত্র কল্পনানির্ভর বলে স্পষ্টই বোঝা যায়। নাগরিক পাপচরিত্র অঙ্কনে বিভূতিভূষণের বিমুখতা ছিল। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

'কেদার রাজা'র কাহিনীর মধ্যে প্রকৃত কোন জটিলতা নেই। কেদার আর শরৎকে প্রভাস আর তার সঙ্গীরা নিতান্ত অনায়াসে প্রতারণা করেছে আবার একান্ত আকস্মিকভাবে তাদের সব বিপদ দূর হয়েছে। হেনাবিবির বাড়ি থেকে পালাবার পর শরৎকে এক অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের সম্মুখীন হতে হয়েছে বটে, কিন্তু প্রভাসের কলুষময় সঙ্গ থেকে মুক্তি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মেঘ কেটে আসছে বলে মনে হয়। শরতের কাশীযাত্রা আর গোপেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কেন জানি না, রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'র কমলা আর খুড়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রভাসরা কেদার আর শরৎকে যেভাবে প্রতারণা করেছে তা মাঝে মাঝে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। উপন্যাসের একেবারে শেষে গিরীণের ভয়াবহ মৃত্যুতে অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ থাকায় কাহিনীটি একটি নতুন রসে সঞ্চারিত হয়েছে এই মাত্র। তা না হলে কাহিনীর কল্পনা বা রূপায়ণে বিশেষ শিল্পকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

'কেদার রাজা'র প্রধান আকর্ষণ চরিত্র আর ঘটনার চিত্রণে। উপন্যাসে চরিত্রের সংখ্যা খুব বেশি নয়, কিন্তু প্রত্যেকটিকে আমাদের খুবই পরিচিত বলে মনে হয়। বিশেষত মাঝে মাঝে দৈনন্দিন জীবনের

ছবির মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ যে ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তা বিশেষ উপভোগ্য। উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ সম্ভবত এই ঘরোয়া ছবিগুলি। কেদার রাজার আত্মভোলা ভাব আর শরতের স্নেহ-মণ্ডিত শাসন, কেদার-গোপেশ্বরের প্রসঙ্গ, শরৎ আর রাজলক্ষ্মীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও সহমর্মিতা, পরিবেশের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হেনাবিবির বাসায় হেনাবিবি আর কমলার সঙ্গে আলাপ, মিন্নুর সঙ্গে স্নেহ-সম্পর্ক, বিশেষ করে কাশীতে অন্ধ রেণুকার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা—এই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা বিভূতিভূষণের যে গুণটির পরিচয় দেয় তা নিছক শিল্পদক্ষতা নয়, এর মধ্যে তাঁর জীবনরসবোধ অনুস্যূত হয়ে আছে। তাঁর গল্প-উপন্যাসের মধ্যে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতার সার্থক নিদর্শন সুপ্রচুর। একান্ত সাধারণ বিষয়ও অন্তরঙ্গ আলাপের মধ্য দিয়ে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন কোন উপন্যাসে এই গুণটি লক্ষ্য করা যায়। এই অংশগুলি যেমন জীবন-রসের স্বাদ পাওয়ার বাসনার নিদর্শন, তেমনই বিভূতিভূষণের পরিপূর্ণ জীবনচেতনারও পরিচায়ক। জীবনের পরিপূর্ণ রূপ সম্পর্কে একটা অখণ্ড বোধ মর্মগত হওয়ায় তিনি আপাতদৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ বিষয়কেও উপেক্ষা করেন নি, জীবনের সমগ্র পরিচয় দিতে হলে সাধারণ বিষয়কেও যথাযোগ্য স্থান দিতে হয়। এইজন্য উপন্যাসটি অনুরাগী পাঠকের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হবে সন্দেহ নেই।

১২

অথৈ জল

'অথৈ জল' উপন্যাসটি বিভূতিভূষণের অন্য উপন্যাস থেকে একেবারে স্বতন্ত্র ধরনের বলে মনে হয়। তাঁর গল্প-উপন্যাসে নর-নারীর প্রেমের কাহিনী আছে বটে কিন্তু দেহের দুরন্ত সাধকে তিনি কোথাও

প্রাধান্য দেন নি। তাঁর রচনায় প্রেমের শান্ত-স্নিগ্ধ রূপ স্থান পেয়েছে —তাঁর রচনার আলোচকদের এই মন্তব্য যথার্থ। কিন্তু প্রেমকে তিনি যে একটি বিমূর্ত ভাবাবেগরূপে কল্পনা করে তৃপ্ত ছিলেন এমন নয়। তাঁর কবিপ্রকৃতি অবশ্য নারীর কল্যাণ-মূর্তির প্রতি আন্তরিক পক্ষপাত দেখিয়েছে; নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে যে দেহজ আকর্ষণ আছে তাকে তিনি সাধারণত গল্পের উপজীব্য বিষয় করতে চান নি। তাঁর সমকালীন কোন কোন লেখকের মতো তিনি ইন্দ্রিয়জ আসক্তি বা স্থূল সম্ভোগকে বর্ণনীয় বিষয় করেন নি, বরং তাঁর সুষমাবোধ তাঁকে শিল্পের নামে অশ্লীল বস্তুকে কথাসাহিত্যের উপাদান করার আগ্রহ থেকে নিবৃত্ত করেছিল।

কিন্তু বিভূতিভূষণের কল্পনা যে কেবল পুতু পুতু প্রেমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—প্রেমের সর্বনাশা আকর্ষণী শক্তির কথা যে তাঁর অজানা ছিল না, 'অথৈ জল' উপন্যাস তার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। তিনি অন্য কোন উপন্যাস বা ছোটগল্পে অবৈধ প্রেমের কিছু কিছু পরিচয় দিয়েছেন। এখানে সমাজনিন্দিত প্রেমই কাহিনীর অবলম্বন।

'অথৈ জল' নামটির মধ্যেই কাহিনীর ভাবগত সংকেত আছে। গল্পের নায়ক প্রথমে হাঁটু জলে মাতামাতি করছিল—অবশেষে এক দুর্বার টানে অথৈ জলে গিয়ে পড়েছে। ঐ দুর্বার টান আর কিছুই নয়, নারীর প্রেম অথবা নারীর প্রতি সুতীব্র আসক্তি।

গল্পের নায়ক শশাঙ্কই কাহিনীর বক্তা। সে পল্লীগ্রামের একজন যুবক চিকিৎসক মাত্র নয়, সে গ্রামের একজন নতুন মোড়ল। ডাক্তার হিসাবে তার প্রতিপত্তি যথেষ্ট, গ্রাম্য বিবাদ-বিসংবাদে সে মাতব্বরি করে। তার দাপটে গ্রামের সাধারণ লোকেরা তটস্থ। কাহিনীর সূত্রপাতেই সে রামপ্রসাদ নামে একটি গ্রাম্য যুবককে সর্বসমক্ষে লাঞ্ছিত করেছে, তার কারণ শান্তি নামে ঐ গ্রামেরই একটি মেয়ের সঙ্গে তার অবৈধ প্রেম। নায়কের শাসন-ব্যবস্থায় অবশ্য সুফল হয়েছে

কি না বলা কঠিন, কারণ রামপ্রসাদ শান্তিকে নিয়ে গোপনে গ্রাম ত্যাগ করেছে।

গ্রামের মধ্যে মাতব্বরি করা নায়ক শশাঙ্কর মজ্জাগত হয়ে গেছে —অবশ্য সে এটিকে আদর্শরূপেই গ্রহণ করেছে। তার নিজের উক্তি —'গ্রামে থেকে গ্রামের উন্নতি করবো—এ ইচ্ছাটা আমার চিরকাল আছে ছাত্রজীবন থেকেই। গ্রামের লোকের ভালো করবো এই দাঁড়ালো বাতিক। এর জন্যে যে কত খেটেছি, কত মিটিং করে লোককে বুঝিয়েছি, পল্লীমঙ্গল সমিতি স্থাপন করেছি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়েছি। গাঁয়ে গাঁয়ে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছি।' বিশেষত 'দুর্নীতির উপর আমি হাড়ে হাড়ে চটা'।

এই নীতিবাগীশ সমাজশাসক অবশেষে একদিন নিজেই 'দুর্নীতির' ধ্বজাধারী হয়েছে। দূরের একটি গ্রামে বারোয়ারিতলায় খেমটার আসরে সে একটি খেমটাওয়ালী কিশোরীকে দেখে মজেছে। ঐ মেয়েটির আকর্ষণ যে ধীরে ধীরে কী রকম প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে বিভূতি-ভূষণ তার নিপুণ চিত্র এঁকেছেন। প্রেম বা মোহ যাই বলা যাক না কেন, নায়ক শশাঙ্ক ধীরে ধীরে এক অনাস্বাদিতপূর্ব ভাবে আবিষ্ট হয়েছে। শেষপর্যন্ত সে সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা হয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের কথা ভুলে গিয়ে কলকাতায় বাসা ভাড়া করে ঐ খেমটাওয়ালী মেয়েটির সঙ্গে থেকেছে, মেয়েটির সঙ্গে তল্পিদার সেজে বিভিন্ন আসরে যেতেও কুণ্ঠা বোধ করে নি। নীতিবাগীশ শশাঙ্কর আত্মগরিমা যত প্রবল ছিল, তার পতন তত অভাবিত আর প্রচণ্ড হয়েছে।

পান্না—ঐ খেমটাওয়ালী কিশোরী মেয়েটির চরিত্রও আশ্চর্য। সে যে পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত, নৈতিক মানদণ্ড সেখানে কঠোর নয়। কিন্তু তার চরিত্রে শিথিলতার পরিচয় পাওয়া যায় না। একথা সত্য যে, সে তার রূপ আর মোহময় আবেশ দিয়ে শশাঙ্ককে ভুলিয়েছে। কিন্তু সে শশাঙ্ককে ঠকাতে চায় নি ; জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত শশাঙ্ককে হাতে রেখে আর্থিক সমৃদ্ধির প্রয়াস সে করে নি। শশাঙ্ক

যেমন তার জন্য সব কিছু ফেলে এসেছে, তেমনই সেও শশাঙ্কর জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে কোনো দ্বিধা বোধ করে নি। অবশ্য শশাঙ্ক তার পারিবারিক আর সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত হয়েছে; পান্না সেভাবে তার জীবনের অভ্যস্ত রীতি থেকে বিচ্যুত হয় নি। শশাঙ্ককে সঙ্গে নিয়েই সে মুজরোয় বেরিয়েছে। জীবনযাত্রার সাধারণ উপকরণ সম্পর্কে সে উদাসীন। শশাঙ্কর প্রতি তার আকর্ষণ প্রেম না মোহ সে কথা বলা যায় না, কিন্তু তা যে আন্তরিক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসের ধারায় 'অথৈ জল' উপন্যাসটি কিছুটা অপ্রত্যাশিত বলে মনে হবে। বিভূতিভূষণ কয়েকটি উপন্যাসে সাধারণ বাসনা-কামনায় জড়িত মানুষের ছবি এঁকেছেন; সেগুলির মধ্যে তাঁর জীবন-রসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। রূপজ আকর্ষণের এই কাহিনীতে স্বচ্ছন্দভাবে বহমান জীবনরসের পরিচয় নেই। জীবনের একটি অভাবিত রূপ এখানে প্রকাশিত—'পথের পাঁচালী' থেকে 'ইছামতী' পর্যন্ত উপন্যাসের একটি ধারায় অভাবনীয়ের যে ধ্রুপদী পরিচয়ের অভিব্যঞ্জনা, তার একেবারে বিপরীত প্রান্তবর্তী বিচিত্র জীবনরূপের অপূর্ব আস্বাদ পরিবেশন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। তাঁর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই। এখানে শিল্পদক্ষতার নিদর্শনও কিছুটা পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর কবিদৃষ্টির পূর্ণতার পরিচয় এখানে মেলে না। তিনি রূপজ প্রেমের 'সর্বনাশা টানের যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু বৃহত্তর জীবনদৃষ্টির সঙ্গে তাঁকে অন্বিত করেন নি। কাহিনীটি যেন অর্ধপথে সমাপ্ত বলে মনে হয়। ঐ মোহের পরিণাম উপন্যাসটির মধ্যে নেই, মোহিনী মায়ার দুর্বার শক্তির পরিচয় দেওয়াই উপন্যাসটির লক্ষ্য বলে মনে হয়। ঐ তীব্র মোহাবেশের ছবি বিভূতিভূষণ অবলীলাক্রমে এঁকেছেন; কিন্তু এত সহজে তিনি শশাঙ্কর জ্ঞানহারা আচরণের বর্ণনা দিয়েছেন যে, মাঝে মাঝে তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

এই উপন্যাসের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য চরিত্র পল্লীকবি ঝড়ু মল্লিক। ঝড়ু মল্লিক অবশ্য প্রতিভাবান মার্জিত রুচির কবি নন, কিন্তু একজন যথার্থ আত্মভোলা মানুষ। ঝড়ু মল্লিক মদ্যপায়ী— জগৎটাকেই তিনি যেন 'নেশার নয়নে' দেখেন। কবিতা রচনাও তাঁর একটা নেশা। এই চরিত্রটি সম্ভবত বিভূতিভূষণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল।—কয়েকটি গ্রাম্য চরিত্র চিত্রণেও তাঁর বাস্তব বোধের পরিচয় পওয়া যায়।

১৩

ইছামতী

বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরবৎসরই যখন তাঁর 'ইছামতী' উপন্যাসটিকে রবীন্দ্র-পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল তখন কোন কোন মহলে শোনা গিয়েছিল যে, এই গ্রন্থখানি ঐ পুরস্কার লাভের যোগ্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে বিভূতিভূষণের সাহিত্য-প্রতিভা বা সাধনার কথা স্মরণ করলে এই পুরস্কার যে যোগ্য ব্যক্তিকেই দেওয়া হয়েছে এ কথা সকলেই স্বীকার করেছিলেন।

'পথের পাঁচালী''অপরাজিত' উপন্যাসযুগ্মক বা 'আরণ্যক'ই সম্ভবত বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কিন্তু 'ইছামতী'র মূল্যও নিতান্ত কম বলে মনে হয় না। বিভূতিভূষণের কবিদৃষ্টি এখানে পরিণত আকারে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যে তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রকৃতিপ্রেমিক বলে সুপরিচিত, প্রকৃতির সৌন্দর্য থেকে তাঁর কবিচিত্ত রস আহরণ করেছে। দ্বিতীয়ত, তিনি মানুষের জীবন সম্পর্কে বিশেষ উৎসুক ছিলেন—মানুষের হৃদয়ের বিচিত্র পরিচয় তিনি অত্যন্ত সহজে তাঁর সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। তৃতীয়ত, তাঁর কোন কোন ছোটগল্পে বা উপন্যাসে মাঝে মাঝে আধ্যাত্মিক আকুতির

পরিচয় পাওয়া যায়। 'ইছামতী' উপন্যাসে এই ত্রিধারা সংযুক্ত হয়েছে। জীবনদৃষ্টির এতখানি পরিপূর্ণ পরিচয় বিভূতিভূষণের অন্য কোন উপন্যাসে ব্যক্ত হয় নি।

'ইছামতী' উপন্যাসে প্রকাশকের নিবেদন থেকে জানা যায় যে, বিভূতিভূষণের ইচ্ছা ছিল যে তিনি "ইছামতীর দুই তীরের শান্ত পল্লীজীবনের পটভূমিকায় নীলকরদের আমল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রায় একশত বৎসর ব্যাপী কালের চিত্র অঙ্কিত করিবেন, পল্লীবাসীদের ছোটোখাটো সুখদুঃখের মধ্যে যুগ পরিবর্তনের একটা বিরাট ইতিহাসকে ধরিয়া রাখিবেন এই ছিল তাঁর কল্পনা।" ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ খেলাৎ ঘোষের জমিদারির অন্তর্গত কমলাকুণ্ডুর কলবলিয়াতে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে করতে তিনি ইছামতীর কথা স্মরণ করেছেন। ঐ দিনের দিনলিপিতে তিনি লিখেছেন যে, ইছামতীর তীরের প্রকৃতি আর মানুষদের নিয়ে তিনি গল্প লিখবেন, নাম দেবেন ইছামতী।—এই উপন্যাসের শুরুতেও তিনি সাধারণ মানুষের 'কত সুখ-দুঃখের অলিখিত ইতিহাস, লিখতে চেয়েছেন—উপলব্ধি করেছেন, 'সেই সব বাণী, সেই সব ইতিহাস আমাদের আসল জাতীয় ইতিহাস। মূক জনগণের ইতিহাস, রাজারাজড়াদের বিজয় কাহিনীর নয়।'

এই উপন্যাসের নায়ক রূপে স্থাপনা করা হয়েছে ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁকে অবশ্য মূক জনগণের প্রতিভূ বলা যায় না, এমন কি চলমান ইতিহাসের সচেতন সাক্ষী বলাও সঙ্গত নয়। তাঁকে অবলম্বন করে উপন্যাসের মধ্যে বিভূতিভূষণের আধ্যাত্মিক ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। পরিবর্তমানকালের প্রতীক নালু পাল। কাহিনীর সূত্রপাতে সে নীলকুঠির সাহেব শিপটন সাহেবকে দেখে ভয়ে পানের মোট ফেলে মাঠে গিয়ে লুকিয়েছে। 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ' একালে এই সত্যটি প্রমাণ করে সে বড়মানুষ হয়ে শেষে নীলকুঠি কিনেছে। দুর্দান্ত নীলকর শিপটন আর তার চৌখস

দেওয়ান রাজারামের বদলে নালু পালের মতো ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠা বিভূতিভূষণের ইতিহাসচেতনার একটি অমোঘ স্বাক্ষর। অবশ্য সচেতনভাবে ইতিহাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করার প্রযত্ন তাঁর ছিল কিনা বলা কঠিন। তিনি মানুষের জীবনের ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন; কালের রূপ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাহিনীতে ফুটে উঠেছে।

তিনি যে 'মূক জনগণের ইতিহাস' লিখতে চেয়েছিলেন তার পরিচয় এই উপন্যাসের ছোটো-বড়ো অনেক চরিত্রের মধ্যে পাওয়া যাবে। নফর মুচি, আমীন প্রসন্ন চক্রবর্তী, গয়া মেম, বরদা বাগদিনী, হলা পেকে, তিনকড়ি কাওরা, রামু লেঠেল, হজরৎ নিকিরি, ফণি চক্কত্তি, চন্দ্র চাটুজ্জ্যে, রূপচাঁদ মুখুজ্জে, নীলমণি সমাদ্দার, হরকালী সুর—এই সব সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ বাসনা-কামনার ছবি 'ইছামতীর' মধ্যে ফুটে উঠেছে। এরা প্রতীক চরিত্র নয়—এদের মধ্যে সেকালের গ্রামজীবনের ছাপ অবশ্যই আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি আছে তাদের স্বকীয়তার পরিচয়। এদের ঝাঁপসা বলে মনে হয় না। বিভূতিভূষণ এদের একেবারে জীবন্ত করে তাঁর উপন্যাসের মধ্যে তুলে ধরেছেন।

এদের মধ্যে নীলকুঠির প্রসন্ন আমীনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রবীণ বয়সে সে নীলকুঠির বড়ো সাহেব শিপটনের উপপত্নী গয়া বাগদিনী ওরফে গয়া মেমের প্রেমে পড়েছে। বিভূতিভূষণ 'ন্যাচারালিস্ট' লেখকদের পন্থানুসরণ করে এই প্রেমকে উৎকট করে তোলেন নি, তাঁর সহজাত শালীনতাবোধের ফলে প্রৌঢ় আমীনের প্রেমের বর্ণনা শোভনতার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকলেও আকর্ষণীয় হয়েছে। গয়া মেমকে প্রথমটা যেন রহস্যময়ী বলে মনে হয়। শিপটন সাহেবের প্রতি তার আনুগত্যের যে ছবি বিভূতিভূষণ এঁকেছেন তা তার মতো স্তরের মেয়ের পক্ষে অভাবনীয়। 'খুড়োমশাই' নামে সম্বোধন করে সে প্রসন্ন আমীনকে কেন যে প্রশ্রয় দিয়েছে তা প্রথমটা বোঝা কঠিন। মনে হয় তার স্নেহবঞ্চিত হৃদয়

একটা আশ্রয় খুঁজছিল। নীলকুঠির বড়ো সাহেব শিপটন, ছোটো সাহেব ডেভিড বা দেওয়ান রাজারাম রায় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের অনুরূপ চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়।

রামকানাই কবিরাজ একটি আশ্চর্য চরিত্র। মিথ্যা সাখ্য দিতে রাজি না হওয়ার জন্য তাঁকে ছোটো সাহেব ডেভিডের হাতে কঠোর নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। তবুও তিনি সত্যভ্রষ্ট হন নি। তাঁর সহজাত সত্যনিষ্ঠা, সরলতা আর আধ্যাত্মিক ঔৎসুক্য মনে ছাপ রেখে দেয়। ভবানীকে তিনি প্রশ্ন করেছেন,—

"আচ্ছা, একটু আদি-সংবাদ শোনাবেন? ভগবান কি রকম? তাঁকে দেখা যায়? আপনারে বলি। এই ঘরে একলা রাত্তিরি অন্ধকারে বসে বসে ভাবি, ভগবানডা কেডা? উত্তর কেডা দেবেন বলুন। আপনি একটু বলুন।"

ভবানী যখন তাঁকে উপনিষদের মন্ত্র শুনিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন, তখনকার বর্ণনা স্মরণীয়।—

"রামকানাই চিঁড়ের বাটিটা ঠেলে একপাশে সরিয়ে রেখেচেন, তাঁর ডান হাতে তখনো একটা আধখাওয়া কাঁচা লঙ্কা, মুখে বোকার মত দৃষ্টি, চোখ দিয়ে জল পড়চে। ছবির মত দেখাচ্ছে সমস্তটা মিলে। ভবানী বাঁড়ুজ্জে বিস্মিত হলেন ওঁর জলেভরা টসটসে চোখের দিকে তাকিয়ে।

খালের ওপারে বাবলা গাছের মাথায় সপ্তমীর চাঁদ উঠেচে পরিষ্কার আকাশে। হুতুমপ্যাঁচা ডাকচে নলবনের অড়ালে।"

এই চরিত্রটির মূলে সম্ভবত বিভূতিভূষণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর প্রপিতামহ কবিরাজি করতেন; তাঁর সম্পর্কে কোন কাহিনী তিনি শুনেছিলেন কি? 'উর্মিমুখর' দিনলিপিতে যে একজন কবিরাজের উল্লেখ আছে তিনি এই চরিত্র কল্পনার মূল হতে পারেন।—

"এই কবিরাজটি বড় অদ্ভুত মানুষ। বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হবে, কিন্তু সদানন্দ, মুক্তপ্রাণ লোক। কোন দেশ থেকে এদেশে এসেচে

কেউ জানে না। বিশেষ কিছু হয় না এই অজ পাড়াগাঁয়ে। তবুও আছে, বলে, এদেশের ওপর মায়া বসে গিয়েচে।"

উপন্যাসের নায়ক পদবাচ্য ভবানী বাঁড়ুজ্যে প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসে বিবৃত কাহিনীর সাক্ষী। তিন পত্নী আর খোকাকে নিয়ে তাঁর ঘরোয়া জীবনের বর্ণনা মনোজ্ঞ। ভবানী পরিব্রাজকের জীবন থেকে ফিরে সংসারী হয়েছেন। তাঁর অন্তরে আধ্যাত্মিক পিপাসা—উপনিষদ আর ভাগবতের আদর্শে তাঁর কল্পনা সঞ্জীবিত। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিভূতি-ভূষণের নিজের অধ্যাত্ম ভাবনাও অনুস্যূত হয়েছে। 'পথের পাঁচালী'র মধ্যে যে প্রকৃতিপ্রেমের উদ্ভব, 'ইছামতী'তে অধ্যাত্মপ্রেমে তারই পরিণতি। বিভূতিভূষণ ভক্তিবাদীর লীলাতত্ত্বকে তাঁর প্রকৃতিপ্রেম বা ব্যাপকতর অর্থে জীবনপ্রেমের সঙ্গে মিশিয়ে গ্রহণ করেছেন। বিশেষত শিশুর মধ্য দিয়ে ভগবৎ প্রেমের উপলব্ধির কল্পনাটি এখানে একটি বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভবানী তার শিশু-সন্তানের মধ্য দিয়ে ভগবানের সৌন্দর্য আর প্রেমের আভাস পেয়েছেন। তবে অপুর মতোই ভবানী লেখকের ভাব প্রকাশের মাধ্যম মাত্র নয়। অপুর জীবনচাঞ্চল্য অবশ্যই ভবানীর মধ্যে নেই, কিন্তু প্রচলিত জীবনাদর্শ আর জীবনপ্রেম তাঁর মধ্যে বিভূতিভূষণের কল্পনা বা ভাবনার পরিণতির পরিচয় সুস্পষ্ট করে তুলেছে। বিশেষত ভবানীর পারি-বারিক জীবনের সরল মধুর বাতাবরণ, গ্রামের বিভিন্ন নর-নারীর সঙ্গে তাঁর সহজ সম্পর্ক আর কল্পনার সজীবতা তাঁকে চরিত্র হিসাবেও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

তিলু বিলু নীলু—তিন বোনের প্রাণ যেন এক সুরে বাঁধা। যে আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ একালের বৈশিষ্ট্য—এই চরিত্র তিনটির মধ্যে তা আদৌ নেই। বিলু মধ্যে মধ্যে তিলুর প্রতি ভবানীর পক্ষপাতের জন্য অনু-যোগ করেছে বটে কিন্তু তিন বোনের মধ্যে একবারও মনান্তর বা মতান্তর দেখা যায় নি। বিলুর চরিত্রকল্পনায় বিভূতিভূষণের আদর্শবাদের প্রভাব আছে। অন্য সব নারীচরিত্রের মধ্যে গ্রামজীবনের সুরু

শোনা যায়। সেগুলির মধ্যেও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায় না—সকলেই পরিবার-কেন্দ্রিক গ্রাম্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয়। কেবল সাহসিকা নিস্তারিণী এর ব্যতিক্রম। 'তেরের পালুনি'—এই গ্রাম্য উৎসবের যে বর্ণনা বিভূতিভূষণ দিয়েছেন তা মনোহারী।

বাস্তবিকপক্ষে গ্রাম্যজীবনের যে বর্ণনা 'ইছামতী'র মধ্যে আদ্যন্ত বিস্তীর্ণ সেইটাই উপন্যাসটির মনোহারিত্বের একটা বড়ো কারণ। সম্ভবত গ্রাম্য জীবনের জীবন্ত রূপ ফুটিয়ে তোলাই এই উপন্যাসের সার্থকতা। এই উপন্যাসে যে আধ্যাত্মিক ভাবকল্পনা আছে তা উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। উপন্যাসের মধ্যে যে কালান্তরের ছাপ আছে তাকে মুখ্য স্থান দেওয়ার অভিপ্রায়ও বিভূতিভূষণের ছিল না—ইতিহাস-রস এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ নয়। তিনি 'মূক জনগণের ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছিলেন। ঐ ইতিহাস উত্থান-পতনের কাহিনী নয়। পল্লীর সাধারণ মানুষের ছোট-বড়ো সুখ-দুঃখের ছবি ফুটিয়ে তোলার বাসনাই তাঁর অন্তরে প্রবল হয়ে উঠেছিল। 'পথের পাঁচালী'তে পল্লীর প্রকৃতিই মুখ্য ছিল, 'ইছামতী'তে পল্লীর মানুষই বিভূতিভূষণের মন বেশি করে কেড়ে নিয়েছে। ঘরোয়া জীবনের সত্যকার রূপ তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। রাজ্য ভাঙ্গা-গড়ার মূল্য আছে ; অধ্যাত্মপিপাসা জীবনকে ঊর্ধ্বমুখী করে তোলে। কিন্তু সেগুলো জীবনের খণ্ডাংশ। মানুষের প্রাণ যেখানে প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার মধ্য থেকে রস আহরণ করে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, সেখানেই তার সত্য পরিচয়। এইখানেই বিভূতি-ভূষণের জীবনরসিকতা সার্থক হয়ে উঠেছে। শিল্পগত সৌন্দর্যের দিক থেকে বিচার করলে 'ইছামতী'র মধ্যে ত্রুটির সন্ধান পাওয়া যাবে, কিন্তু একটি পরিণত জীবনচেতনা উপন্যাসটির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছে। বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে বিবেচিত না হলেও 'ইছামতী' যে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের একটি স্থায়ী সম্পদ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিভূতিভূষণের অকাল-মৃত্যুতে তাঁর তিন খণ্ডে

একটি 'এপিক' রচনা করার বাসনা খণ্ডিত না হলে হয়তো আমরা একটি অসামান্য 'ত্রয়ী' উপন্যাস পেতাম।

······························১৪······························

অশনি-সংকেত

প্রকাশকালের দিক থেকে 'অশনি-সংকেত' বিভূতিভূষণের শেষ-তম উপন্যাস। বিভূতিভূষণের মৃত্যুর প্রায় ন'বছর পরে এটি প্রকাশিত হয়। অবশ্য লেখার কাল অনুসারে এটি তাঁর শেষ উপন্যাস নয়। 'অশনি-সংকেত' বিভূতিভূষণের মৃত্যুর ছ'-সাত বছর আগেকার লেখা। এটি মাতৃভূমি পত্রিকায় ১৩৫০ সালের মাঘ থেকে ১৩৫২ সালের মাঘ মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল—এর দু'এক মাস পরে 'মাতৃভূমি' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এই উপন্যাসের কোন কোন অংশ 'দেবযান' না হলেও 'কেদার রাজা'র সমকালীন—'অথৈ জল' আর 'ইছামতী' নিঃসন্দেহে এই উপন্যাসের পরবর্তীকালের রচনা। পরে প্রকাশিত হওয়ার জন্য এই উপন্যাসের আলোচনা সব শেষে করা হল।

এই উপন্যাসটি 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ার পর বছর পাঁচেক জীবিত থাকলেও বিভূতিভূষণ কেন যে এই উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নি বোঝা যায় না। ঐ সময় লেখক হিসাবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, সুতরাং প্রকাশকের অভাব নিশ্চয়ই হত না। 'মাতৃভূমি' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে পারেন নি এ অনুমানও সঙ্গত নয়, একটু চেষ্টা করলে পাণ্ডুলিপি তৈরি করা কঠিন হত কি? হয়তো বা এই উপন্যাস সম্পর্কে বিভূতিভূষণ নিজেই কিছুটা উদাসীন ছিলেন—এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা প্রতিকূল মনোভাব তাঁর মনে জেগেছিল। কিংবা অনুরূপ বিষয় নিয়ে লেখা

অগুনতি গল্প-উপন্যাস সে সময় বইয়ের বাজার ছেয়ে ফেলায় তাঁর সাহিত্যরুচি বিষয়টির প্রতি কিছুটা বিতৃষ্ণ হয়েছে।

এই উপন্যাসটির 'গ্রন্থ-পরিচয়' অংশে সনৎকুমার গুপ্ত বলেছেন,—

"এই উপন্যাসে বাঙলা দেশের গ্রামাঞ্চলের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের অবস্থা, বিশেষ করে অকৃষিজীবীদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা গ্রন্থকার ফুটিয়ে তুলেছেন। যা একমাত্র বিভূতিভূষণের পক্ষেই সম্ভব। অনাহারে খিদের তাড়নায় কুলবধূ কিভাবে সামান্য চাল পাবার আশায় সতীধর্ম বিসর্জন দিয়েছে তার জ্বলন্ত দৃশ্য দেখা যায় ক্ষুৎ-পীড়িতের উক্তির মধ্যে দিয়ে।

তোমার মুখের দিকে চেয়ে এতদিন কোনো জবাব দিই নি। আর পারিনে না খেয়ে—না খেয়েই যদি মলাম, তবে কিসের কি? আমি কোনো কথা শুনবো না—চলি বামুন-দিদি, পাপ হয় নরকে পচে মরবো সেও ভালো।"—পৃ. ১১৬।

গ্রন্থ-পরিচয়ে যে বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে তা থেকে আমরা বিভূতিভূষণের কালচেতনা বা পঞ্চাশের মন্বন্তরের কবলে বিপর্যস্ত অগণিত মানুষের জন্য সহানুভূতির পরিচয় পাই। ঐ মন্বন্তর বহু সাহিত্যিকের সমবেদনা জাগ্রত করেছে—কয়েকটি ভালো গল্প-উপন্যাসও ঐ সময় পেয়েছি। কিন্তু কালক্রমে মন্বন্তর নিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখা যেন একটা ফ্যাশান হয়ে উঠেছিল। বিভূতিভূষণের পক্ষে ঐ নিষ্প্রাণ ফ্যাশানের প্রতি বিমুখতা সম্ভব। সেজন্য তিনি উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহশীল হন নি বলে মনে হয়।

'অশনি-সংকেত' উপন্যাসে মন্বন্তরের পুরো ছবি নেই, তবে তার পূর্বভূমিকা আছে। যুদ্ধের ফলে চাল, আটা-ময়দা-সুজি, চিনি, কেরোসিন বা অন্য অনেক জিনিসের প্রথম ধাপে মহার্ঘতা, দ্বিতীয় ধাপে দুষ্প্রাপ্যতা থেকে শুরু করে গ্রামে একটি মৃত্যু তারপর গ্রাম ছেড়ে ক্ষুধাতুর বিভ্রান্ত মানুষদের শহরের দিকে যাত্রা—পঞ্চাশের মন্বন্তরের এই প্রথম পর্ব এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। বিভূতিভূষণ

নিপুণভাবে যেন ছবির পর ছবি এঁকে মন্বন্তরের আবির্ভাবের সূচনা দেখিয়েছেন। সরল, অজ্ঞ, অসহায় গ্রামের মানুষদের বিমূঢ়তা আর শঙ্কার যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা তাঁর রচনার গুণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

মন্বন্তরের ছবি যাঁরা এঁকেছেন তাঁদের অনেকেরই লেখায় ক্ষুধার জ্বালায় মানবতার অবমাননা, বিশেষ করে নারীর সতীত্ব ধূলায় মিশিয়ে দেওয়ার বর্ণনা আছে। ঐ সব বর্ণনা কোথাও কোথাও বীভৎস বা বিকৃত রুচির পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। সে সময়কার লেখায় বাস্তব বর্ণনার নামে অনেক কুশ্রীতা বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। সে তুলনায় বিভূতিভূষণের আশ্চর্য সংযম কেবল প্রশংসনীয় বললে যথেষ্ট হয় না—এ তাঁর স্বাতন্ত্র্য আর অসামান্য রুচিবোধের পরিচয়।

বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসে বাঙালীর জীবনে মন্বন্তরের অশুভ আবির্ভাবের যে ছবি এঁকেছেন তা তাঁর অসাধারণ কবিকল্পনার একটা নিদর্শন। এই উপন্যাসের নায়ক গঙ্গাচরণ যেন বাংলার সাধারণ গৃহস্থের প্রতিনিধি—অনঙ্গ-বৌ যেন বাংলার গৃহলক্ষ্মীর প্রতীক। দারিদ্র্য সত্ত্বেও অনঙ্গ-বৌয়ের ঘরে সন্তোষ, আনন্দ বা শ্রীর অভাব ছিল না। অকাল এসে কী করে ঐ শ্রী দিনে দিনে মুছে ফেলতে চেয়েছে বিভূতিভূষণ তা ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত হতাশার কালো ছায়া অনঙ্গ-বৌকে গ্রাস করে নি। সকলে যখন গ্রাম ছেড়ে যাচ্ছে তখন সে কাপালী-বৌকে আশ্বাস দিয়ে গ্রামে থাকতে বলেছে। চারদিকের বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যে এই আশ্বাস আর পরিশেষে কাপালী-বৌয়ের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসার ছবি উপন্যাসটির পরিণামী সংকেত।

ছোটগল্প

……………………………১……………………………

পরিচয়

বাংলার প্রায় সব কথাসাহিত্যিকের মতোই বিভূতিভূষণ প্রথমে ছোটগল্প লিখে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৩২৮ সালের মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে তাঁর প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হয়। তারপর তাঁর প্রায় তিরিশ বছরের সাহিত্যজীবনে তিনি অজস্র গল্প লিখেছিলেন। প্রধানত সাময়িক পত্রিকা আর গল্পসংকলনের চাহিদা মেটানোর জন্যই তিনি গল্প লিখেছিলেন; তবে তাঁর গল্পের এমন একটা বিশিষ্টতা আছে যে, সেগুলি বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। তাঁর গল্পের বিশেষ সংকলনগুলির কথা বাদ দিলেও তাঁর গল্পগ্রন্থের তালিকা অল্প নয়।

(১) মেঘমল্লার, (২) মৌরীফুল, (৩) যাত্রাবদল, (৪) জন্ম ও মৃত্যু, (৫) কিন্নরদল, (৬) বেণীগির ফুলবাড়ী, (৭) নবাগত, (৮) তালনবমী [কিশোর পাঠ্য], (৯) উপলখণ্ড, (১০) বিধু মাস্টার, (১১) ক্ষণভঙ্গুর, (১২) অসাধারণ, (১৩) মুখোশ ও মুখশ্রী, (১৪) আচার্য কৃপালনী কলোনী [পরবর্তী সংস্করণে 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব'], (১৫) জ্যোতিরিঙ্গণ, (১৬) কুশল পাহাড়ী, (১৭) রূপহলুদ, (১৮) অনুসন্ধান, (১৯) ছায়াছবি।

বিশেষ সংকলনগ্রন্থ (১) শ্রেষ্ঠগল্প, (২) গল্পপঞ্চাশৎ, (৩) ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প, (৪) প্রেমের গল্প, (৫) অলৌকিক, (৬) বিভূতিবিচিত্রা।

বিভূতিভূষণের সব গল্পই যে শিল্পের দিক দিয়ে নিখুঁত এমন নয়। 'মেঘমল্লার' বা 'দ্রবময়ীর কাশীবাস'-এর মতো উৎকৃষ্ট গল্প আছে আবার নিতান্ত সাধারণ রচনাও অনেক আছে। কিন্তু সাধারণ রচনা হলেও সেগুলি উপেক্ষণীয় নয়। এ প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য।—

"বিভূতিভূষণের সমস্ত রচনাই যে উচ্চকোটির রচনা এমন নয়, কারই বা, কিন্তু তাঁর কোনো রচনাই একটা নির্দিষ্ট মানের নীচে নেমে পড়ে নি—রচনার ধারা একটা ধ্রুব সমতল রক্ষা করে চলেছে। এমন যে সম্ভব হয়েছে তার কারণ তাঁর মন তখনো প্রসাদগুণে স্নিগ্ধোজ্জ্বল। এই স্নেহময় উজ্জ্বলতা তাঁর রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে শ্যামল তৃণবনে শিশিরকণার মতো। সেইজন্য তাঁর অতি তুচ্ছ রচনাও অতি সুখপাঠ্য।"—বিভূতি-বৈচিত্র, বিভূতি-বিচিত্রা।

বিভূতিভূষণের কোন কোন গল্প অবশ্যই পুরোপুরিভাবে কল্পনা থেকে উদ্ভূত ; সেগুলির মধ্যে তাঁর খেয়ালী কল্পনা আর শিল্পকুশলতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর বেশিরভাগ গল্পই জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া। মুখ্যত 'প্রকৃতিপ্রেমিক' অভিধায় প্রখ্যাত হলেও বিভূতিভূষণ মানবসমাজ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন নি ; বরং তিনি একান্ত আগ্রহের সঙ্গে মানুষের জীবনের দিকে তাকিয়েছেন। মানুষের জীবনরসের স্বাদ পাওয়ার গভীর আকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে ছিল। তিনি নিঃসঙ্গভাবে প্রকৃতির মধ্যে গিয়ে সৌন্দর্যের মধ্যে অবগাহন করে ভাবকল্পনাকে যেন অমৃতধারায় স্নান করিয়েছেন ; আবার মানুষের মধ্যে ফিরে এসে তার জীবনের বিচিত্র রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। 'অভিযাত্রিক' দিনলিপিতে তিনি বলেছেন।—

"প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এক একটা অদ্ভুত জগৎ, দেখতে জানলেই সে জগৎটা ধরা দেয়। তাই দেখতেই পথে বার হওয়া। মানুষের বিভিন্ন রূপ দেখবার আমার চিরকাল আগ্রহ, নতুন মানুষ দেখলেই মনে হয় ওর সঙ্গে বসে একটু আলাপ করে ওকে চিনি। দেখতে চেয়েছিলুম বলেই বোধ হয় কত রকমের মানুষকেই যে দেখালেন জীবনে।

মানুষকে চিনে জেনে লাভই হয়েছে, ক্ষতি হয় নি, একথা আমি মুক্ত কণ্ঠে বলবো। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপাতত ক্ষতি বলে মনে হলেও ভবিষ্যতে মনের খাতায় তাদের অঙ্ক পড়ে গেছে

লাভের দিকেই। মানুষের অন্তর একটি রহস্যময় বিরাট বিশ্ব, এর সীমা নেই, শেষ নেই। মানুষের অন্তর্লোক আবিষ্কারের অভিযান, উত্তর-দক্ষিণ মেরু অভিযানের মতই কষ্ট ও অধ্যবসায়সাপেক্ষ, সেই রকমই বৈচিত্র্যময়।"

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে মানুষের বিচিত্র রূপ আর তার অন্তরলোকের রহস্যের আশ্চর্য পরিচয় ফুটে উঠেছে। অনেক গল্পে তাঁর কেবল সানুরাগ দ্রষ্টার ভূমিকা। তাঁর দৃষ্টি ক্বচিৎ দার্শনিক হয়ে উঠেছে; তিনি সাধারণত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে পরিত্যক্ত তার ছোটখাটো সুখ-দুঃখ বাসনা-বেদনার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর উপন্যাসে যে সৌন্দর্যতত্ত্ব, সৃষ্টি চেতনা বা আধ্যাত্মিক আকুতির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ছোটগল্পে সাধারণত তার সন্ধানই পাওয়া যায় না। তিনি মানুষের সঙ্গে একান্ত অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন। যেসব মানুষের জীবনে ভাস্বরতার ছাপ পড়ে নি, স্থূল বাস্তবদৃষ্টিতে যারা তুচ্ছ, অকৃতার্থ, তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই যে বিচিত্র জীবনরস ক্ষরিত হচ্ছে বিভূতিভূষণ তারই সন্ধানী হয়েছিলেন। সভ্যতার প্রকোপে প্রাণরসে বঞ্চিত নাগরিক মানুষের হৃদয়ে ঐ বিচিত্র জীবন-রসের অনুভূতি দিনে দিনে ক্ষীণতর হয়ে আসছে—একালের কথা-সাহিত্যে বিষয়বস্তুর উগ্র বর্ণলেপ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিভূতিভূষণ নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হলেও জীবনের প্রতি নিবিড় অনুরাগের প্রেরণায় আপাততুচ্ছ জীবনের মধ্য থেকে আশ্চর্য স্বাদ পেয়েছেন, অপিচ সাহিত্যের মধ্যে তাকে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন।

উপন্যাসের মধ্যে জীবনের প্রবাহের পরিচয় থাকে; আংশিক হলেও একটা বৃহত্তর পটভূমিকায় উপন্যাসগত জীবন বিধৃত। ছোট-গল্পের মধ্যে সাধারণত জীবনের একটি খণ্ডাংশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ক্ষণিকের দ্যুতিতে গভীর রহস্যের সন্ধানই ছোটগল্পের উদ্দেশ্য—সার্থক ছোটগল্পই 'বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু দর্শন'। কখনো কখনো ছোটগল্পে ব্যক্তিবিশেষের অসামান্যতার উজ্জ্বল ছবি আঁকা হয়। একটি চরম

মুহূর্ত সৃষ্টি করে জীবনের গূঢ় সত্যকে প্রকাশ করার প্রয়াসও অনেক ছোটগল্পে দেখা যায়।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে সার্থক ছোটগল্পের এই সব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় অনেক জায়গাতেই মেলে। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প প্রচলিত শিল্পাদর্শকেই স্বীকার করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর বেশির ভাগ ছোটগল্পে জীবনের অত্যুজ্জ্বল কোন মুহূর্তের চিত্রণ বা জীবনের কোন গূঢ় রহস্যের সংকেতের পরিবর্তে সাধারণ মানুষের নিত্যকার জীবনের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে হৃদয়গত সংযোগস্থাপনের আকাঙ্ক্ষাই বড়ো হয়ে উঠেছে। সহধর্মীতাই বিভূতিভূষণের ছোট-গল্পের ধারণী শক্তি। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের ছবি আছে, কিন্তু তাঁর অপূর্ব কবিত্বপ্রতিভা সেগুলিকে রসগর্ভ সৃষ্টিতে পরিণত করেছে। শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পে ঐ ছবি মমত্ববোধের অতিমাত্রায় জারিত; প্রভাতকুমারের ছোটগল্পে বুদ্ধির সূক্ষ্ম বাতাবরণ হার্দিক অনুভূতির কিছুটা বাধা সৃষ্টি করেছে। বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে তাঁর সখিত্ববোধ জীবনের ছবির মধ্যে সমপ্রাণতার অনুভূতি সঞ্চার করেছে।

……………………………………২……………………………………

গৃহকোণ

বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' (প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৮)। এই গল্পে তাঁর কল্পনার বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়।

"বিভূতিভূষণের সাহিত্যের যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহার সকলগুলিই বীজাকারে তাঁহার এই প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা'য় পাইতেছি। সেই শুভ্র শুচিতাবোধ, সেই খাদ্যলোলুপতা, সেই আদেখলেপনা ও সেই জন্মান্তর রহস্য, অর্থাৎ 'পথের পাঁচালী' ও 'দেবযান' দুই-ই এই

গল্পটিতে উঁকি মারিতেছে।”—বিভূতিভূষণের জীবনকথা, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।

সুকুমার সেন 'উপেক্ষিতা'র কিছুকাল পরে লেখা 'পুঁই-মাচা' (প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩১) গল্পে বিভূতিভূষণের সাহিত্যের বীজ আছে বলে মন্তব্য করেছেন। বিভূতিভূষণ প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনার একাংশ,—

“পুঁই মাচা গল্পটিতে বিভূতিভূষণের সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস পথের পাঁচালীর বীজ নিহিত। এই গল্পে এবং পথের পাঁচালীতে বিভূতিবাবুর রসকল্পনার স্বকীয়তা পরিস্ফুট। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখি পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গালার ধ্বংসপথবাহী পল্লীজীবনের অরণ্যাক্রান্ত পরিবেশে দারিদ্র্যজর্জর মুমূর্ষু নরনারীর ক্রমবর্ধমান অভিভব। হিংস্র আরণ্য লতাগুল্মের বেড়াজালে পড়িয়া মানব জীবন যেন শুকাইয়া আসিতেছে। বোধহয় যেন জঙ্গলাকীর্ণ পোড়ো ভিটার নিঃসঙ্গ বিভীষিকা মরণের ছায়া ফেলিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে বাকি বসতগুলি দখল করিতে। এই ধ্বংসপথ যাত্রার ছবি বিভূতিভূষণের রচনায় রোমাণ্টিক দূরত্বের প্রজেক্টরের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। সুতরাং বিভূতিভূষণের দৃষ্টি অভিজ্ঞতালব্ধ হইলেও বাস্তব নয়, রোমাণ্টিক। সে দৃষ্টিতে প্রকৃতি মানবজীবনের খেলাঘর বা পটভূমিকা নয়, মানবজীবনই প্রকৃতির খেলাঘর অথবা পটভূমিকা।”—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড।

সুকুমার প্রধানত 'পথের পাঁচালী'র কথা স্মরণ করে এই আলোচনা করেছেন; বিভূতিভূষণের কোন কোন ছোটগল্প সম্পর্কেও এই বিশ্লেষণ স্মরণীয়। তবে মানুষের ঐ অভিভবকে ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু করে তোলার বাসনা বিভূতিভূষণের ছিল না। তাঁর এই সব গল্পে সহৃদয় লেখনীর চিত্রাঙ্কন প্রবণতাই বেশি করে ফুটে উঠেছে।

প্রকৃতির সৌন্দর্যানুভব বা রোমাণ্টিক কল্পনার কথা বাদ দিলে 'পথের পাঁচালী'র মূল আকর্ষণ ঘরোয়া জীবনের ছবি। বাঙালীর

সাধারণ জীবনের নিস্তরঙ্গতা কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসাবে তাঁর অসার্থকতার কারণ বলে সাহিত্যসমালোচকরা বহুবার আক্ষেপ করলেও আপাততুচ্ছ ঘরোয়া জীবনের মধ্যে যে বিচিত্র রস আছে বিভূতিভূষণ তাকেই কয়েকটি গল্পের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। 'উপেক্ষিতা'র পর আমরা 'উমারাণী' বা 'মৌরীফুল' গল্পের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই গল্পগুলি সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,—

"তাহাদের মধ্যে সহানুভূতিস্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ করুণরস ও যৌন প্রেমের একান্ত বর্জন বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। ইহাদের মধ্যে পরিকল্পনার মৌলিকতা নাই, কিন্তু ভাবের ঐকান্তিকতা ও করুণ রসের গভীরতা ইহাদের প্রধান গুণ। 'উপেক্ষিতা' গল্পে অনাত্মীয় নারীপুরুষের মধ্যে ভাই-বোনের মধুর সম্পর্ক গড়িয়া ওঠার কাহিনী শরৎচন্দ্রের প্রভাবান্বিত বলিয়া মনে হয়। তবে এই সম্পর্কের মধ্যে জটিলতা অপেক্ষা স্নেহসিক্ত মাধুর্যের উপরই বেশী জোর দেওয়াতে লেখকের নিজস্ব রীতি অনুবর্তিত হইয়াছে। 'মৌরীফুল'-এ একটি সংসার-বুদ্ধিহীনা, একগুঁয়ে, অথচ স্নেহশীলা গৃহস্থবধূর করুণ জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।"—বঙ্গসাহিত্যে ইতিহাসের ধারা।

সাহিত্যবিচারকের কাছে ঐ কাহিনীর কারুণ্যই মুখ্য; কিন্তু বিভূতিভূষণের মর্মসন্ধানী পাঠকের কাছে 'মৌরীফুল' গল্পের ঐ একগুঁয়ে বধূই আকর্ষণীয় বা উল্লেখযোগ্য বলে মনে হবে। এই গল্পের সুশীলা বাংলার গ্রামবধূর একটি প্রাণবন্ত রূপ। বিভূতিভূষণ বাংলার গ্রামের মেয়েদের মধ্যে যে বোধহীন হৃদয়বত্তা আর প্রাণবত্তা ওতপ্রোত বলে অনুভব করেছিলেন এই গল্পের সুশীলা থেকে শুরু করে 'ইছামতী' উপন্যাসের নিস্তারিণী পর্যন্ত অনেক চরিত্রে তার সার্থক রূপ ফুটে উঠেছে।

অসংখ্য স্নেহবন্ধনে জড়ানো পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে সঞ্চরণের যে বাসনা বাংলার নারীর মর্মগত বিভূতিভূষণ তার

প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' গল্প এই বাসনারই একটি উপাদেয় বর্ণনা। বর্ষীয়সী দ্রবময়ী ধর্মবাতিক-গ্রস্তা সঙ্গিনীদের সাহচর্য এড়িয়ে বাংলার গ্রামের পরিচিত জীবন-যাত্রায় ফিরে যেতে চেয়েছেন। নিজে অধ্যাত্মরসের জন্য মাঝে মাঝে উৎসুক হলেও ঘরোয়া জীবনের নিবিড় স্নেহাবেশকে কম মূল্যবান্ বলে মনে করেন নি। সহজ জীবনরস তাঁর ছোটগল্পের বহু চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। নীতিবায়ুগ্রস্ত পাঠকের কাছে কৃষ্ণলাল রুচিকর বলে মনে হবে না; কিন্তু বিভূতিভূষণ এই মানুষটিতে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা-দুর্বলতা সব কিছুকে ফুটিয়ে তুলেছেন। চার্লস ডিকেন্সের মত সমগ্র মানুষকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। সেইজন্য কৃষ্ণলালের দুর্বলতা নিয়ে তিনি মাতামাতি করেন নি, আবার তার প্রতি ব্যঙ্গমিশ্র কটাক্ষসম্পাতও করেন নি।

'যাত্রাবদল' গল্পেও দেখি যে, বিভূতিভূষণ হৃদয়বান্ সাক্ষীর মতো একটি করুণ কাহিনীর সঙ্গে মানুষের সংকীর্ণ স্বকেন্দ্রিকতার ছবি নিপুণভাবে মিলিয়েছেন। এই গল্পে দু'টি বিপরীত প্রান্তীয় ছবি আছে; দু'টিই সত্য। বিভূতিভূষণের জীবনবোধ দু'টিকেই স্বীকার করে নিয়েছে। এই সমদর্শিতা অবশ্যই বৈদান্তিক নিঃসঙ্গতা নয়। জীবনচেতনার পরিপূর্ণতা বিভূতিভূষণকে মানুষ তার সমস্ত দুর্বলতা সমেত গ্রহণ করার প্রেরণা দিয়েছে। কেবল যেখানে মানুষ প্রচণ্ড লোভের বশবর্তী হয়ে নিজের চারদিকে সংকীর্ণ গণ্ডী রচনা করে তার মনুষ্যধর্মকে খর্ব করে, সেখানে বিভূতিভূষণ বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছেন। তিনি তাঁর ছোটগল্পে এইরকম মানুষের ছবি যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। কেবল 'অভয়ের অনিদ্রা', 'কমপিটিশন' প্রভৃতি কয়েকটি গল্পে তাঁর তীব্র বিরাগের কিছুটা পরিচয় ফুটে উঠেছে।

·····································৩········· ··································

মানুষ

বিভূতিভূষণের অনেক গল্প এক একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই চরিত্রগুলি অসাধারণ নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এদের সন্ধান পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এই চরিত্রগুলি সংগ্রহ করেছিলেন, তবে কোন কোন চরিত্র তাঁর কল্পনাযোগে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। বিভূতিভূষণের সহানুভূতি এইসব চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছে।

এইসব চরিত্র সাধারণ বটে, কিন্তু একদিক দিয়ে অসাধারণ। এদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা বিশিষ্টতা আছে যার জন্য তারা সাধারণ মানুষের থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু এরা স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেন নি। বরং প্রতিকূল বাতাবরণে এদের জীবন পঙ্গু হয়ে গেছে, অকৃতার্থতার বেদনা বুকে নিয়ে এরা নিঃশেষে বিলীন হয়ে গেছে।

'রামতারণ চাটুজ্জে—অথর' বা 'কবি কুণ্ডমশায়' চরিত্রের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। রামতারণ এককালে সুপ্রসিদ্ধ ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ রচয়িতা হলেও কালক্রমে অবহেলিত হয়ে নিদারুণ দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়েছেন। কবি কুণ্ডমশায় মনেপ্রাণে কবি হয়েও একটা কাপড়ের দোকানে সামান্য কর্মচারী হয়ে জীবন কাটিয়েছিলেন। 'অনুসন্ধান' গল্পে নারাণবাবুকে একজন আদর্শ শিক্ষক হয়েও আজীবন দারিদ্র্য আর প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হল। বরং এই দিক দিয়ে 'শাবলতলার মাঠ' গল্পের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উমাচরণ কতকটা সার্থক, তিনি প্রকৃতির উদার পরিবেশে কবিতা লিখে নিজের মনের আনন্দে পরিতৃপ্ত।

অকৃতার্থতার একটা সার্থক গল্প 'ভণ্ডুলমামার বাড়ী'। ভণ্ডুল মামা যখন বাড়ী তৈরি করতে আরম্ভ করেন তখন গ্রামে বসতি ছিল, যখন বাড়ী শেষ করলেন তখন গ্রাম প্রায় জনহীন। ঐ বাড়ির উপর তাঁর আন্তরিক মমতা, কিন্তু তাঁর ছেলেরা শহর ছেড়ে গ্রামে থাকতে চায় না। 'উইলের খেয়াল' গল্পে পূর্ণবাবু সারা জীবন দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাটাবার পর বৃদ্ধ বয়সে পিসিমার সম্পত্তি পেয়েছেন। "দেখলাম পূর্ণবাবু চিরবঞ্চিত জীবনের সর্বগ্রাসী তৃষ্ণায় ভোগলালসা মেটাতে উদ্যত হয়েচেন বিকারের রোগীর মত। চারিধারে ঘনায়মান মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে, স্বল্পতৈল জীবনদীপের আলো যত সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর জ্যোতিঃ বৃত্তের সৃষ্টি করচে উনি ততই উন্মাদ আগ্রহে যেখানে যা পাবার আছে পেতে চান। জীবনে ওঁর যখন সুবৃষ্টি এল, জল না পেয়ে তখন আধমরা, সেই এল কিন্তু এত দেরি করে এল।" —'যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ' গল্পে এককালের প্রতিভাবান জনপ্রিয় যাত্রাভিনেতা পরবর্তীকালে অনাদরের সম্মুখীন হয়েছে। 'বিধু মাস্টার' গল্পে এক দরিদ্র শিক্ষক কীভাবে প্রতিকূল অবস্থায় জড়িত হয়েছেন তার ছবি নিপুণভাবে আঁকা হয়েছে। 'বেচারী' গল্পে ভগিনীপতির গলগ্রহ সুরেশের কথাও এই সঙ্গে মনে আসে।

কয়েকটি গল্পে চরিত্রই প্রধান। নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব' বা 'থনটন কাকা' গল্পে মূল চরিত্রের বিশিষ্টতা বা তাদের আচরণের আকস্মিকতা পাঠককে আকৃষ্ট করে। 'রূপো বাঙাল' গল্পে চরিত্রচিত্রণ এত বর্ণাঢ্য যে গল্পটি পড়ে একালের একজন শ্রেষ্ঠ চরিত্রাঙ্কনশিল্পী 'বনফুল'-এর কথা মনে আসে। বিভূতিভূষণ এই যে গ্রাম্য মুসলমানের সাধুতার ছবি এঁকেছেন তার মতো চরিত্র বাস্তব জগতে সুলভ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও এই চরিত্রটিকে আঠারো আনা জীবন্ত বলেই মনে হয়। 'বেনিয়ম' গল্পটিও 'আজকালকার অসাধুতার যুগে' একজন বিশ্বাসী কর্মচারীর বর্ণনা।

'সুলোচনার কাহিনী'র সুলোচনাও অকৃতার্থ। নিতান্ত প্রতিকূল

অবস্থায় পড়ায় তার রূপ তার বৈরী হয়ে উঠেছে। সে অনেক দুঃখ সহ্য করে নিজেকে রক্ষা করেছে। দেশগতপ্রাণ প্রকাশের প্রতি তার শ্রদ্ধা-প্রেমেরই রূপভেদ। অনেক কষ্ট ভোগ করবার পর সে যখন একটু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন প্রকাশের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে ভেঙ্গে পড়ে ছ'মাসের মধ্যে মারা গেছে।

'ফকির' গল্পের ইচু এক আশ্চর্য সরল চরিত্র। সে একজন সাধারণ গ্রাম্য মজুর। তার স্ত্রী নিমি যে অসচ্চরিত্র এ কথা প্রতিবেশীদের অনেকে জানলেও তার ধারণার অতীত। নিমি নিহত হওয়ার পর যখন উকিল তাকে অপরাধী বলে সন্দেহ করে তার হাজতবাসের ইঙ্গিত করেছেন, তখন সে উকিলের পায়ে ধরে বলেছে, "বাবু ঝেখানে মোরে রাখে, যা করে ক্ষতি নেই। কিন্তু বাবু, এইটে তাদের বলে দেবেন ব্যবস্থা করে, যেন পাঁচ ওক্ত নমাজ আমি সেখানে পড়তি পারি—আর আমার বলবার নেই বাবু।"

'বায়ুরোগ' গল্পে এক অভিনব চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এক গরীব ব্রাহ্মণ রাঁধুনি তার মনিবের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট যে সে নিজের নামে মিথ্যে চুরির অপবাদ রটিয়ে অপরের ভাঙচি এড়াতে চেয়েছে। তারানাথ তান্ত্রিক একটি স্মরণীয় চরিত্র, তবে তাঁর গল্পগুলির রস স্বতন্ত্র। 'জাল' গল্পে রামলাল ব্রাহ্মণ নামে একটি আশ্চর্য চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। শহরে ব্যবসা করে ধনী হওয়ার পর তিনি অরণ্যভূমিতে বাস করতে চেয়েছেন। 'মূলো-র‍্যাডিশ-হর্স র‍্যাডিশ' গল্পটির বাস্তব ভিত্তি আছে কিনা বলা যায় না; এই গল্পেও একটি নিরুপায় ব্যর্থ প্রেমিকের চিত্র আছে। গল্পটির শুরুতে যে অপ্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার সুর ছিল গল্পের শেষে তা স্পষ্টই সমবেদনায় পরিণত হয়েছে। 'দাদু' গল্পে এক পুত্রগত প্রাণ বৃদ্ধের ছবিও প্রাণবন্ত—ঐ পুত্রের মৃত্যুতে গল্পের পরিসমাপ্তি ট্র্যাজিক রস সৃষ্টি করেছে।

কয়েকটি আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করলেও চরিত্র রচনার প্রাথমিক আগ্রহ বিভূতিভূষণের ছিল না। তিনি অজস্র সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে-

ছিলেন। তাদের জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, ভাব-ভাবনা বিভূতিভূষণের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। চরিত্রের উত্তুঙ্গতার দিকে তিনি দৃক্‌পাত করেন নি। যেখানে মানুষের জীবনরসের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষরণ সেখানেই তাঁর কবিচিত্ত সমানুভবে দ্রবীভূত হয়েছে। দরিদ্র গ্রামবধ্‌ শিশু নিয়ে শহরে পাতানো সইয়ের বাড়িতে এসে অনতিপ্রচ্ছন্ন উপেক্ষা সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে চেয়েছে; অতি দরিদ্র বালিকা স্নানের আগে গন্ধতেল পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে; উপেক্ষিতা দরিদ্র গ্রাম-বালিকা শহরে গিয়ে 'মুটী' হয়ে যেন পরমার্থ লাভ করেছে; গ্রাম্য জেলের ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রেলের চাকরি নিয়ে কোয়ার্টার পাওয়ায় তার মা ঐ অভাবিত সম্পদ গ্রামের পূর্বপরিচিত ব্যক্তিকে সাগ্রহে দেখিয়েছে। এইসব ঘটনা অতি সাধারণ কিন্তু জীবনরসিক বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে এগুলি অসামান্য বলে মনে হয়েছে। তিনি এই তুচ্ছ ঘটনাগুলিকেও গল্পের বিষয়ীভূত করেছেন; মানুষের সামান্য অনুভূতির সহজ প্রকাশ তাঁর কাছে মনোজ্ঞ বলে মনে হয়েছিল।

.................................৪.................................

ইতিহাস : অতিপ্রাকৃত

বিভূতিভূষণের কোন কোন গল্পে ইতিহাসের পটভূমিকা আছে —যেমন, 'মেঘমল্লার', 'প্রত্নতত্ত্ব', 'স্বপ্ন-বাসুদেব', 'অভিশপ্ত' প্রভৃতি গল্প। কিন্তু ইতিহাসের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না। তিনি এই ধরনের গল্পে যে ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন তা নিতান্তই বর্ণবিরল। আসলে তিনি ঐতিহাসিক যুগের আমেজমাত্র দিয়ে ঐ পটভূমিকায় স্বতন্ত্র রসের কাহিনীকে স্থাপন করতে চেয়েছেন, এই মাত্র। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'মেঘমল্লার' গল্পটির কথা স্মরণ করা যেতে

পারে। এই গল্পে বন্দিনী সরস্বতীর আত্মবিস্মৃতি, প্রদ্যুম্নর আত্মত্যাগ আর সুনন্দা প্রদ্যুম্নের স্নিগ্ধ প্রেমের আভাসে ললিতকরুণ সুর ফুটে উঠেছে। মন্ত্রবলে দেবী সরস্বতীর বন্দীত্বের কল্পনাটি অলৌকিকের পর্যায়ে পড়ে; ঐ অলৌকিক ঘটনাটিকে কাহিনীর মধ্যে স্থান দেওয়ার জন্যই প্রাচীন ইতিহাসের বাতাবরণ কল্পিত হয়েছে। 'স্বপ্ন-বাসুদেব' গল্পে স্বপ্নে কিশোরমূর্তি দেবতার আবির্ভাব অলৌকিকেরই পর্যায়ে পড়ে। তবে এই দু'টি গল্পে কল্পনার যে রোমাণ্টিকতার পরিচয় পাওয়া যায় সেটাই পাঠকের কাছে উপাদেয় বলে মনে হবে।

'অভিশপ্ত' আর 'হাসি' গল্পে ঐতিহাসিক কাহিনীর পটভূমিকায় অতিপ্রাকৃতকে স্থান দেওয়া হয়েছে। শ্রীকুমার এই গল্প দু'টির বিশেষ প্রশংসা করেছেন।—

"অভিশপ্ত গল্পে মধ্যযুগের বাঙ্গালা ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত এক ভৌতিক কিংবদন্তী তীব্র অনুভূতি ও আশ্চর্য ব্যঞ্জনাশক্তির সহিত বিবৃত হইয়াছে। কীর্তি রায় ও নরনারায়ণের বিরোধ-কাহিনীতে যে অতর্কিত আক্রমণ ও অমানুষিক প্রতিহিংসার চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদিগের মধ্যযুগের হিংস্র, পরাক্রান্ত বর্বরতার সুন্দর পরিচয় দেয়। সুন্দরবনের দুর্গম আরণ্য প্রদেশের বর্ণনা 'অপরাজিত'র অনুরূপ দৃশ্যের কথা বার বার মনে করাইয়া দেয়—বস্তুতন্ত্রতা ও উচ্চতর কল্পনার আভাস, উভয় দিক দিয়াই ইহা অতুলনীয়। এই ঘোর অরণ্যানীর কেন্দ্রোৎক্ষিপ্ত তীব্র রোদনধ্বনি যেন প্রেতলোকেরই অকৃত্রিম স্বরটি আমাদের কানে পৌঁছাইয়া দেয়—বস্তুতন্ত্রতা ও উচ্চতর কল্পনার আভাস উভয় দিক দিয়াই ইহা অতুলনীয়। এই ঘোর অরণ্যানীর কেন্দ্রোৎক্ষিপ্ত তীব্র রোদনধ্বনি যেন প্রেতলোকেরই অকৃত্রিম স্বরটি আমাদের কানে পৌঁছাইয়া দেয় ও আমাদের স্নায়ু-শিরায় তাহারই অপার্থিব শিহরণ জাগাইয়া তোলে। 'হাসি' গল্পের ঐতিহাসিক পরিবেশ এতটা পরিস্ফুট হয় নাই, কিন্তু অন্ধকার নদীবক্ষে রুদ্ধনিঃশ্বাস প্রতীক্ষার মধ্যে অতর্কিত অট্টহাস্য ছুরিকার মত তীক্ষ্ণতার

সহিত আমাদের মর্মমূলে কাটিয়া বসে। প্রেতলোকের সহিত মনুষ্য-লোকের বার্তাবিনিময়ের যে গোপন সুরঙ্গপথ আমাদের অন্তরতলে উৎখাত আছে, বিভূতিভূষণ তাহার চাবির কৌশলটি আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।"—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

বিভূতিভূষণ 'দেবযান' উপন্যাসে প্রেতলোক বা আত্মিক লোকের কথা বলেছেন; কিন্তু তিনি কোন ছোটগল্পে ঐ ধরনের স্বতন্ত্র লোকের অবতারণা করেন নি। তিনি প্রত্যক্ষভাবে অতিপ্রাকৃতের বর্ণনা করতেও চেষ্টা করেন নি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরদার গল্পগুলির মতো পুরোপুরি অলৌকিক গল্প তিনি বিশেষ লেখেন নি। 'ছায়াছবি,' 'টান', 'পৈতৃক ভিটা', বা 'কবিরাজের বিপদ'-এর মতো কয়েকটি গল্প থাকলেও তিনি সাধারণত মানুষের মনের অচেতন বিশ্বাস বা দুর্বলতার সঙ্গেই অতিপ্রাকৃতকে সমন্বিত করেছেন। 'খুঁটী দেবতা' গল্পে বিধবা ভাগ্নে বউয়ের গহনা চুরি করার পর মামাশ্বশুর রাঘব চক্রবর্তী চোদ্দ-পনেরো দিন রাত্রে ঘুমোতে পারেন নি। অবশেষে তার খাটের পাশের বাঁশের খুঁটি বিরাট মূর্তি ধরে তাঁকে তিরস্কার করেছে—ভাগ্নেবউ ঐ খুঁটির কাছে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য আবেদন জানিয়েছিল। 'আরক' গল্পে যে অতি প্রাকৃতের আবির্ভাবের কল্পনা করা হয়েছে তার পিছনে নেশার ক্রিয়ার সম্ভাব্যতা আছে।

তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে; বিশেষত দ্বিতীয় গল্পটি শিল্পকর্মের দিক দিয়ে অনবদ্য—এটি বিভূতিভূষণের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। এই গল্প সম্পর্কে শ্রীকুমার বলেছেন,—

"তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প-এ তন্ত্রসাধনার দ্বারা যোগিনী বশীভূত করার রোমাঞ্চকর কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বরাকর নদীর নির্জন, চন্দ্রালোকস্নাত, বালুকাস্তীর্ণ দূরদিগন্তে শালবনের অস্পষ্ট নীলরেখাঙ্কিত তটভূমিতে মন্ত্রাকর্ষণে অলোকসম্ভবা সুন্দরীর আবির্ভাব আমাদের মনে অজ্ঞাত কৌতূহলমিশ্র ভয়ের শিহরণ জাগায়। সুন্দরীর

মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল মনোভাব—হাস্য হইতে ভ্রূকুটি, প্রেম হইতে জিঘাংসা, সহজ ভাববিনিময় হইতে দুরধিগম্য নীরবতা—তাহার সহিত রহস্যময় সম্পর্কের মধ্যে এক নামহীন ভয়াবহতার সৃষ্টি করে।"—তদেব।

'অলৌকিক' গ্রন্থে বিভূতিভূষণের অতিপ্রাকৃত রসের কয়েকটি গল্প সংকলিত হয়েছে।

'জহরলাল ও গড' গল্পটিতে ভগবানের ভূমিকা থাকলেও গল্পটিতে অলৌকিক রস নেই। 'পেয়ালা' গল্পে একটি বিশ্বাসকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'দুটি মন্তর' ঠিক অলৌকিক গল্প নয়; এর নায়কের অসামান্য জাদুশক্তি কল্পনা করে বিস্ময়কর ঘটনার সৃষ্টি করা হয়েছে। অবচেতন মনের দুর্লক্ষ্য ক্রিয়ার চিত্রাঙ্কন এই গল্পের নীতিকে শিল্পমণ্ডিত করেছে।

'ছেলেধরা' গল্পটি ভয়ানক রসাত্মক। সাধুবেশধারী এক ব্যক্তির শিশুমাংসলোলুপতার এই কাহিনীর শিল্পকর্ম সম্পর্কে বিভূতিভূষণ আর একটু মনোযোগী হলে এটি বাংলা সাহিত্যে অতি বিরল ভয়ানক রসের একটি উৎকৃষ্ট গল্পে পরিণত হত।

৫

জীবনদৃষ্টি

কয়েকটি গল্পে বিভূতিভূষণের জীবনদর্শনের এক একটি অংশ ফুটে উঠেছে। এই গল্পগুলির মধ্যে কথাসাহিত্যের ভঙ্গি নেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু এগুলির মধ্যে গল্পরস অনেক ক্ষেত্রে তেমন জমে নি। অন্য কোন উপযুক্ত মাধ্যম খুঁজে না পাওয়ায় তিনি গল্পের কাঠামোটি নিয়েছেন। সাধারণত কোন চরিত্র বা কোন ঘটনাকে অবলম্বন করে তিনি তাঁর কল্পনাগত আদর্শটি ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন।

এই ধরনের গল্পের মধ্যে 'কুশল পাহাড়ী' গল্পটির কথা প্রথমেই

উল্লেখ করতে হয়। এই গল্পটিতে একদিকে তথাকথিত সভ্যজগতের প্রতি বিরাগ, অপর দিকে প্রকৃতির উদার পরিমণ্ডলে জীবনের গভীর সত্য উপলব্ধির জন্য একান্ত আগ্রহ। বিত্তশীল সমাজের বস্তুসর্বস্ব জীবনের প্রতি তিনি বিতৃষ্ণ। নাগরিক জীবনের মধ্যে তিনি স্মরণ করেছেন অরণ্যভূমির এক প্রবীণ সাধুর কথা, যিনি বিশ্বের স্রষ্টাকে কবিরূপে উপলব্ধি করেছেন। এই আরণ্যক ঋষির সঙ্গে বিভূতিভূষণের আত্মিক যোগ। তিনি শুধু সৌন্দর্যের জন্যই অরণ্যপ্রকৃতিকে ভালোবাসেন নি, এই প্রেমের সঙ্গে একটি গভীরতর আকুতি আছে। এই গল্পটির কথা স্মরণ করে তারাশঙ্কর যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধারযোগ্য।—

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিভূতিভূষণ ছিলেন সাধক। অমৃতময় আনন্দই ছিল তাঁর ইষ্ট—তারই মধ্যে তিনি তাঁর পরমপুরুষকে পাইবার সাধনায় মগ্ন ছিলেন। আজিকার এই বস্তুবিজ্ঞান সর্বস্বতার যুগে তাঁকে সম্যক উপলব্ধি করার মত মানসিক গঠনশক্তি নিশ্চিতরূপে হ্রাস পাইয়াছে।...'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুঃ।' এই শ্লোকের 'কবি' কথার অর্থ যাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা—এই, 'কবিই তিনি বটেন। শালগাছে যখন ফুল ফোটে, বর্ষাকালে যখন পাহাড়ে ময়ূর ডাকে, ঝর্ণা দিয়ে জল বয়ে যায়—তখন ভাবি কবিই তিনি বটেন।...তাঁর এই কবিরূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছি।' অবশ্য এ শ্লোক ও শ্লোকের এই ব্যাখ্যা তিনি একদা শুনিয়াছিলেন সুন্দরগড় স্টেটের অরণ্যভূমে কুশল পাহাড়ীতে এক সাধুর নিকট কিন্তু তাঁর নিজেরও ছিল এই উপলব্ধি, সে উপলব্ধি ভাষায় স্পষ্ট করিয়া বিভূতিকে এই সাধুই শুনাইয়াছিলেন, সুপ্ত ইষ্টমন্ত্র জাগরণে সাহায্য করিয়াছিলেন।"—'কুশল পাহাড়ী'র ভূমিকা।

'কুশল পাহাড়ী'র আরও দু'-একটি গল্পে অনুরূপ ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। 'জাল' গল্পে রামলাল ব্রাহ্মণের 'ভরহেব নগর'-এর আকর্ষণও ঐ একই আকুতির অচেতন প্রকাশ। বৃদ্ধ রামলাল ব্রাহ্মণও:

নাগরিক জীবনের প্রতি বীতরাগ—বানপ্রস্থেই শেষ জীবন কাটাতে চেয়েছেন। গল্পের বক্তাও অরণ্যের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট—ঐ অরণ্যবাসী বৃদ্ধের পরিজনের জীবনের সরলতায় মুগ্ধ। 'মানতালাও' গল্পটি একটি আরণ্যক হ্রদের সৌন্দর্য-মাধুর্যের উপভোগ। এই জাতীয় রচনার মধ্যে গল্পরস আশা করা বৃথা। বিভূতিভূষণ অন্য অনেক গল্পাকার রচনার মতোই এখানেও স্মৃতির একটি টুকরো কাল্পনিক কাহিনীর আবরণে পরিবেশন করেছেন। 'মাকাললতার কাহিনী' গল্প প্রকৃতির মনোহারী রূপের একটি অপূর্ব ছবি।

'শেষ লেখা' গল্পটি আদর্শমূলক—বিভূতিভূষণ একটি সুপরিচিত বৌদ্ধ কাহিনীকে অবলম্বন করে এই গল্পটি রচনা করেছেন। বিভূতিভূষণ এই গল্পে অসামান্য শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু যে তিতিক্ষা এই গল্পটির ফলশ্রুতি তা তাঁর প্রকৃতির অনুসারী নয়। বরং আধ্যাত্মিক রসসম্ভোগ তাঁর কবিহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত ছিল। তিনি সেজন্য ধর্মচর্যার কোন সুনির্দিষ্ট পথের অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন নি বা সদ্‌গুরুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার প্রয়াস করেন নি। অপরপক্ষে সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন কি সমাজের নিচুস্তরের মানুষ বলে যারা উন্নাসিক অভিজাতম্মন্যদের কাছে অবজ্ঞাত, তাদের মধ্যেও আশ্চর্য আধ্যাত্মিক আকুলতার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। 'মড়িঘাটের মেলা' বা 'পিদিমের নীচে' গল্প দু'টি সে দিক দিয়ে মূল্যবান। তবে বুদ্ধের শিক্ষায় নন্দের অর্হত্বপ্রাপ্তির গল্পটি বিভূতিভূষণের মতো অধ্যাত্মবিশ্বাসী লেখকের শেষ রচনা হওয়ায় বিশেষ সংকেতময় বলে মনে হবে।

বিভূতিভূষণের আর একটি প্রিয় বিষয় শিশুপ্রেম 'খেলা' আর 'সীতানাথের বাড়ী ফেরা' গল্পে স্থান পেয়েছে। সন্তানের প্রতি পিতার যে অন্তহীন স্নেহ 'ইছামতী'র ভবানী চরিত্রে দেখা যায়, এখানে তারই প্রতিফলন হয়েছে। এই সন্তানপ্রেম যে তাঁর নিজের জীবনের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতারই প্রতিচ্ছবি তা সহজেই অনুমান করা যায়।

'খেলা' গল্পের পরিসমাপ্তি করুণ—পিতা মতিলাল ছেলেকে আনন্দ দেওয়ার জন্য নদীতে স্নান করার সময় কুমীর বা কামটের কামড়ে প্রাণ দিয়েছে; ঐ শিশুও পরে মারা গিয়েছে। 'সীতারামের বাড়ী ফেরা' গল্পে শিশুর জন্য সীতারামের উদ্বেগই গল্পটির কাহিনীর অবলম্বন।

'কনে দেখা' গল্পটি ফুল আর চারাপাগল সুধাংশুর কাহিনী। দরিদ্র অবস্থায় সে 'এরিক পাম'-এর চারা বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। নিলামওয়ালার গুদামে গিয়ে সে ঐ গাছটি দেখাশোনা করত। গাছটির প্রতি তার এতটা টান ছিল যে, সে গাছটি বিক্রি হয়ে যাওয়ার পরও তার কথা ভুলতে পারে নি। পাঁচ বছর পরে সে ফুলের চাষে উন্নতি করে কলকাতায় ফিরে অনেক সন্ধান করে সেই গাছটি কিনেছে। বন্ধুকে সে বলেছে, 'আমার সাধ হয়েচে ওর বিয়ে দেব। তাই একটা ছোটখাটো, অল্প বয়সের, দেখতে ভালো পাম খুঁজ-ছিলাম।'—এই গল্পটির মূল বিভূতিভূষণের নিজেরই প্রকৃতিপ্রেম।

.................................৬.................................

বিচিত্রতা

বিভূতিভূষণের বিভিন্ন গল্পে বিচিত্র রসের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রেমের গল্প খুব বেশি লেখেন নি—তবে তাঁর কয়েকটি প্রেমের গল্প নিয়ে একটি সংকলন গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য অবিমিশ্র প্রেম কোন গল্পের উপজীব্য নয়। 'বাক্সবদল'-এর মতো পুরোদস্তুর রোমান্স অবশ্য তিনি লিখেছিলেন—বাসে নায়ক-নায়িকার বাক্সবদল শেষ পর্যন্ত পরিণয়ে পরিসমাপ্ত হয়েছে। 'স্বপ্ন-বাসুদেব' রোমান্টিক প্রেমেরই গল্প। 'চিঠি' গল্পের নায়ক স্ত্রীর মৃত্যুর উনত্রিশ বছর পরে ফুলশয্যার পরের চিঠি পেয়েছে। অতীতকালের প্রেমের স্মৃতির উৎস

হিসাবে এটি উপভোগ্য। 'বেণীগির ফুলবাড়ি' প্রথম যুগের লেখা একটি উল্লেখযোগ্য প্রেমের গল্প।

প্রেমের গল্প হিসাবে 'অরন্ধনের নিমন্ত্রণ' সার্থক। অবশ্য প্রেম এখানে অচেতন বা সংগুপ্ত। গ্রাম্য যুবক হীরেন আর কিশোরী কুমীর মধ্যে সখ্য হয়েছে, কিন্তু হীরেন কুলীন না হওয়ায় তাদের বিয়ে হয় নি। কালক্রমে দু'জনেরই অন্যত্র বিয়ে হয়েছে। কয়েক বছর বিদেশে কাটাবার পর হীরেন গ্রামে ফিরে এসে অরন্ধনের নিমন্ত্রণে কুমীর কাছাকাছি আসবার পর তার মনে হয়েছে, 'আর কারো সঙ্গে কথা বলে অমন আনন্দ হয় না কেন?' গল্পরস এখানে স্বতঃস্ফূর্ত।—পরিণত বয়সের আর একটি প্রেমের গল্প 'মরফোলজি' শিল্পকর্ম হিসাবে আরও পরিপাটী।

ইংরেজীতে যাকে হিউমার বলে সেই স্মিত জীবনরস বিভূতিভূষণের রচনার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে। সে তুলনায় বিশুদ্ধ কৌতুকরস বা ব্যঙ্গ অপেক্ষাকৃত কম, তবে দুর্লভ নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'আইন-স্টাইন ও ইন্দুবালা' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। রাণাঘাটে একই দিনে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন আর ইন্দুবালার আগমন, আইনস্টাইনের বক্তৃতাসভায় জনশূন্যতা আর ইন্দুবালার নৃত্যানুষ্ঠানে শহর ভেঙ্গে পড়ার এই কাহিনী উজ্জ্বল কৌতুকের নিদর্শন। এই গল্পটির চরিত্রচিত্রণ আর গ্রন্থন দুই-ই অপূর্ব। এই গল্পটির রচনাভঙ্গি একালের একজন শ্রেষ্ঠ কৌতুক গল্পকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'জহরলাল ও গড' গল্পটিও উল্লেখযোগ্য। বিভূতিভূষণ এই গল্পে একালের হুজুগপ্রিয়তা আর ঈশ্বরবিমুখতাকে কটাক্ষ করেছেন। তবে এখানে ব্যঙ্গ তত তীব্র নয়। কৌতুকরসই এখানে প্রবল হয়ে উঠেছে।

কোন কোন গল্পে ব্যঙ্গ তীব্রতর। 'অভয়ের অনিদ্রা' গল্পে অভয়ের স্থূল লোভ গল্পের বিষয়বস্তু। অভয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর মৃত্যুতে কাতর হয়নি, স্ত্রীর কানের অলংকার শবের সঙ্গে দাহ হওয়ায় অত্যন্ত বিচলিত

হয়েছে। 'সিঁদুরচরণ' গল্পে ঘরকুনো গ্রাম্য চাষির কয়েক মাইল দেশ-ভ্রমণের গল্প কৌতুকরসের উপাদান হয়েছে। 'বুধোর মার মৃত্যু' গল্পে অসচ্চরিত্রা বুধোর মার তীর্থক্ষেত্রে মৃত্যু নিয়ে ব্যঙ্গমিশ্র কৌতুকের অবতারণা করা হয়েছে। 'অনুশোচনা' গল্পটি পুরোপুরি কৌতুক রসাত্মক। সকালে পাদরি বালাদাস পুরকোয়াস আপ্তের কাছে সখী-বাঈ নামে একটি নর্তকীকে আড়াল থেকে দেখার জন্য তীব্র অনুশোচনা করার পর গ্রাম্য চাষা বিকেলে দেখেছে যে স্বয়ং পাদরিই সখীবাঈকে দেখার জন্য ডুমুরের ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে আছেন।

বিভূতিভূষণের শেষজীবনের কোন কোন গল্পে স্বকালের চেতনা অত্যন্ত প্রবল। 'কমপিটিশন' গল্পের নায়ক শিবশঙ্কর জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত পুরুষ। ব্যবসাক্ষেত্রে সব প্রতিযোগিতায় তিনি নিরতিশয় সাফল্য লাভ করেছেন। জনৈক দালালের মধ্যস্থতায় সিনেমার এক নবীনা অভিনেত্রীর বাড়ি গিয়ে তিনি দেখলেন যে, তাঁর ছেলে বিমান অন্য একটি দরজা দিয়ে নেমে যাচ্ছে। বিভূতিভূষণের অপর কোন গল্পে ব্যঙ্গ এত কঠোর হয়ে ওঠে নি।—'ব্ল্যাকমার্কেট দমন কর' গল্পে কলকাতাবাসী ধনী গ্রামের বাড়িতে গৃহদেবতার জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ দু'টাকা এগারো আনা থেকে কিছু বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য পুরো-হিতকে টাকা পাঠানো বন্ধ করেছেন, কিন্তু কালোবাজারে ত্রিশ টাকা দিয়ে একটি কাঁচি ধুতি কেনার জন্য বাড়ির একটি ছেলের 'ক্রয়নৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা' করেছেন। 'আচার্য কৃপালনী কলোনী' জমি নিয়ে এক শ্রেণীর লোকের প্রতারণার কাহিনী। এই গল্পে বিভূতিভূষণ তাঁর সমকালকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

একালের প্রবণতা সম্পর্কে বিমুখতা থাকলেও বিভূতিভূষণ মানুষের প্রবৃত্তির বিকাশকেই চরম বলে মনে করেন নি। একাল সম্পর্কে মোহভঙ্গ হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত আশাবাদী থেকে গেছেন। 'ভিড়' গল্পে ট্রেনের একটি ছোট ঘটনাকে অবলম্বন করে তিনি মানবপ্রকৃতির মর্মগত সত্যকে প্রকাশ করেছেন।

ট্রেনের ঘটনা নিয়ে লেখা 'গল্প নয়' গল্পটি নারীর হৃদয়বত্তার খণ্ডচিত্র। গল্পটির শেষপূর্ব অনুচ্ছেদ—

"এই গাড়ির মধ্যে এত পুরুষমানুষ ছিল, কেউ ফিরেও চেয়ে দেখে নি ছেলেটির দিকে। সনাতনী মাতৃরূপা নারী দু'টি এসে এই মাতৃহীন, মৃত্যুপথযাত্রী শিশুকে মাতৃস্নেহের বহু পুরোনো অথচ চিরনূতন বাণী শুনিয়ে দিলে। সেদিন সে ট্রেনের মধ্যে গুটিকয়েক ক্ষণের জন্য বিংশ শতাব্দী ছিল না, সমাজদ্রোহী, কালোবাজার পুষ্ট, লোভী বিংশ শতাব্দী। ছিল সেই অমর মাতৃলোক, বিশ্বের সমগ্র জীবজগৎ যার করুণাধারায় বিধৌত।"

'চ্যালারাম' গল্পটি বিচিত্ররসের কাহিনী—গল্পটি বিভিন্ন কারণে উল্লেখযোগ্য। এই গল্পটি প্রসঙ্গে 'অনুসন্ধান' গ্রন্থের 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে বলা হয়েছে,—

"এই গল্পে কাবুলের আমীর আমানুল্লার রাজত্বকালে বাচ্চা-ই-সাকোর বিদ্রোহের কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। বিভূতিভূষণের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে গল্পটি প্রাণবন্ত হয়েছে। এই গল্প প্রকাশের বহু বৎসর পরে ডক্‌টর সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থ 'দেশেবিদেশে' ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ডঃ আলী প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে কাবুল বিদ্রোহের যেসব ঘটনাপঞ্জী বিবৃত করেছেন, বিভূতিভূষণ তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে সেইসব ঘটনার উল্লেখ করে ঘটনাবলীর গুরুত্ব স্বল্প কথায় ব্যক্ত করেছেন।"

বিভূতিভূষণ এই গল্পটির উপাদান কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন জানা যায় না। সমকালের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার যে নিপুণ ছবি এঁকেছেন তা তাঁর বিশ্লেষণী শক্তি আর কল্পনাদৃষ্টির উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। চ্যালারাম চরিত্রটিও অসাধারণ।

উপসংহার

বিভূতিভূষণের ছোটগল্প প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,—

"ছোটগল্পের আঙ্গিকে বিভূতিভূষণের নিখুঁত পারিপাট্যের অভাব। কতকগুলি গল্প কল্পনাসমৃদ্ধি ও অনুভূতির গাঢ়তার জন্য খুব চমৎকার হইয়াছে—কিন্তু গঠনের শিথিল আকস্মিকতা, দ্বিধাকম্পিত রেখাপ্রবণতা ও কেন্দ্রসংহতির অভাবের জন্য তাঁহার অনেক গল্পের আর্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য তিনি চাহেন বিস্তীর্ণ পটভূমিকা, ধীরমন্থর স্বেচ্ছাবিচরণ, গল্পের ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ, দরদী মনের স্মৃতি-রোমন্থন ও স্বপ্নজাল-বয়নের প্রচুর অবসর। ছোটগল্পের সঙ্কীর্ণ অঙ্গনে তাঁহার এই অবধি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত থাকে বলিয়া তিনি সকল সময় ইহার মাপে নিজেকে সংকুচিত করিতে পারেন না।"—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

বিভূতিভূষণের প্রথম চার-পাঁচটি গল্পগ্রন্থের উপর ভিত্তি করে এই মন্তব্যটি করা হলেও বিভূতিভূষণের গল্পের প্রকৃতির পরিচয় হিসাবে এটি বিশেষ মূল্যবান্। আদর্শ ছোটগল্পের নিটোল রূপ বিভূতি-ভূষণের ছোটগল্পে সাধারণত দেখা যায় না। ছোটগল্পে সুরের যে অখণ্ডতা বা পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার অবিচল আগ্রহ দেখা যায় বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে তার সন্ধান পাওয়া যায় না। 'ধীর-মন্থর স্বেচ্ছাবিচরণ' তাঁর ছোটগল্প কেন, সব রচনারই বৈশিষ্ট্য। এই স্বচ্ছন্দচারিতা তাঁর কবিপ্রকৃতিগত, শিল্পদক্ষতার দিকে তিনি দৃক্‌পাত করেন নি। অনেক গল্পে গঠনের যে শিথিলতা আছে তা সাহিত্য-

বিচারের স্মার্ত বিধানে ত্রুটি বলে গণ্য হবে সন্দেহ নেই, তবে বিভূতিভূষণের ভাবমণ্ডলের সহজ প্রকাশের পক্ষে ঐ শিথিলতা, ঐ অবকাশ অবশ্য প্রয়োজন। সাহিত্যের সামগ্রিক উপভোগের কোন হানি তাতে হয় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে আঁটসাঁট বাঁধুনির চেয়ে ঐ শিথিলতা ভাববিহারের পক্ষে উপযোগী বলেই মনে হতে পারে। আর্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হলেও রসের স্ফুরণ ব্যাহত হয় না।

গঠনের মধ্যে কিছুটা শিথিলতা থাকলেও বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে কেন্দ্রসংহতির অভাব আছে এ অভিযোগ মেনে নেওয়া কঠিন। কাহিনীর মধ্যে স্বচ্ছন্দ বিহারের প্রবণতা থাকলেও তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি ছোটগল্পেই একটি করে কেন্দ্রবিন্দুর সন্ধান পাওয়া যাবে। সমগ্র কাহিনী ঐ বিন্দুটিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণ তাঁর ছোটগল্পগুলিতে জীবনের যে খণ্ডরূপ এঁকেছেন তার মধ্যেও জীবনের সহজ প্রকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুর চারদিকে আবর্তন বা একাগ্রচিত্তে পরিণামের দিকে কাহিনীকে অগ্রসর করার আগ্রহ তাঁর ছিল না। তিনি জীবনের যে রূপ তুলে ধরেছেন তার মধ্যে সহজ সম্পূর্ণতা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই জন্যই অনেক সময় কেন্দ্রসংহতির অভাব ঘটেছে বলে মনে হয় বটে, কিন্তু এটি আসলে তাঁর শিল্পরীতির বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতার জন্যই তাঁর অতি সাধারণ গল্পের মধ্যেও স্বাদুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাস্তবিকপক্ষে বিভূতিভূষণের অনেক গল্পে শিল্পগত উৎকর্ষের নিদর্শন পাওয়া গেলেও শিল্পকৃতি তাঁর ছোটগল্পের মূল আকর্ষণ নয়। তাঁর গল্পের আকর্ষণ তার বিষয়বস্তু—যা নিছক গল্পরস ছাড়াও আর একটি স্বাদের পরিচয় দেয়। ঐ স্বাদ মানুষের জীবনরসের। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আপাততুচ্ছ অথচ বিচিত্র রূপের মধ্য থেকে এক আশ্চর্য স্বাদের পরিচয় দেওয়াতেই বিভূতিভূষণের ছোট গল্পের বিশিষ্টতা—এই দিক দিয়ে গল্পকার হিসাবে তিনি অসাধারণ, সম্ভবত অদ্বিতীয়ও।

দিনলিপি

আত্মজীবনীর মধ্যে অতিকথন বা অল্পকথনের সম্ভাবনা আছে। শোনা যায় গিরিশচন্দ্রকে তাঁর কোন অনুরাগী আত্মজীবনী লিখতে অনুরোধ করায় তিনি বলেছিলেন যে, যেদিন তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মতো সত্যবাদী হতে পারবেন সেদিন আত্মজীবনী লিখবেন। ইদানীং কোন কোন প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি আত্মজীবনীর আবরণে যে আত্মঢক্কার শুরু করেছেন তাতে সাহিত্যের এই শাখাটি বিড়ম্বিত। তা সত্ত্বেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী থেকে এ পর্যন্ত এমন অনেক আত্মকথা প্রকাশিত হয়েছে যেগুলি বাংলা সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে।

বিভূতিভূষণ আত্মজীবনী লেখেন নি, কিন্তু কয়েকটি গ্রন্থে আত্ম-ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। এই রচনাগুলিকে পুরোপুরি দিনলিপি বলা চলে না, এগুলির মধ্যে দৈনন্দিন ঘটনা বা ভাবনাকে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস আদৌ নেই। এগুলি কিছুটা দিনলিপি, কিছুটা স্মৃতিচারণ আবার কিছুটা ভাবকথন, কিছুটা বা অনুধ্যান। ইউরোপে এই ধরনের লেখা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায় বা তার সমাদরও যথেষ্ট। 'জার্নাল,' 'মেময়ের' বা অন্য যে নামেই প্রকাশিত হোক না কেন এমিয়েল, আঁদ্রে জিদ, আর্নল্ড বেনেট, ফ্রাঁসোয়া মারিয়াক, সমারসেট মম, থোরো বা চিন্তাশীল অপিচ কল্পনাবান্ অন্য অনেক লেখকের এই জাতীয় রচনা সাহিত্য হিসাবে যেমন উপাদেয়, ভাববস্তুর দিক দিয়েও তেমনই মূল্যবান্। অধুনা আমাদের দেশে এই ধরনের লেখা কিছু কিছু দেখা যায়; তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি সংবাদ-সাহিত্য, বড়োজোর রম্যরচনার পর্যায়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' বা 'ছিন্নপত্রাবলী' বা ধূর্জটিপ্রসাদের 'মনে মনে'র মতো রচনা বিরল।

বিভূতিভূষণের এই জাতীয় লেখা অল্প নয়। তাঁর সাতটি গ্রন্থে বিভিন্ন কালের রচনা সংকলিত হয়েছে।—(১) অভিযাত্রিক, [ফাল্গুন

১৩৪৭,], (২) স্মৃতির রেখা [শ্রাবণ, ১৩৪৮], (৩) তৃণাঙ্কুর [চৈত্র, ১৩৪৯], (৪) ঊর্মিমুখর [ভাদ্র, ১৩৫১], (৫) বনে পাহাড়ে [আশ্বিন, ১৩৫১], (৬) উৎকর্ণ [বৈশাখ, ১৩৫৩], (৭) হে অরণ্য কথা কও [মাঘ, ১৩৫৪]। এ ছাড়াও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কিছু কিছু রচনা আছে।

এই সাতটি গ্রন্থ সাত বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এগুলির রচনাকাল আরও বিস্তৃত। 'অভিযাত্রিক' রচনার কাল সম্ভবত ১৩২৯-৩১ সাল। 'হে অরণ্য কথা কও' ১৩৫২-৫৩ সালের লেখা। প্রথম চারটি বিভূতিভূষণ কথাসাহিত্যিকরূপে খ্যাতি অর্জন করার আগের সময়ের রচনা। বাংলা বইয়েব বাজারে গল্প বিশেষ করে উপন্যাসের তুলনায় এই ধরনের লেখার চাহিদা অনেক কম। সেই জন্য বিভূতিভূষণের এই লেখাগুলি তিনি খ্যাতিলাভ করার আগে প্রকাশিত হয় নি। তাও আবার 'স্মৃতির রেখা' বাদে অন্য গ্রন্থগুলি রচনার তারিখ বাদ দেওয়া হয়েছে, যাতে এগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে উপন্যাস জাতীয় রচনা বলে মনে হয়। বিভূতিভূষণের জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু গবেষকের পক্ষে এইসব দিনলিপি থেকে তাঁর জীবনের তথ্যানুসন্ধান বা তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কালনির্ণয় অসাধ্য হয়ে পড়েছে। যত্নশীল গবেষকও তাঁর জীবনের মূল ঘটনাগুলোর কালের একটা মোটামুটি রকমের আন্দাজ করতে পারেন, এই মাত্র।

বিভূতিভূষণের এই দিনলিপি জাতীয় রচনাগুলি সম্পর্কে প্রমথ-নাথ বিশী যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধার করা যেতে পারে।—

"তাঁর অতি তুচ্ছ রচনাও অতি সুখপাঠ্য। এই গুণটি সবচেয়ে প্রত্যক্ষ 'হে অরণ্য কথা কও,' 'উৎকর্ণ', প্রভৃতি ডায়ারী গ্রন্থে। তিনি জানতেন যে 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা, পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে।' পূর্ণ যে কোথায় পা ফেলবেন কিছু ঠিক আছে কি? সোনার পথ এড়িয়ে গিয়ে তিনি ধুলোর উপরে পা ফেলেন, কখনও বা ভাটফুলের স্তূপে। সেই অপ্রত্যাশিতকে দেখবার বুঝবার খুঁজবার চোখ ছিল বিভূতিভূষণের—

কারণ অপুর চোখ হারায় নি তার শৈশবের আগ্রহ। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে এক হিসাবে সব চেয়ে বিস্ময়কর ওই ডায়ারীগুলি, কিছুই নেই, অথচ কি নেই। এমন তুচ্ছাতিতুচ্ছ দিয়ে কি অসামান্য সৃষ্টি। বার বার Bathos-এর গা ঘেঁষে চলে গিয়েছেন অথচ কোথাও পা টলে নি। এ যেন স্বপ্নগ্রস্তের গিরিসংকট অতিক্রম। বাস্তব ছাড়া সাহিত্য সৃষ্টি হয় না সত্য। কিন্তু বাস্তব কি ওই ধুলো মাটি কাদা নিয়ে পালোয়ানী? বিভূতিভূষণ ধুলোকে সোনায় পরিণত করে বাস্তবকে পৌঁছে দিয়েছেন অতি বাস্তবে। এ হয় দু'টি গুণের সমাবেশে, প্রতিভা আর প্রসাদ গুণের শুভ যোগাযোগে।"—বিভূতি-বৈচিত্র্য, বিভূতি-বিচিত্রা।

বিভূতিভূষণের এই লেখাগুলি—অন্য কোন সুনির্দেশ্য অভিধা না থাকায় যেগুলিকে দিনলিপিই বলতে হয়, এগুলির মধ্যে তাঁর কবিপুরুষ আর ব্যক্তিপুরুষের পরিচয় যুগপৎ ফুটে উঠেছে। দিনলিপির মধ্যে সাধারণত ব্যক্তিপুরুষের প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু বিভূতিভূষণের রচনায় তাঁর ব্যক্তিপুরুষ আর কবিপুরুষের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন। বিভূতিভূষণের ব্যক্তিপুরুষের স্বরূপ জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে জগদীশ ভট্টাচার্য বিভূতিভূষণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লেখা একটি প্রবন্ধে বলেছেন।—

"বার্নার্ড শ' তাঁর Sanity of Art গ্রন্থে Montaign সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'He was the greatest artist of all—he knew the art of living.' আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকগণের মধ্যে বিভূতিভূষণ সম্পর্কেই কথাটি সর্বাধিক প্রযোজ্য। বিভূতিভূষণের জীবনায়ন আর শিল্পায়নে পার্থক্য অল্পই ছিল। তাই তাঁর ব্যক্তি-পুরুষ আর কবিপুরুষ ছিল সমানধর্মী। বিভূতিভূষণের কবিপুরুষের পরিচয় তাঁর সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে; তাঁর ব্যক্তিপুরুষের পরিচয় তিনি স্বহস্তে রচনা করে গেছেন তাঁর একাধিক ডায়ারি বা কড়চা গ্রন্থে।"—বিভূতিভূষণের কবিপুরুষ, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭

বিভূতিভূষণের ব্যক্তিপুরুষ আর কবিপুরুষ কী ভাবে অদ্বয়াত্মা হয়ে আছে তার দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁর শেষতম দিনলিপি 'হে অরণ্য কথা কও' থেকে প্রথম চারিটি অনুচ্ছেদ উদ্ধার করা যেতে পারে।—

"কাল বারাকপুরে ফিরে এসেচি সুদীর্ঘ ন' মাস পরে। আগের ডায়েরী লেখার পর দশ এগারো মাস কেটে গিয়েচে। গত আষাঢ় মাসেই কল্যাণী অসুখে পড়ে, ভাদ্র মাসে একটি কন্যাসন্তান হয়ে মারা যায়—তারপর কল্যাণী একটু সেরে উঠলে ১৫ই ভাদ্র ওকে নিয়ে যাই কোলাঘাটের শ্বশুরবাড়ীতে। শ্বশুরমশায় তখন ছিলেন কোলাঘাটে, গত ৺পূজার সময় যে ভীষণ ঝড় হয় সে সময় আমি তখন ওখানেই। তারপর ওঁরা চলে গেলেন ঝাড়গ্রামে, কল্যাণীও সঙ্গে গেল, সেখান থেকে আমরা গেলুম ঘাটশীলা গত কার্তিক মাসে। এতদিন ওই অঞ্চলেই ছিলুম, কাল এসেচি এখানে।

মঙ্গলবার দিন যখন গাড়ী এসেচে খড়গপুরে, তখন বাংলাদেশের সবুজ ঘাসভরা মাঠ ও টলটলে জলে ভর্তি মেদিনীপুর জেলার খালবিল দেখে আমাদের ইছামতীর কথা মনে পড়ে গেল। খড়গপুর থেকে তখন সবে নাগপুর ছেড়েচে, কল্যাণী বলে উঠলো,—'আজই চলো বারাকপুর যাই, ইছামতী টানচে।'

আমারও মন চঞ্চল হয়ে উঠেচে তখন যশোর জেলার এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামটির জন্যে। যত দেশবিদেশেই বেড়াই, যত পাহাড়-জঙ্গলের অপূর্ব দৃশ্যই দেখি না কেন, বাল্যের লীলাভূমি সেই ইছামতীর তীর যেমন মনকে দোলা দেয়—এমন কোথাও পেলাম না আর। কিন্তু সেদিন আসা হোলো না, এই ক'দিন কাটলো কলকাতা ও ভাটপাড়ায়। তারপর কাল বনগাঁ হয়ে বাড়ী এসেচি কতকাল পরে।

চোখ জুড়িয়ে গেল বাংলাদেশের এই বনঝোপের কোমল শ্যামলতায়, তৃণভূমির সবুজত্বে, পাখীর অজস্র কলরোলে। সিংভূমের রুক্ষ, অনুর্বর বৃক্ষবিরল মরুদেশে এতকাল কাটিয়ে যেখানে একটা

সবুজ গাছের জন্যে মনটা খাঁ খাঁ করে উঠতো, মনে আছে কাশিদার সেই বাঁধের ধারে খানিকটা সবুজ ঘাস দেখে ও সেদিন রাজবাড়ী যাবার পথে একজনের বাড়ী একটা ঝাঁকড়াচুল পত্রবহুল বৃক্ষ দেখে অবাক হয়ে চেয়েছিলাম—সেইসব প্রস্তরময় ধূসর অঞ্চল থেকে এসে এই পাখীর ডাক, এই গাছপালার প্রাচুর্য কি সুন্দর লাগচে! যেন নতুন কোন দেশে এসে পড়েছি হঠাৎ, বাল্যের সেই মায়াময় বনভূমি আমার চোখের সামনে আবার নতুন হয়ে ফিরে এসেচে, সবহয়ে উঠেছে আজ আনন্দতীর্থের পুণ্য বাতাসস্পর্শে আনন্দময়, নতুন চোখে আবার সব দেখচি নতুন করে। আজ ওবেলা ইছামতীতে নাইতে নেমে সে কি আনন্দ! ওপারের সেই সাঁইবাবলা গাছটা, আর বছর আমি আর কল্যাণী নাইতে নেমে যে গাছটার ডালপালার মধ্যে আটকে পড়া অস্তসূর্যের রাঙা রোদের অপূর্ব শ্রী মুগ্ধচোখে চেয়ে দেখতাম—সে গাছটা তেমনি আছে।"

প্রথম অনুচ্ছেদটিতে নিতান্ত মামুলি কথা বলা হয়েছে। এটি যে কোন মানুষের দৈনন্দিন ঘটনার কড়চা বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে সাধারণ ঘটনার মধ্যেই একটি নতুন সুর শোনা গেল—ইছামতীর টান। তৃতীয় অনুচ্ছেদে ঐ টানের তীব্রতার আভাস। চতুর্থ অনুচ্ছেদে ইছামতী আর বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্য-সম্ভোগের আনন্দ। বিভূতিভূষণের কবিপুরুষই যে কেবল এই আনন্দের ভোক্তা নয়, তাঁর কবিপুরুষ প্রকৃতির সৌন্দর্যের আনন্দের স্বাদ পেয়ে তৃপ্ত হয়েছে। কৈশোরের আনন্দের স্মৃতিতে ফিরে যাওয়ার আনন্দ, ঐ স্মৃতিরসে জারণের ফলে নবায়িত আনন্দের উপলব্ধি—এর মূলে আছে তাঁর কবিপুরুষের সৃজনী কল্পনা। অন্য জাতীয় রচনায় বিভূতিভূষণের কবিপুরুষের সৃষ্টিকর্মের অন্তরালে তাঁর ব্যক্তিপুরুষের বিচিত্র বাসনা সূক্ষ্মভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে। দিনলিপিগুলির মধ্যে ঐ রীতিরই বিপরীত ক্রম দেখা যায়, এই মাত্র।

ব্যক্তিপুরুষ আর কবিপুরুষ বলে যে প্রভেদ দেখানো হয়, তা অবশ্য কাল্পনিক। ছুটোই একটা সামগ্রিক সত্তার মধ্যে নিহিত। তবে এই যে তফাৎ করা হয় তার কারণ এই যে, অনেকের ক্ষেত্রেই লেখকের বাস্তব জীবন তাঁর শিল্পের সঙ্গে মেলে না। মানুষটাকে দেখে ইনিই যে লেখক তা বোঝা যায় না। এই জন্যই এই দ্বৈতের কল্পনা। বিভূতিভূষণের জীবন আর শিল্পের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁরা এটা অনুভব করেছেন। যে প্রকৃতিপ্রেম, যে সহজ জীবনকল্পনা তাঁর রচনার মধ্যে দেখা যায়, তা তাঁর সারা জীবনের মধ্যেই দেখা যেত। স্রষ্টাকে দেখলে সৃষ্টিকে ভালো করে চেনা যেত।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র পড়ে তাঁর সাহিত্যজীবনের বা কবি-কল্পনার উৎসের সংকেত পাওয়া যায়; তাঁর অনেক লেখা বোঝার পক্ষে তাঁর চিঠিপত্রগুলো একটা বড়ো সহায়। বিভূতিভূষণের দিনলিপিগুলি সম্পর্কেও সেই কথা বলা চলে। তাঁর কবিকল্পনার উৎস বা স্বরূপ, তাঁর বহুমুখী ভাবনা, এমন কি গল্প-উপন্যাসের অনেক চরিত্রের আদল সবই তাঁর দিনলিপি থেকে পাওয়া যেতে পারে। তাঁর দিনলিপির অনেক জায়গায় তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু বা চরিত্রের আদি কল্পনা আছে। এই দিনলিপিগুলি যেন তাঁর কবি-কল্পনার সংগ্রহশালার মতো। অবশ্য এগুলি তাঁর সম্পূর্ণ ভাণ্ডার নয়। তাঁর কল্পনা যে বিচিত্র বিষয় আহরণ করেছে বা যে বিচিত্র পথে বিচরণ করেছে তার আভাসমাত্র দিনলিপিতে ফুটে উঠেছে। বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যের পাঠক দিনলিপিগুলি পড়ে তাঁর পূর্ণতর পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হবেন। কিন্তু এখানেই তাঁর সমগ্র পরিচয় নয়। তাঁর কবিপুরুষের যথার্থ প্রকাশ তাঁর সৃষ্টিমূলক রচনার মধ্যে উপলব্ধি করা যাবে।

শিশুসাহিত্য

১

প্রস্তাবনা

শিশুসাহিত্য সংজ্ঞাটি অস্পষ্ট। যে সব রচনাকে শিশুসাহিত্য নাম দেওয়া হয় সেগুলো যাদের উদ্দেশ করে লেখা তাদের বয়স পাঁচ থেকে পনেরো—ছ'দিকেই ছ'-এক বছর কম-বেশিও হতে পারে। চার-পাঁচ বছর আর পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেমেয়েদের মনের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ ; সুতরাং তাদের জন্য লেখা সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। নার্সারি রাইম আর 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' বা 'হাসিখুশি' আর 'রাজকাহিনী'র মধ্যে আবেদনের দিক থেকে কোন মিল নেই। সাধারণভাবে ছোটদের জন্য লেখা সাহিত্যকে শিশুসাহিত্য বলা হয়ে থাকে। অধুনা অবশ্য কেউ কেউ কিশোরদের জন্য লেখা সাহিত্যকে আলাদা করে কিশোর-সাহিত্য সংজ্ঞাটি ব্যবহার করেছেন ; তবে এই সংজ্ঞাটি এখনও সুপ্রচলিত হয় নি। আসলে ছোটদের জন্য লেখার মধ্যে স্তরবিন্যাস করতে আমরা এখনও তেমন অভ্যস্ত হই নি। ছোটদের জন্য যেসব পত্র-পত্রিকা আছে বা কোন কোন পত্রিকায় ছোটদের জন্য যেসব রচনা প্রকাশিত হয়, সেগুলির মধ্যে রচনার বৈচিত্র্য থেকে সহজেই অনুভব করা যায় যে, পাঁচ থেকে পনেরো পর্যন্ত সব বয়সের ছেলেমেয়ের কথা মনে রেখেই সেগুলি লেখা হয়েছে। এইসব লেখাকেই শিশুসাহিত্য বলে নির্দেশ করা হয়—'শিশুসাহিত্য' না বলে 'ছোটদের জন্য লেখা' বললে হয়তো সংজ্ঞাটা খানিকটা শুদ্ধ হত, কিন্তু রচনার রকমফের হত না।

বিভূতিভূষণ ছোটদের জন্য বিশেষভাবে যেসব লেখা লিখেছেন সেগুলোর আলোচনা করার আগে একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। বিভূতিভূষণ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'তে

অপু আর দুর্গাকে নিয়ে শিশুর জীবনের যে ছবি এঁকেছেন তার মধ্যে শিশুর মর্মবাণী ফুটে উঠেছে। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ তন্ময় হয়ে শিশুর অন্তরের একেবারে গভীরে চলে গেছেন। অথচ এই উপন্যাস শিশুকে আনন্দ দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে লেখা হয়নি। বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসটি পরিণত বয়স্ক পাঠকের জন্যই লিখেছিলেন। এই উপন্যাসটির সমাদরের অনেক পরে তিনি এর বালপাঠ্য সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দশ-বারো বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছে এই উপন্যাসটি একেবারে দুরধিগম্য হবে না। বরং তারা এই উপন্যাসের বেশির ভাগ অংশেরই স্বাদ গ্রহণ করতে পারে বলে মনে হয়।

কেবল 'পথের পাঁচালী' বা 'অপরাজিত' উপন্যাসের প্রথম কিছুটা অংশ নয়, বিভূতিভূষণের আরও দু'-একটি উপন্যাসের কোন কোন অংশ, বিশেষ করে তাঁর অজস্র ছোটগল্পের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি ছোট বড়ো সকলেরই উপভোগ্য। এইসব গল্পের বিষয়বস্তু বা বর্ণনাভঙ্গিতে এমন স্বাচ্ছন্দ্য আছে যে, তা ছোটদের কাছেও দুরূহ বলে মনে হয় না। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'কাশী কবিরাজের গল্প' উল্লেখ করতে পারি। এই গল্পে বিভূতিভূষণ একটি অলৌকিক বাতাবরণ সৃষ্টি করে যে কাহিনী পরিবেশন করেছেন তার আবেদন ছোটবড়ো সকলের কাছেই সমান।

এর কারণ সন্ধান করতে গেলে বিভূতিভূষণের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি, তাঁর জীবনদৃষ্টি অনুসরণ করার সময় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্যটি তাঁর 'সখিত্ব'। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি বা চরিত্রের মধ্যে এমন একটা গুণ ছিল যে তিনি সকলের কাছেই সমবয়সী সখার মতো আচরণ করতেন। তাঁর এই সমপ্রাণতা তাঁর লেখার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে—তাঁর লেখার স্টাইলেও তাঁর এই বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে। ছোটদের জন্য বিশেষভাবে লেখা চারিখানি উপন্যাস ছাড়া অন্যত্র বয়স্ক পাঠক

ছোটদের জন্য লেখা রচনা পড়ছেন বলে মনেই করতে পারেন না ; আবার সেইসব গল্প পড়ে দশ-বারো বছর বয়সের ছেলেমেয়েরাও আনন্দ পেতে পারে। একেবারে শিশুদের জন্য তিনি কিছু লেখেন নি। ছোটদের কথা স্মরণ করে লেখা না হলেও তাঁর অনেক লেখাই দশ থেকে পনেরো বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের বিশেষ উপভোগ্য।

বিভূতিভূষণের ছোটদের জন্য লেখা উপন্যাস বা ছোটদের জন্য বিশেষভাবে সংকলিত গ্রন্থের একটা তালিকা দিলাম।—

(১) চাঁদের পাহাড় [উপন্যাস], আশ্বিন, ১৩৪৪।

(২) মরণের ডঙ্কা বাজে [উপন্যাস], মাঘ, ১৩৪৬।

(৩) মিসমিদের কবচ [উপন্যাস], চৈত্র, ১৩৪৮।

(৪) তালনবমী [গল্প সংগ্রহ], বৈশাখ, ১৩৫১।

(৫) হীরামাণিক জ্বলে [উপন্যাস], আষাঢ়, ১৩৫৩।

(৬) ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প [গল্প সংগ্রহ], জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২।

(৭) কিশোর সঞ্চয়ন [বিভিন্ন রচনার সংগ্রহ], জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২।

এ ছাড়া 'পথের পাঁচালী'র দু'টি সংস্করণ 'ছোটদের পথের পাঁচালী' আর 'আম আঁটির ভেঁপু', 'আরণ্যক'-এর তিনটি সংস্করণ 'ছেলেদের আরণ্যক', 'লবটুলিয়ার কাহিনী' আর 'আরণ্যক' (কিশোর সংস্করণ), এর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই উপন্যাসগুলির আলোচনা থেকে এগুলি বাদ দিলাম। এ ছাড়া 'বনে পাহাড়ে' দিনলিপিটি বা ভ্রমণকথাটির কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। ১৩৫২ সালের আশ্বিন মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে এটি ছোটদের 'মৌচাক' পত্রিকায় ১৩৫০-৫১ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। দিনলিপিগুলির কথা অন্য প্রবন্ধে বলেছি ; এখানে 'বনে পাহাড়ে'র উল্লেখমাত্র করলাম।

উপন্যাস

'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসটি প্রথমে 'মৌচাক' পত্রিকায় আষাঢ়, ১৩৪২ থেকে ১৩৪৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটির উৎসর্গ—'খুকুকে দিলাম'। এই খুকু মনে হয় হরিনাভির অন্নপূর্ণা লাহিড়ী (পরে গোস্বামী)—ইনি বিভূতিভূষণের অনুরক্তা ও বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন।

উপন্যাসটির ভূমিকায় বিভূতিভূষণ বলেছেন,—"চাঁদের পাহাড় কোনও ইংরিজি উপন্যাসের অনুবাদ নয় বা ঐ শ্রেণীর কোনও বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত নয়। এই বইয়ের গল্প ও চরিত্রগুলি আমার কল্পনাপ্রসূত। তবে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাকে প্রকৃত অবস্থার অনুযায়ী করবার জন্যে আমি সার এইচ, জনস্টন (Sir Harry Johnston), Rosita Forbes প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত ভ্রমণকারীর পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেছি।"

কাহিনীটি কল্পনাপ্রসূত হলেও বিভূতিভূষণ কল্পনার রাশ একেবারে ছেড়ে দেন নি—গল্পাংশ কোথাও উদ্ভট বা আজগুবি বলে মনে হয় না। কিশোরদের জন্য লেখা ইংরেজী বা ফরাসী অ্যাডভেঞ্চারের গল্পের সঙ্গে এটির তুলনা অনায়াসে করা যেতে পারে। জুলে ভার্নে প্রমুখ শ্রেষ্ঠ অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর লেখকদের রচনার সমকক্ষ না হলেও এই কাহিনীটির মধ্যে সার্থক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর রস আছে। বিভূতিভূষণের কল্পনার সজীবতা কাহিনীটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

এই গল্পটির নায়ক বাংলার একটি তরুণ। সে সাধারণ বাঙালীর

মতো ঘরকুনো। জীবনের বৈচিত্র্যের লোভে সে আফ্রিকায় গিয়ে চাকরি নিয়েছে। আফ্রিকার সিংহ আর সাপের উপদ্রবের মধ্যে সে চাকরি করে। অবশ্য আফ্রিকা নিছক ভয়ংকর একটা দেশ নয়। প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণ এই দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। যেমন, "বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় সারা মাঠ আলো হয়ে উঠেচে। আফ্রিকার এই অংশে পাখী বড় একটা দেখা যায় না দিনমানে, কিন্তু এক ধরনের রাত্রিচর পাখীর ডাক শুনতে পাওয়া যায় রাত্রে—সে সুর অপার্থিব ধরনের মিষ্ট। এইমাত্র সেই পাখী কোন গাছের মাথায় বহু দূরে ডেকে উঠল। মনটা এক মুহূর্তে উদাস করে দেয়।"

শঙ্কর ডিয়েগো আলভারেজ নামে এক পর্তুগিজের সঙ্গে আফ্রিকার বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, উদ্দেশ্য—হীরার খনি আবিষ্কার। এই যুগল অভিযাত্রিকের বৃত্তান্ত গল্পটির বিষয়বস্তু। শঙ্কর আলভারেজের উৎসাহে হীরক খনি আবিষ্কার করতে বার হয়েছিল। পথে অনেক বাধাবিপদ উত্তীর্ণ হলেও আলভারেজ মারা গেছে। শঙ্কর মৃত্যুপথ-যাত্রী হয়েও শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছে।

বইটির শেষ অংশে একটি চীনা ছড়ার অনুবাদ এই গল্পের নীতি বলা যেতে পারে। 'ছাদের আলসের দিব্যি চৌরস একখানা টালি হয়ে অনড় অবস্থায় সুখে-স্বচ্ছন্দ্যে থাকার চেয়ে স্ফটিক প্রস্তর হয়ে ভেঙ্গে যাওয়াও ভালো, ভেঙ্গে যাওয়াও ভালো, ভেঙ্গে যাওয়াও ভালো'।—দুর্গম দেশের অভিযাত্রী না হলেও বিভূতিভূষণ নিজেও একজন ভ্রমণপিপাসু ছিলেন; তিনি যেন এই কিশোর-উপন্যাসে তাঁর ঐ ভ্রমণপিপাসা কল্পনাযোগে কিছুটা মেটাতে চেয়েছেন।

'মরণের ডঙ্কা বাজে' উপন্যাসটি মৌচাক পত্রিকায় ১৩৪৪ সালের পৌষ মাস থেকে ১৩৪৬ সালের আশ্বিন মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।

এই উপন্যাসে দু'টি বাঙালী যুবক ঘটনাক্রমে চীন-জাপানের যুদ্ধের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। বিমল ডাক্তার আর সুরেশ ওষুধের দোকানের

কর্মী। তারা ভাগ্যান্বেষী হয়ে সিঙ্গাপুর গেছে কিন্তু সিঙ্গাপুরে তাদের বিশেষ সুবিধা হয় নি। এক আশ্চর্য যোগাযোগের ফলে তারা চীনা সরকারের আহত সৈনিকদের জন্য হাসপাতালের ভার নিয়েছে।

বিভূতিভূষণ যখন এই উপন্যাসটি লেখেন তখন চীন-জাপানের যুদ্ধ বাংলার কিশোর-সাহিত্যের একটা প্রিয় বিষয়বস্তু। বিভূতিভূষণ সে সময়েয় অন্য লেখকদের মতোই জাপানী অত্যাচারে নিপীড়িত চীনের প্রতিই সহানুভূতিশীল হয়েছেন। এই উপন্যাসে আধুনিক যুদ্ধের বীভৎসতার বর্ণনা আছে। তিনি যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করতে চেষ্টা করেন নি, যুদ্ধের কয়েকটি খণ্ডচিত্র এঁকেছেন। এই উপন্যাসের বড়ো আকর্ষণ এর চরিত্রগুলি। সেবাব্রতী বৃদ্ধ চীনা প্রোফেসর লিং, নিপীড়িত চীনের প্রতি সহানুভূতিশীল ইংরেজ মেয়ে এ্যালিস, মিনি প্রভৃতি চরিত্র আমাদের আকৃষ্ট করে। ছোটোখাটো কয়েকটি চরিত্রের মধ্যেও তিনি জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন।

উপন্যাসটির যদি কোন প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে তা'হলে তা যুদ্ধের বীভৎসতা দেখিয়ে তার প্রতি বিমুখতা জাগানো। উপন্যাসটির শেষে একটি চীনা যুবক যুদ্ধে যাবার আগে তার প্রেমের পাত্রীকে বিয়ে করে ফা-চিন-এর মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে এসেছে। এই অংশে বিভূতি-ভূষণের বর্ণনা,—

"বিমল একবার চারদিকে চেয়ে দেখলে—সন্ধ্যা নেমেচে। কোথাও আর রোদ নেই—এই পবিত্র, প্রাচীন, ফা-চিন মন্দির, পাইন বন, লাল মাছের চৌবাচ্চা, শান্ত গম্ভীর সন্ধ্যা—এই কলহাস্যমুখরা বিদেশিনী মেয়ে দুটি—এই নবদম্পতী। দেখেও মনে হয় না এই পবিত্রস্থানের তিন মাইলের মধ্যে মানুষ মানুষকে অকারণে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে বিষবাষ্প দিয়ে, বোমা দিয়ে, কলের কামান দিয়ে। যুদ্ধ বর্বরের ব্যবসায়। ···অথচ এই হাসি, এই আনন্দ, তরুণ-তরুণীর কত আশা উৎসাহ।

এ্যালিস ঠিকই বলেচে। সব যাবে—কাল সকালেই হয়তো যাবে

জাপানী বোমায়। পবিত্র ফা-চিন মন্দির যাবে, পাইন গাছের সারি যাবে, লাল মাছ যাবে, এই তরুণ দম্পতি যাবে, সে যাবে, মিনি, এ্যালিস, সুরেশ্বর, বৃদ্ধ লি—সব যাবে। যুদ্ধ বর্বরের ব্যবসায়।

ফুল ছড়ানো শেষ হয়েচে। মন্দিরের বাঁকানো ঢালু ছাদে পোষা পায়রার দল উড়ে এসে বসেচে। পাথরের সিঁড়ির ওপরের ধাপটা ফুলে ভর্তি। নবদম্পতী তখন হাসচে—এ একটা ভারি অপ্রত্যাশিত আমোদের ব্যাপার হয়েচে তাদের কাছে। তাদের হাসি-আনন্দ যেন দানবীয় শক্তির ওপর মানুষের জয়লাভ। মহাচীনের নবজন্ম হয়েচে এই তরুণ-তরুণীতে। স্বর্গ থেকে ফা-চিন-এর পবিত্র অমর আত্মা ওদের আশীর্বাদ করুন।"

'মিসমিদের কবচ' উপন্যাসটি বিভূতিভূষণ ভাগিনেয় 'স্নেহাস্পদ শান্তকে' (প্রশান্ত) উৎসর্গ করেছেন। এটি দেব সাহিত্য কুটীরের কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের দশম গ্রন্থ।

পশ্চিমের 'হরর কমিক'-এর অনুকরণে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করার কৃত্রিম প্রয়াস এ দেশে কিছুকাল আগে থেকেই দেখা গিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে কিশোর-সাহিত্যে এই রোমাঞ্চ সঞ্চার করতে কয়েকজন প্রকাশক এগিয়ে এলেন—তাঁদের ব্যবসায়িক বুদ্ধির প্রথম শিকার হয়েছেন কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। এর আগে কিশোর-সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী বা অ্যাডভেঞ্চার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সেইসব কাহিনীর মধ্যে কল্পনার আতিশয্য থাকলেও কিশোর-মনের পক্ষে সেগুলি হানিকর ছিল না। কিন্তু খুন-জখম গোয়েন্দা-পুলিশের কাহিনী নিয়ে বিভিন্ন 'সিরিজ'-এর ডিটেকটিভ উপন্যাস চালু হওয়ার মূলে কথাসাহিত্যিকদের আগ্রহের চেয়ে কয়েকজন প্রকাশকের দূরদর্শিতাই উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগার, পারিতোষিক বা উপহার হিসাবে বিক্রি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকায় এই বইগুলি প্রকাশ করায় অর্থনৈতিক সাফল্য অবশ্যই সুনিশ্চিত; কিন্তু এইসব রোমাঞ্চকর উপন্যাসে কৃত্রিম উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য যেসব বীভৎস

উপকরণ সন্নিবেশ করা হয়, কিশোর-মনে সেগুলির ফল স্পষ্টতই ক্ষতিকর। অন্যান্য অনেকের মতোই জাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণও তাঁর স্বধর্মের প্রতিকূলতা সত্বেও এই ধরনের কাহিনী রচনা করতে প্রলুব্ধ হয়েছেন,—যার ফল 'মিসমিদের কবচ'।

'মিসমিদের কবচ'-এ অবশ্য খুনের পর খুন নেই—নিছক খুনো-খুনির কাহিনী রচয়িতার স্তরে বিভূতিভূষণ নেমে আসতে পারেন নি। নিজের সহজাত সাহিত্যরুচি তাঁকে রক্ষা করেছে। ইংরেজী গল্পের কথা বাদ দিলেও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশের গল্পগুলি হয়তো তাঁকে এ জাতীয় সাহিত্যের কিছুটা নির্দেশ দিয়েছিল। কাহিনীর গ্রন্থি উন্মোচনে তিনি প্রধানত বিশ্লেষণের সাহায্য নিয়েছেন। তিনি শার্লক হোমসের মতো কোন সুদক্ষ ডিটেকটিভকে কাহিনীর মধ্যে টেনে আনেন নি। কাহিনীর বক্তা 'কলকাতার বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিবারণ সোমের অধীনে' শিক্ষানবীশ একজন যুবক। গ্রামের মামার বাড়িতে বেড়াতে এসে সে জনৈক প্রৌঢ় মহাজনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। ঐ প্রৌঢ় মহাজন খুন হয়েছেন—ঐ খুনের কিনারাই এই কাহিনীর কথাবস্তু। বিভূতিভূষণ যেভাবে এগিয়েছেন তাতে কনান ডয়েল বা অ্যালান পো-র রচনার সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম অবশ্য নেই, কিন্তু মোটামুটিভাবে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই কিশোর উপন্যাসে বিভূতিভূষণের কৃতিত্ব একটি স্বাভাবিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি। গাঙ্গুলী মশাই, তার ছেলে শ্রীগোপাল, ননী ঘোষ প্রভৃতি চরিত্র সজীব। খুনী জানকীনাথ বড়ুয়ার স্বকথিত ইতিহাসের মধ্যে ট্র্যাজিক সুর শোনা যায়। 'হরর কমিক'-এর প্রচলিত আদর্শে এই গুণগুলি সম্ভবত অভাবিত বলেই অবান্তর।

'হীরামাণিক জ্বলে' ১৩৪৮ সালের বৈশাখ থেকে ১৩৪৯ সালের আশ্বিন মাসের মৌচাক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই উপন্যাসটির শুরুতে গ্রামের এককালের সমৃদ্ধিশালী জমিদার

মুস্তফি বংশ আর অধুনা সম্পত্তিশালী তাদেরই দৌহিত্র বংশর রায়েদের অবস্থা আর সমারোহের পার্থক্য দেখানো হয়েছে। রায় বংশের যুবক অবনীর চালবাজি আর গ্রামের কয়েকজনের মুখে নিন্দা শুনে মুস্তফি বংশের সুশীল ডাক্তারি পড়ার উদ্দেশ্যে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় গেছে। কিন্তু এমন এক অভাবিত ঘটনায় গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবন ছেড়ে সে একেবারে অজানা দেশের উদ্দেশে অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে, সঙ্গী মামাতো ভাই সনৎ আর সদ্যপরিচিত নাবিক জামাতুল্লা।

তাদের এই অভিযানের প্রেরণা দিয়েছে একটি মানচিত্র আর একটি পদ্মরাগ মণি—যার গায়ে অদ্ভুত কারুকার্য। তারা তিনজনে ইন্দোচীনের কাছাকাছি এক নাম-না-জানা দ্বীপের উদ্দেশে বার হয়েছে। তাদের এই অভিযানে যাত্রা শুরু হওয়ার আগে থেকেই তাদের বিপদ শুরু হয়েছে। তারা যে গুপ্ত নগর আর তার ধনভাণ্ডার আবিষ্কার করতে যাচ্ছে এ খবর প্রতিপক্ষের জানা না থাকা সত্ত্বেও ঐ চিহ্নাঙ্কিত মণিটির জন্য বার বার তাদের প্রাণসংশয় হয়েছে।

অ্যাডভেঞ্চারের এই কিশোর-উপন্যাসটিতে প্রচলিত অনুরূপ উপন্যাসের মতোই সুশীল, সনৎ আর জামাতুল্লার জীবনে বার বার বিপদ এসেছে আবার তারা অভাবিতভাবে বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছে। উপন্যাসটির কাহিনীর গ্রন্থনায় উৎকৃষ্ট অভিযান উপন্যাসের সুনিপুণ পরিকল্পনা নেই। রবার্ট লুই স্টিভেনসনের 'দি ট্রেজার আইল্যাণ্ড'-এর সঙ্গে তুলনা করলে এই উপন্যাসটির কাহিনীর গ্রন্থনাগত শিথিলতা সহজেই ধরা পড়বে। তবে কাহিনীটি দুর্বল বা ত্রুটিপূর্ণ নয়। এর কাহিনীর মধ্যে এক আশ্চর্য বিস্ময়রস পরিবেশিত হয়েছে—অজানার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে এক অদ্ভুত অনুভূতিএর নায়ক সুশীলকে আবিষ্ট করেছে। এই আবিষ্টতা, বিশেষ করে ঐ গুপ্ত নগরীর স্থাপত্য আর ভাস্কর্যের বর্ণনায় বিভূতিভূষণ অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণ অভিযান উপন্যাসে আমরা রোমাঞ্চের পরিচয় পাই। এখানে রোমাঞ্চ যে নেই এমন নয়, কিন্তু মন্দিরের শিল্পকর্মের পরিচয়, প্রাচীন

ভারতের ঐতিহ্যের গর্ববোধ, ঐ ধ্বংসপুরীর অধিদেবতার প্রতি সম্ভ্রম উপন্যাসটির মধ্যে বিচিত্র রস সৃষ্টি করেছে। সনতের মৃত্যু গতানুগতিক অভিযান উপন্যাস থেকে এর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেয়।

উপন্যাসটির প্রায় শেষ দিকে বিভূতিভূষণের একটি উক্তি যেন বাণীর মতো শোনায়।—"বহু প্রাচীন কালের মৃত সভ্যতা এখানে প্রাচীন দিনের সমস্ত বর্বর প্রাচুর্য আর আদিম অর্থনীতি নিয়ে সমাধি গর্ভে বিস্মৃতির ঘুমে অচেতন—এ দিন বাতিল হয়ে গিয়েচে, এ সমাজ বাতিল হয়ে গিয়েচে—একে অন্ধকার গহ্বর থেকে টেনে দিনের আলোয় তুলে—বিংশ শতাব্দীর জগতে আর অর্থনৈতিক বিভ্রাট ঘটিও না।"

....৩..

ছোটগল্প

ছোটদের জন্য লেখা উপন্যাস চারটির তুলনায় বিভূতিভূষণের ছোটদের জন্য লেখা গল্পগুলি সাহিত্য হিসাবে সার্থকতর রচনা ; অনেকগুলি লেখা বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। বিভূতিভূষণের শিশুপাঠ্য বা কিশোরপাঠ্য গল্পগুলি যে বিশেষভাবে শিশু বা কিশোরদের উদ্দেশ করে লেখা এমন নয়। এইসব গল্পের কয়েকটি যদিও ছোটদের পত্রিকা বা সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল, তবুও সেই গল্পগুলির আদর্শ সর্বজনীন—বয়স্ক পাঠকরাও সেগুলি থেকে আনন্দ পেতে পারেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'রঙ্গিনী দেবীর খড়গ' গল্পটি উল্লেখ করতে পারি। এটি 'তালনবমী' আর 'কিশোর সঞ্চয়ন'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পে মানভূমের এক গ্রাম্য দেবতাকে কেন্দ্র করে অলৌকিক রস পরিবেশন করেছেন। এই গল্পের রস ছোট-বড়ো সকলেই উপভোগ করতে পারে। অলৌকিক কাহিনী অবলম্বন করে লেখা অন্য গল্প সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা যেতে পারে। বাস্তবিক

পক্ষে বিভূতিভূষণ বড়োদের লেখা আর ছোটদের লেখার মধ্যে কোন পার্থক্য করতে চান নি। ছোটরা যেসব গল্প পড়ে আনন্দ পেতে পারে সেসব গল্পের রচনাভঙ্গির মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। তাঁর স্টাইলের বিশিষ্টতা তাঁর সব ধরনের গল্পেই ফুটে উঠেছে।

বিভূতিভূষণ যেখানে ছোটদের কথা বলেছেন, সেখানে তাঁর সহমর্মিতা অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে শিশু বা বালকের যে সাধারণ সাধের পরিচয় পাওয়া যায় 'তালনবমী' গল্পটিতে সেইটাই বিষয়বস্তু হয়েছে। এই গল্পে যে তালনবমী অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে তা বিভূতিভূষণের নিজেরই একটি প্রিয় বিষয় ছিল। 'হীরামাণিক জ্বলে' উপন্যাসেও তিনি 'ভাদ্র মাসে তালনবমী ব্রতের ব্রাহ্মণ ভোজন' হওয়ার উল্লেখ করেছেন। 'বিপদ' গল্পে তিনি ভালু আর শান্টুর জীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। 'এয়ারগান' গল্পটিতে একটি এয়ারগান পুরস্কার পাওয়ায় হাবুলের বীরত্বের কল্পনা, পরিশেষে কপিধ্বজ সেই এয়ারগানটি কেড়ে নেওয়ায় তার কল্পনার ট্র্যাজিক পরিণতি যথার্থ কারুণ্য সৃষ্টি করেছে। 'রাজপুত্র', 'হারুন-অল-রসিদের বিপদ' প্রভৃতি গল্পেও ছোটদের সঙ্গে একাত্মতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। 'মুশকিল' গল্পটি শৈশবের স্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে অনুমান করা যায়।

কয়েকটি গল্প চরিত্র-অবলম্বন করে লেখা, 'থনটন কাকা' আর 'রূপো বাঙাল'কে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্র কাহিনীর পর্যায়ে ফেলা যায়। 'জাল' গল্পটির রামলাল ব্রাহ্মণ, 'ডানপিটে' গল্পের বৈদ্যনাথ, 'বায়ুরোগ' গল্পের রাঁধুনি বামুন প্রভৃতি চরিত্র বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কিশোরপাঠ্য যে গল্পগুলির মধ্যে অলৌকিক রস আছে সেগুলির মধ্যে সাধারণত বাস্তবকে অতিক্রম না করবার চেষ্টা থাকলেও অলৌকিক রস সেগুলির মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কয়েকটি গল্পে অপ্রাকৃত বা ভৌতিক ব্যাপার স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। 'মায়া', 'কাশী কবিরাজের গল্প', 'আরক', 'তুটি মন্তর', 'জলসত্র', 'পৈতৃক

ভিটা', 'মেডেল', 'ভৌতিক পালঙ্ক', 'বিরজা হোম ও তার বাধা', প্রভৃতি অলৌকিক রসের বিশিষ্ট গল্প। অলৌকিক রসের গল্প হলেও এগুলি পড়ে ছোটদের গা ছমছম করবে না। বরং তারা অতি সহজে এই সব গল্পে যে রস পরিবেশন করা হয়েছে তা সহজ মনে গ্রহণ করতে পারে।

বিভূতিভূষণের ছোটদের লেখা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একটা জিনিস বিশেষভাবে মনে আসে। বিভূতিভূষণ ছোটদের পড়ার মতো অনেক গল্প লিখলেও রূপকথা লেখেন নি। বিশেষ করে যখন এ যুগের শ্রেষ্ঠ রূপকথা পরিবেশক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা স্মরণ করি তখন এটিকে যেন একটি আশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে হয়। কিন্তু এইটাই বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য। রূপকথার মধ্যে যে কাহিনী বা যেসব চরিত্র থাকে সেগুলি সবই কাল্পনিক। সাধারণত বাস্তব জগতের সঙ্গে তার যোগ থাকেনা। কাল্পনিক বিষয় নিয়ে গল্প লেখা বিভূতিভূষণের স্বধর্ম-বিরুদ্ধ ছিল। বিভূতিভূষণের লেখা পড়ে তাঁকে বাস্তববিমুখ রোমান্টিক লেখক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি যে নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে যান নি, ছোটদের জন্য লেখা তাঁর গল্পগুলি থেকে তা আমরা স্পষ্ট অনুভব করতে পারি। এ তাঁর জীবনমুখীনতার আর একটা বড়ো প্রমাণ।

বিভূতিভূষণের কিশোর-উপন্যাস চারটির তুলনায় তাঁর কিশোর-গল্পগুলি রসসৃষ্টির দিক দিয়ে যেমন, শিল্পের দিক দিয়েও তেমনই সার্থক। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, এই সব লেখার মধ্যে শিল্পের কারিকুরি কোথাও বড়ো হয়ে ওঠে নি। গল্পের বিষয়বস্তু যেমন রচনার সহজ শ্রীও তেমনই ছোট-বড়ো সব রকমের পাঠকের মন কেড়ে নেয়। 'পথের পাঁচালী'র সমুচ্চ কল্পনা না থাকলেও বিভূতিভূষণের এই সব গল্পে বালক-বালিকা বা কিশোর-কিশোরীরা হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে আনন্দিত হবে।

বিভুতিভুষণের গ্রন্থের তালিকা

১৩৫৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'শনিবারের চিঠি' আর 'বিভূতি-বিচিত্রা' অবলম্বন করে প্রকাশকাল অনুসারে এই তালিকাটি করা হয়েছে। সন্দেহস্থলে প্রশ্নচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

১। পথের পাঁচালী (উপন্যাস)। আশ্বিন, ১৩৩৬ ; ইং ১৯২৯। পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৩৯।

'পথের পাঁচালী'র দু'টি কিশোরপাঠ্য সংস্ককরণ—'ছোটদের পথের পাঁচালী' আর 'আম আঁটির ভেঁপু' (সচিত্র) ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের যথাক্রমে আগস্ট আর সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত।

২। মেঘমল্লার (গল্প-সংগ্রহ)। শ্রাবণ, ১৩৩৮ ; ইং ১৯৩১।

সূচী : মেঘমল্লার, নাস্তিক, উমারাণী, বউ-চণ্ডীর মাঠ, নববৃন্দাবন, অভিশপ্ত, খুকীর কাণ্ড, ঠেলাগাড়ী, পুঁই-মাচা, উপেক্ষিতা।

৩। অপরাজিত (উপন্যাস)। প্রথম খণ্ড—মাঘ, ১৩৩৮ ; ইং ১৯৩২। দ্বিতীয় খণ্ড—ফাল্গুন, ১৩৩৮ ; ইং ১৯৩২। পরবর্তী মুদ্রণগুলিতে উপন্যাসটির দু'টি খণ্ড একসঙ্গে প্রকাশিত।

৪। মৌরীফুল (গল্প-সংগ্রহ)। ভাদ্র, ১৩৩৯ ; ইং ১৯৩২।

সূচী : মৌরীফুল, জলসত্র, রোমান্স, রাক্ষস-গণ, হাসি, প্রত্নতত্ত্ব, দাতার স্বর্গ, খুঁটী-দেবতা, গ্রহের ফের, মরীচিকা।

'মৌরীফুল' গল্পটি (প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩৩০) সুধীরচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত 'কথা ও কাহিনী' সিরিজ-এর পঞ্চম সংখ্যা রূপে প্রকাশিত [মূল্য এক আনা]।

৫। যাত্রাবদল (গল্প-সংগ্রহ)। কার্তিক, ১৩৪১ ; ইং ১৯৩৪।

সূচী : ভণ্ডুলমামার বাড়ী, পেয়ালা, উইলের খেয়াল, কনে দেখা, সার্থকতা, একটি দিন, বাইশ বছর, বৈদ্যনাথ, ডানপিটে, যাত্রাবদল।

৬। দৃষ্টিপ্রদীপ (উপন্যাস)। ভাদ্র, ১৩৪২ ; ইং ১৯৩৫।

৭। বিচিত্র জগৎ (সন্দর্ভ, সচিত্র)। ভাদ্র, ১৩৪৩ ; ইং ১৯৩৭।

৮। চাঁদের পাহাড় (সচিত্র কিশোর উপন্যাস) আশ্বিন, ১৩৪৪ ; ইং ১৯৩৭।

৯। জন্ম ও মৃত্যু (গল্প-সংগ্রহ)। আশ্বিন, ১৩৪৪ ; ইং ১৯৩৭।

সূচী : যতু হাজরা ও শিখিধ্বজ, জন্ম ও মৃত্যু, সই, রামশরণ, দারোগার গল্প, খুড়ীমা, বায়ুরোগ, অরন্ধনের নিমন্ত্রণ, লেখক, বড়বাবুর বাহাদুরী, অন্নপ্রাশন, তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, ডাকগাড়ী, অকারণ।

১০। আইভ্যান হো (অনুবাদ)। ইং ১৯৩৮ (?)।

১১। কিন্নরদল (গল্প-সংগ্রহ)। কার্তিক, ১৩৪৫ ; ইং ১৯৩৮।

সূচী : মণি ডাক্তার, পুরোনো কথা, খোসগল্প, একটি দিনের কথা, বাটীচচ্চড়ি, তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প, ডাইনী, বুধীর বাড়ী ফেরা, বিধু মাস্টার, উন্নতি, কিন্নরদল।

১২। আরণ্যক (উপন্যাস)। চৈত্র, ১৩৪৫ ; ইং ১৯৩৯। পরবর্তী সংস্করণে সচিত্র।

'আরণ্যক'-এর তিনটি কিশোরপাঠ্য সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়। (ক) ছেলেদের আরণ্যক। অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩। (খ) লবটুলিয়ার কাহিনী। ? ১৩৫৩ সাল। (গ) আরণ্যক (কিশোর সংস্করণ)।

১৩। মরণের ডঙ্কা বাজে (সচিত্র কিশোর উপন্যাস)। ১৩৪৬ সাল ; ইং ১৫ জানুআরি, ১৯৪০।

১৪। অভিনব বাঙলা ব্যাকরণ (পাঠ্যপুস্তক)। শ্রাবণ, ১৩৪৭, ইং ২৮ জুলাই, ১৯৪০।

১৫। আদর্শ হিন্দু হোটেল (উপন্যাস)। আশ্বিন, ১৩৪৭ ; ইং ১৯৪০।

১৬। অভিযাত্রিক (দিনলিপি : ভ্রমণকাহিনী)। চৈত্র, ১৯৪৭ ; ইং ২২ মার্চ, ১৯৪১।

১৭। বেণীগির ফুলবাড়ী (গল্প-সংগ্রহ)। বৈশাখ, ১৩৪৮ ; ইং ১৫ এপ্রিল, ১৯৪১।

সূচী : বেণীগির ফুলবাড়ী, মাস্টারমশায়, তিরোলের বালা, জনসভা, প্রত্যাবর্তন, প্রাবল্য, বাঁশি, পাঁচুমামার বিয়ে, শাস্তিরাম, কুয়াসার রঙ, ফিরিওয়ালা, নিষ্ফলা।

১৮। স্মৃতির রেখা (দিনলিপি)। ১লা শ্রাবণ, ১৩৪৮ ; জুলাই, ১৯৪১।

রচনাকাল : ২৭ অক্টোবর, ১৯২৪ থেকে ২৬ এপ্রিল, ১৯২৮।

১৯। বিপিনের সংসার (উপন্যাস)। ভাদ্র, ১৩৪৮ ; ইং ১৯৪১।

২০। দুই বাড়ী (উপন্যাস)। মহালয়া, ১৩৪৮ ; ইং ১৯৪১।

২১। মিসমিদের কবচ (সচিত্র কিশোর উপন্যাস)। চৈত্র ১৩৪৮ ; ১ এপ্রিল, ১৯৪২।

২২। অনুবর্তন (উপন্যাস)। ভাদ্র, ১৩৪৯ ; ইং ? ২২ জুলাই, ১৯৪২ [শনিবারের চিঠি অনুসারে]। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ— জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ ; ইং ১৯৪৩।

২৩। তৃণাঙ্কুর (দিনলিপি)। ১৩৪৯ ; ইং ? মার্চ, ১৯৪৩।

রচনাকাল : ১৯ জুন, ১৯২৯ থেকে জানুআরি, ১৯৩৫।

২৪। টমাস বাটার আত্মজীবনী। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ ; ইং ১৯৪৩। 'জান বারোস কৃত ইংরেজী হইতে অনুলিখিত'।

২৫। নবাগত (গল্প সমষ্টি)। ১৩৫০ ; ইং ? ২৫ জানুআরি, ১৯৪৪।

সূচী : দ্রবময়ীর কাশীবাস, আমার লেখা, ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল, পারমিট, মুক্তি, গায়ে হলুদ, ঠাকুরদার গল্প, ভিড়, আরক, থিয়েটারের টিকিট, পার্থক্য, স্বপ্ন-বাসুদেব।

২৬। তালনবমী (সচিত্র কিশোর গল্প-সংগ্রহ)। বৈশাখ, ১৩৫১ ; ইং ১৯৪৪।

সূচী : তালনবমী, রঙ্কিনী দেবীর খড়্গ, মেডেল, মশলাভূত, বামা, বামাচরণের গুপ্তধনপ্রাপ্তি, অরণ্যে, গঙ্গাধরের বিপদ, রাজপুত্র, চাউল।

২৭। উর্মিমুখর (দিনলিপি)। ১৩৫১ সাল ; ইং ? আগস্ট, ১৯৪৪। রচনাকাল : মে, ১৯৩৫ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬।

২৮। দেবযান (উপন্যাস)। ১৩৫১ সাল; ইং ৩অক্টোবর ১৯৪৪। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৫৩ ; ইং জুন, ১৯৪৬।

২৯। উপলখণ্ড (গল্প-সংগ্রহ)। বৈশাখ, ১৩৫২ ; ইং ১৬ এপ্রিল, ১৯৪৫।

সূচী : আহ্বান, একটি ভ্রমণকাহিনী, কয়লাভাঁটা, নস্থমামা ও আমি, দৈবাৎ, বিড়ম্বনা, ভুবন বোষ্টুমী, শাবলতলার মাঠ, পৈতৃক ভিটা, দুর্মতি, ফকির, আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা।

৩০। বিধুমাষ্টার (গল্প-সংগ্রহ)। ১৩৫২ সাল ; জুন ১৯৪৫।

সূচী : বাক্সবদল, মূলো-র‍্যাডিশ-হর্সর‍্যাডিশ, সুলোচনার কাহিনী, বেচারী, অভয়ের অনিদ্রা, অসমাপ্ত, কবি কুণ্ডমশায়, সঞ্চয়, সুহাসিনী মাসিমা, বিধু মাস্টার, অভিশাপ

৩১। কেদার রাজা (উপন্যাস)। ১৩৫২ সাল ; ইং ? আগস্ট, ১৯৪৫।

৩২। বনে-পাহাড়ে (দিনলিপি-ভ্রমণকাহিনী)। ১৩৫২ সাল ; ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫।

৩৩। ক্ষণভঙ্গুর (গল্প-সংগ্রহ)। ২৯ ভাদ্র, ১৩৫২ ; ইং সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫।

সূচী : সিঁদুরচরণ, একটি কোঠাবাড়ির ইতিহাস, বুধোর মায়ের মৃত্যু, ছেলে-ধরা, রামতারণ চাটুয্যে-অথর, ন্নুটি মন্তর, ফড় খেলা, হাট, অরণ্যকাব্য।

৩৪। উৎকর্ণ (দিনলিপি)। বৈশাখ ১৩৫৩ সাল ; ইং ? এপ্রিল ১৯৪৬। রচনাকাল : ১১ অক্টোবর, ১৯৩৬ থেকে ১৬নভেম্বর ১৯৪১।

৩৫। অসাধারণ (গল্প-সংগ্রহ)। বৈশাখ ১৩৫৩ ; ইং ৭ মে ১৯৪৬।

সূচী : অসাধারণ, নদীর ধারের বাড়ি, বিপদ, জন্মদিন, কাঠ-

বিক্রী বুড়ো, হারুন-অল-রসিদের বিপদ, সুলেখা, রূপো-বাঙাল, তেঁতুলতলার ঘাট, তুই দিন, মাকাল লতার কাহিনী, বংশলতিকার সন্ধানে, কমপিটিশন, ব্ল্যাক মার্কেট দমন কর, তুচ্ছ, পিদিমের নিচে।

৩৬। হীরামাণিক জ্বলে (কিশোর-উপন্যাস)। আষাঢ়, ১৩৫৩ ; ইং ১৯৪৬।

৩৭। বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠগল্প (গল্প-সংকলন)। ১৩৫৪ সাল ; ইং ? সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭।

স্থচী : কিন্নরদল, মৌরীফুল, ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল, দ্রবময়ীর কাশীবাস, আহ্বান, একটি ভ্রমণকাহিনী, নস্থমামা ও আমি, বিপদ, তুচ্ছ, সিঁদুরচরণ, তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, ভণ্ডুল মামার বাড়ী, কনে দেখা, মেঘমল্লার, পুঁই-মাচা।

৩৮। অথৈ জল (উপন্যাস)। কার্তিক, ১৩৫৪ ; ইং ১৯৪৭।

৩৯। মুখোশ ও মুখশ্রী (গল্প-সংগ্রহ)। ১৩৫৪ সাল ; ইং ? নভেম্বর, ১৯৪৭।

স্থচী : মুখোশ ও মুখশ্রী, রাস্থ হাড়ি, দৈব ঔষধ, বাল্লিক অপেরা পার্টি, উড়ুম্বর, মাছ চুরি, বেসাতি, কলহান্তরিতা, উল্টোরথ, মুক্তপুরুষ হরিদাস, অন্তর্জলি, বোতাম, খোলস, চৌধুরাণী।

৪০। হে অরণ্য কথা কও (দিনলিপি)। ১৩৫৪ সাল ; জানুআরি, ১৯৪৮।

৪১। আচার্য কৃপালনী কলোনী (গল্প-সংগ্রহ)। আশ্বিন, ১৩৫৫ ; ইং ১৯৪৮।

পরবর্তী সংস্করণে এর নাম বদলে 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব' রাখা হয়।

স্থচী : আচার্য কৃপালনী কলোনী, নীলগঞ্জের ফালমান সাহেব, বরো বাগদিনী, প্রভাতী, সাহায্য, গিরিবালা, চিঠি, মড়িঘাটের মেলা, হাজারি খুঁড়ির টাকা, প্রত্যাবর্তন, পড়ে পাওয়া, আমার ছাত্র।

৪২। জ্যোতিরিঙ্গণ (গল্প-সংগ্রহ)। চৈত্র, ১৩৫৫ ; ইং ১৯৪৯।

সূচী : সংসার, হিংয়ের কচুরি, দুই দিন, অনুশোচনা, দাদু, বাসা, বন্দী, থনটন কাকা, কালচিতি, দিনাবসান, মুস্কিল, গল্প নয়।

৪৩। ইছামতী (উপন্যাস)। পৌষ, ১৩৫৬ ; ইং ১৫ জানুআরি, ১৯৫০।

৪৪। কুশল পাহাড়ী (গল্প-সংগ্রহ)। ১৩৫৭ সাল ; ডিসেম্বর, ১৯৫০।

সূচী : কুশল পাহাড়ী, ঝগড়া, বড় দিদিমা, অবিশ্বাস্য, খেলা, জাল, আবির্ভাব, মানতালাও, বে-নিয়ম, অভিমানী, শিকারী, পরিহাস, জওহরলাল ও গড, গল্প নয়, সীতানাথের বাড়ী ফেরা, হরি কাকা, এমনিই হয়, ঝড়ের রাতে, চাউল, পথিকের বন্ধু, আর্টিস্ট, কবিরাজের বিপদ, আমার ছাত্র, অশরীরী।

পরবর্তী সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৫৭ ; ইং ৭ এপ্রিল, ১৯৫১। এই সংস্করণে বর্জিত—কবিরাজের বিপদ, আমার ছাত্র, অশরীরী; সংযোজিত—শেষ লেখা।

৪৭। ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (গল্প-সংকলন) ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ ; ইং জুন, ১৯৫৫।

সূচী : আরক, দাদু, বাঘের মন্তর, বিরজা হোম ও তার বাধা, থনটন কাকা, মুটি মন্তর, হারুন-অল-রসিদের বিপদ, বিধু মাস্টার, কাশী কবিরাজের গল্প, অরণ্যে, মশলা ভূত, অবিশ্বাস্য, ঠেলাগাড়ী।

৪৮। গল্প-পঞ্চাসৎ (গল্প-সংকলন)। অগ্রহায়ণ ১৩৬৩ ; ইং (?) ডিসেম্বর, ১৯৫৬। রচনাকাল মোটামুটি ১৯৪২ থেকে ১৯৪৯।

সূচী : আমার লেখা, পারমিট, মুক্তি, গায়ে হলুদ, ঠাকুরদার গল্প, ভিড়, আরক, থিয়েটারে টিকিট, পার্থক্য, স্বপ্ন-বাসুদেব, কয়লা-ভাঁটা, দৈবাৎ, বিড়ম্বনা, ভুবন বোষ্টুমী, শাবলতলার মাঠ, পৈতৃক ভিটা, দুর্মতি, ফকির, আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা, বাক্সবদল, মূলো-র‍্যাডিশ হর্স-র‍্যাডিশ, সুলোচনার কাহিনী, বেচারী, অভয়ের অনিদ্রা, অসমাপ্ত, কবি কুণ্ডুমশায়, সঞ্চয়, সুহাসিনী মাসীমা, বিধু মাস্টার,

অভিশাপ, একটি কোঠাবাড়ির ইতিহাস, বুধোর মায়ের মৃত্যু, ছেলে-ধরা, রামতারণ চাটুজ্যে-অথর, দুটি মন্তর, ফড় খেলা, হাট, অরণ্য-কাব্য, সংসার, হিঙের কচুরি, দুই দিন, অনুশোচনা, দাদু, বাসা, বন্দী, থনটন কাকা, কালচিতি, দিবাবসান, মুশকিল, গল্প নয়।

৪৯। রূপহলুদ (গল্প-সংগ্রহ)। ১৮৭৯ শকাব্দ; ১৩৬৪ সাল।

সূচী : ননীবালা, বিরজা হোম ও তার বাধা, বুড়ো হাজরা কথা কয়, কাশী কবিরাজের গল্প, ছোটনাগপুরের জঙ্গলে, মায়া, আমার ডাক্তারি, বর্শেলের বিড়ম্বনা, কাদা, ভৌতিক পালঙ্ক।

৫০। অশনি-সংকেত (উপন্যাস)। ভাদ্র, ১৩৬৬; ইং ১৯৫৯।

৫১। অনুসন্ধান (গল্প-সংগ্রহ)। মাঘ, ১৩৬৬; ইং ১৯৬০।

সূচী : অনুসন্ধান, টান, চ্যালারাম, সান্ত্বনা।

৫২। ছায়াছবি (গল্প-সংগ্রহ)। ফাল্গুন ১৩৬৬; ইং ১৯৬০।

সূচী : ছায়াছবি, বিপদ, কবিরাজের বিপদ, আমোদ, সতীশ, অভিনন্দন-সভা, মরফোলজি, ডালুর বিপদ।

৫৩। আমার লেখা (প্রবন্ধ, অভিভাষণ ও পত্র-সংগ্রহ), ২৮ ভাদ্র, ১৩৬৮; ইং সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

সূচী : আমার লেখা, রবীন্দ্রনাথ, রবি-প্রশস্তি, প্রথম দর্শন, সাহিত্যে বাস্তবতা, সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প, সাহিত্য ও সমাজ, পরিশিষ্ট (গল্পাবলী)।

৫৪। সুলোচনা (গল্প-সংগ্রহ)। বৈশাখ, ১৩৬৯; ইং ১৯৬২।

সূচী : সুলোচনা, বাক্সবদল, স্বপ্ন বাসুদেব, দ্রবময়ীর কাশীবাস, রোমান্স।

৫৫। প্রেমের গল্প (গল্প-সংকলন)। ফাল্গুন, ১৩৬৯; ইং ১৯৬৩।

সূচী : বোতাম, অরন্ধনের নিমন্ত্রণ, অসাধরণ, মণি ডাক্তার, মরফোলজি, প্রতিমা, বেণীগির ফুলবাড়ী।

৫৬। অলৌকিক (গল্প-সংকলন)। আষাঢ়, ১৩৭০; ইং ১০ জুলাই ১৯৬৩।

সূচী : প্রত্নতত্ত্ব, কবিরাজের বিপদ, টান, তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প, আরক, মোড়ল, ছায়াছবি।

৫৭। বিভূতি বিচিত্রা (সংকলন-গ্রন্থ)। ২৮ ভাদ্র, ১৩৭১ ; সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪।

সূচী : উপন্যাস—কেদার রাজা, চাঁদের পাহাড়। গল্প—মরফোলজি, অসাধারণ, নদীর ধারের বাড়ী, বিপদ, জন্মদিন, কাঠ বিক্রি বুড়ো, হারুন-অল-রসিদের বিপদ, সুলেখা, রূপো-বাঙাল, তেঁতুলতলার ঘাট, দুই দিন, মাকাললতার কাহিনী, বংশলতিকার সন্ধানে, কমপিটিশন, ব্ল্যাকমার্কেট দমন কর, তুচ্ছ, পিদিমের নিচে। বিবিধ—অদৃশ্য ধর্মাধিকরণ, অমরকণ্টক-যাত্রা, দৃষ্টিপ্রদীপ, একটি ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা, দাবানল, পত্রসাহিত্য, নবযুগের কবি (কবিতা), আমার লেখা, দিনলিপি। শেষলেখা—কাজল, কেন লিখব, শেষলেখা।

৫৮। কিশোর সঞ্চয়ন (সংকলন-গ্রন্থ)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২ ; মে, ১৯৬৫।

সূচী : উপন্যাস—হীরামাণিক জ্বলে, গল্প—মায়া, জাল, বিপদ, পৈতৃক ভিটা, রঙ্কিনী দেবীর খড়গ, কৃপালনী কলোনী। কবিতা, ভ্রমণ ও স্মৃতিকথা—চিঠি, নবযুগের কবি,আমার লেখা, ছোট-নাগপুরের জঙ্গলে।

ভুবনমোহন রায়ের সঙ্গে যুক্তভাবে লেখা 'সুন্দরবনে সাত বৎসর' কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া বিভূতিভূষণ পাঁচটি বারোয়ারি উপন্যাসে অংশগ্রহণ করেছিলেন।—(১) কো-এডুকেশন, (২) মীনকেতুর কৌতুক, (৩) পঞ্চদশী, (৪) গল্পলেখার, (৫) দম্পতী।

বিভূতিভূষণের কয়েকটি অসমাপ্ত রচনা :—(১) অনশ্বর (উপন্যাস) (২) অপুর কথা, ('পথের পাঁচালী'র পরিত্যক্ত অংশ) (৩) বনবাসী (দিনলিপি), (৪) দিনলিপির অপ্রকাশিত অন্যান্য অংশ।